সৈয়দ মকসুদ আলী

রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ

www.pathagar.com

রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ

সৈয়দ মকসুদ আলী
প্রফেসর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

বাএ ৩৩৩০

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৫/ডিসেম্বর ১৯৮৮। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৯৮/ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক : উপপরিচালক, বিপণন ও বিক্রেয়োন্নয়ন উপবিভাগ। [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০২/জানুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকলপনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : আশফাক-উল-আলম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ১০০·০০ টাকা।

RAJNEETI O RASHTROCHINTAYE UPAMAHADESH : A Text Book on *Politics and Politial thought of Subcontinent* by Prof. Sayed Moqsud Ali. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Reprint 1996. Price : Tk. 100·00 only.

ISBN 984-7-3339-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পথ চেয়ে থাকা

মা-কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণায় নিয়োজিত বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও বটে। ১৯৫৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমী গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একাডেমী এ-যাবৎ প্রায় সাড়ে তিনহাজার গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই বিপুল গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। পাঠকনন্দিত এইসব বই বাংলা একাডেমী পরিকল্পিতভাবে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছে। ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় কাজ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প'-এর অধীনে নিষ্পন্ন হয়ে আসছে।

সৈয়দ মকসুদ আলী প্রণীত 'রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে। প্রথম পুনর্মুদ্রণ হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সালে। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত।

এই গ্রন্থে লেখক এই উপমহাদেশে বৃটিশ রাজত্বের সূচনা থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা নিয়ে ইতিহাস-নির্ভর তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। এই উপমহাদেশে যাঁরা নেতৃত্বদান করেছেন তাঁদের কেউ কেউ শক্তিশালী অবস্থান থেকে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এ-কারণে অনেক সময় সমস্যার কাঙ্খিত সমাধান হয় নি। আবার কেউবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে থেকেও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবল শক্তি অর্জন করেছেন এবং স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন — লেখক এইসব বিষয়ে এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠক সমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে।

এই বই আগের মতো পাঠক সমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

মনসুর মসা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোন প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশি পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কর্মটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

নবগঠিত পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প চলতি অর্থ বছরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত ব্যতীতও পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাক্‌কথা

ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকে উপমহাদেশের রাজনীতিক প্রবাহ বিচিত্র ও জটিল ধারায় আবর্তিত হয়েছে। এই ধারা কখনোবা প্রবাহিত হয়েছে সহযোগবাদী নীতিকে আশ্রয় করে, আবার কখনোবা আন্দোলন, সন্ত্রাস ও সংগ্রামের পথ ধরে। অনস্বীকার্য যে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় উপাদান উপমহাদেশের রাজনীতিক প্রবাহে নতুন মাত্রা ও প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করলেও একই সঙ্গে নানা প্রকার জটিলতা ও সংকটও সৃষ্টি করেছে। বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সমস্যা উপমহাদেশের রাজনীতিক প্রবাহে নতুন মাত্রা ও প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করলেও একই সঙ্গে নানা প্রকার জটিলতা ও সংকটও সৃষ্টি করেছে। বিশেষত হিন্দু-মুসলিম সমস্যা উপমহাদেশের রাজনীতিক সংকটের প্রধান কারণরূপে বারংবার দেখা দিয়েছে। যাঁরা নেতৃত্বদান করেছেন তাঁদের কেউ কেউ শক্তিশালী অবস্থান থেকে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন যেজন্য অনেক সময় সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান হয় নি। আবার কেউবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে থেকেও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবল শক্তি অর্জন করেছেন এবং স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। উভয় দলের মধ্যে আবার এমন ব্যক্তিত্বেরও সন্ধান মেলে যাঁরা উপমহাদেশের মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে সমস্যার সমাধানকল্পে উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক সংকটে চরিত্রটি সঠিকভাবে অনুদাবন করতে হলে সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হলো রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা। কারণ উপমহাদেশের রাজনীতিপ্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। তাঁদের অঙ্গুলিসংকেতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে আপামর জনগোষ্ঠী এবং অকাতরে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য নরনারী। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের রাজনীতি এই প্রজ্ঞাবান ও কুশলী নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক (বা নেতিবাচক) ভূমিকার পরিচয়বাহী।

চল্লিশ-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছি। এই দীর্ঘকালের পরিসরে লক্ষ্য করেছি যে ব্রিটিশ আমলে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাসের যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় পরবর্তীকালে এদেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের আলোকে তার সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ে একাধিক পত্র সিলেবাসের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এই উপমহাদেশের রাজনীতিক নেতৃবর্গের চিন্তা-চেতনা ও কর্মধারার পরিচয় আমরা তাদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পাই নি। এ কারণে পাশ্চাত্য রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে সত্য, কিন্তু অপরদিকে প্রাচ্য রাষ্ট্রচিন্তা, বিশেষত এই উপমহাদেশের চিন্তানায়ক ও রাজনীতিক নেতৃবর্গের ধ্যানধারণা ও কর্মসূচি সম্পর্কে তারা সুস্পষ্ট ধারণা লাভের সুযোগ পায় নি। উপমহাদেশের অন্যন্যসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তাঁদের জ্ঞানসীমার বাইরে থেকে যাবেন এটা কাম্য হতে পারে না মনে করেই আশির দশকের গোড়াতে 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব' এই শিরোনামে একটি পূর্ণ পত্র স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ এ উদ্যোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেন। উপরন্তু অধিভুক্ত কলেজসমূহের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণও নতুন পাঠ্য বিষয়টি সাগ্রহে গ্রহণ করেন।

সমস্যা দেখা দেয় পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। এ বিষয়ে গবেষণামূলক বাংলা বইয়ের অভাব লক্ষ্য করেই বইটি লেখার কাজে হাত দেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার বিস্তীর্ণ পরিসরে বিচরণ করেছি ; হয়তো এ-কারণে আমার চোখ দুটিও নিবদ্ধ থাকতো পাশ্চাত্যের দর্শন-জগতে। প্রাচ্যের, বিশেষত এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতিক প্রবাহ সম্পর্কে লিখতে বসে স্বাভাবকভাবেই দ্বিধা-সংশয়ের আবর্তে পড়তে হয়েছে। আমার সৌভাগ্য, আমাকে উদ্ধার করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কতিপয় সহকর্মী। প্রফেসর নাজমা চৌধুরী পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করেছেন এবং দু'এক জায়গায় ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। অনুজপ্রতিম এ. বি. এম. আবদুল লতিফ কয়েটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে আমার ধারণার অস্পষ্টতা দূর করেছেন। ডঃ শওকত আরা হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ঘেঁটে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং ডঃ হারুন-অর-রশীদ তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দলের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা সকলেই সরাসরি আমরা ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন, কৃতজ্ঞা প্রকাশ করলে বিব্রত বোধ করবেন মনে করে বিরত থাকছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাণ্ডুলিপির প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় আমার সহধর্মিনী প্রফেসর নুরুন্নাহার ফয়জননেসার সজীব স্পর্শ নিঃশব্দ নিঃশ্বাসের মতো ছড়িয়ে আছে। গভীর রাতেও পাশে বসে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ ক্লান্ত চোখে তদারক করেছেন।

বইটি প্রকাশনায় বাংলা একাডেমীর ত্বরিত পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। মহাপরিচালক প্রফেসর আবু হেনা মোস্তফা কামাল শত ব্যস্ততার মধ্যেও বইটির প্রকাশনার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ ইবরাহিম মুদ্রণের ব্যাপারে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। নিজে সব প্রুফ দেখেছেন এবং তথ্য-সূত্রের তালিকা থেকে নির্দিষ্ট লেখক ও বই ইত্যাদির নাম পাদটীকায় সাজিয়েছেন। বুঝতে পারি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব

www.pathagar.com

কষ্ট তিনি স্বীকার করেছেন যাতে রোগশয্যায় থেকে আমাকে এতটুকু পরিশ্রম করতে না হয়। ঋণ স্বীকার করতে সাহস পাচ্ছি না, কেন না উপর্যুক্ত কারণ এঁদের বেলাতেও পুরোপুরি প্রযোজ্য।

পরিশেষে প্রধানত যাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বইটি রচনা করেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতক সম্মান পর্যায়ের সেই শিক্ষার্থীরা বইটি পাঠ করে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

ডীন-এর দফতর
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয়সূচি

ঔপনিবেশিক রাজনীতি

১. **ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা ১-১৫**

মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ড, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, ঔপনিবেশিক শোষণ, আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া, ইংরেজি ভাষার প্রচলন, উদারবাদী ভাবধারার সূচনা ব্রিটিশ প্রশাসন, সংস্কার প্রয়াস , নিয়মতান্ত্রিক ধারার সূচনা, ইংরেজ শাসনামলে রাজনীতির ধারা।

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও রাজনীতি

২. **ওয়াহাবি আন্দোলন ১৬**

৩ **মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ ১৭-২২**

তৎকালীন অবস্থার প্রভাব, ইংরেজ শক্তির বিরোধিতা, জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান, সমাজের বিবর্তনধারা, রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি, আইনের শাসন, আন্তর্জাতিকতাবাদ, মূল্যায়ন ।

৪ **সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ২৩-২৫**

ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস, শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা, ওয়াহাবিদের হিজরত, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অবদানের গুরুত্ব।

৫ **মীর নিসার আলী (তিতুমীর) ২৬-২৯**

চিন্তা ও চেতনার বিকাশ, সংগ্রামী জীবন, সংগ্রামের তাৎপর্য।

সংস্কার আন্দোলনের অপর ধারা

৬ **ফরায়জি আন্দোলন ৩০-৩৩**

ফরায়জি আন্দোলনের সামাজিক পশ্চাদভূমি।

৭ **হাজী শরিয়ত উল্লাহ ৩৪-৩৭**

ফরায়জি মতাদর্শ, মানবসাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, শাসনতান্ত্রিক মতবাদ, গুরুত্ব বিচার।

www.pathagar.com

৮ **মুহম্মদ মহসিন (দুদু মিয়া) ৩৮-৪২**

দুদু মিয়ার আন্দোলন, প্রশাসনচিন্তা, জনমনে দুদু মিয়ার প্রভাব, ফরায়জি আন্দোলন কি শ্রেণীসংগ্রাম?, দুদু মিয়ার ভূমিকার গুরুত্ব বিচার

নবজাগৃতির সূচনা

৯ **রামমোহন রায় ৪৩-৫০**

রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়চিন্তা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধীনতাতত্ত্ব

উদারবাদী রাজনীতি

১০ **সৈয়দ আহমদ খান ৫১-৫৮**

রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সিপাহী বিপ্লবোত্তর ভূমিকা, প্রতিনিধি সরকারের সপক্ষে যুক্তি আইনতত্ত্ব, জাতিবাদ ও ঐতিহ্যচেতনা নবজাগৃতির পথিকৃৎ

সহযোগবাদী রাজনীতি

১১ **নওয়াব আবদুল লতিফ ৫৯-৬৪**

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, লতিফের রাজনীতিচিন্তা, ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইসলামী আদর্শ অধিকারচিন্তা ও সক্রিয় ভূমিকা উপসংহার

ইসলামী ধারায় রাজনীতি

১২ **সৈয়দ আমীর আলী ৬৫-৭০**

রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, নারীর অধিকার, সমালোচকের দৃষ্টি

জাতিচিন্তার উদ্বোধন

১৩ **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১-৭৮**

জীবন ও অভিজ্ঞতা, রাজনীতিতে প্রবেশ, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, মূল্যায়ন

বঙ্গভঙ্গের রাজনীতি

১৪ **নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ৭৯-৮৯**

বঙ্গভঙ্গ : প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য, রাজনীতিচিন্তা, পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল, স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি, নিয়মতন্ত্রের সপক্ষে, উপসংহার

www.pathagar.com

অহিংস রাজনীতি

১৫ **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৯০-১০৫**

গান্ধীচিন্তার উৎস, ধর্ম ও রাজনীতি রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অহিংস অসহযোগবাদী রাজনীতি, মানবস্বাধীনতাবাদ, গণতন্ত্রচিন্তা, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ, অর্থনীতিক চিন্তা : অছিবাদ বা জিম্মাদারীতত্ত্ব, নারীমুক্তি, গান্ধীচিন্তার মূল্যায়ন

প্রতিরোধবাদী রাজনীতি

১৬ **চিত্তরঞ্জন দাস ১০৬-১১৪**

রাজনৈতিক চেতনায় সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব, শত্রুশিবিরের অভ্যন্তরে শত্রুনিধন-নীতি, রাজনৈতিক চিন্তা, শাসনপদ্ধতি, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, উগ্র ব্যক্তিবাদ বিরোধিতা, সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

খেলাফত আন্দোলনের রাজনীতি

১৭ **মওলানা মোহাম্মদ আলী ১১৫-১২২**

খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব, মওলানা মোহাম্মদ আলীর জাতিবাদ, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার আলোকে শাসনতন্ত্রচিন্তা, পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি, অবদানের মূল্যবিচার

দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি

১৮ **মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১২৩-১৩৭**

রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ, রাজনৈতিক ভূমিকা, জিন্নাহর অসাধারণ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কৌশলজ্ঞান, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, দ্বিজাতিতত্ত্ব, জিন্নাহর অনমনীয় নীতিগত অবস্থান, জিন্নাহর রাষ্ট্রপরিকল্পনা, উপসংহার

স্বাধীনতার রাজনীতি

১৯ **পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৩৮-১৪৯**

রাজনীতিক প্রবাহে জওহরলাল, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রচিন্তা, বিশ্বশান্তি, সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

www.pathagar.com

স্বাধিকারের রাজনীতি

২০ **এ. কে. ফজলুল হক ১৫০-১৬৪**

পশ্চাদভূমি, গণঘনিষ্ঠ রাজনীতি, নতুন রাজনৈতিক ধারা, রাজনীতিতে দ্বিমুখী ধারা গণতন্ত্রের প্রবক্তা, শিক্ষা আন্দোলন, অসাধারণ নেতৃত্ব, স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা

গণতন্ত্রের রাজনীতি

২১ **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৬৫-১৭৫**

রাজনৈতিক জীবন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সোহরাওয়ার্দীররাজনীতি, মানবস্বাধীনতা প্রসঙ্গে, স্থিতিশীল সরকার, সাম্রাজ্যবাদ, সামরিক শাসনের কুফল, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি

২২ **সুভাষচন্দ্র বসু ১৭৬-১৮৪**

রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব, রাজনীতিচিন্তা, সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ, জাতিবাদ সংবিধানের রূপরেখা

গণমুখী সংগ্রামী রাজনীতি

২৩ **মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৫-২০১**

সমাজচিন্তার স্ফুরণ, কৃষক আন্দোলন, লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, পাকিস্তান আমলের রাজনীতি, স্বাধীন বাংলাদেশে, ভাসানীর রাজনীতি : আদর্শ ও পদ্ধতি, গণতন্ত্রচিন্তা, আর্থনীতিক গণতন্ত্র, রাজনীতিতে আবেগ ও ভাবালুতা, ভাসানীচিন্তার মূল্যায়ন

মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি

২৪ **শেখ মুজিবুর রহমান ২০২-২১৭**

রাজনীতিক জীবন, ছয়-দফা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর অবদান প্রসঙ্গে

তথসূত্র ২১৮

উল্লেখসূচি ২২২-২২৯

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক রাজনীতি

১

ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা

মানদন্ড থেকে রাজদন্ড

যেদিন ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলভাবে অবস্থিত সুরাট বন্দরে ইংরেজ বণিক উইলিয়াম হকিন্স-এর পাঁচশোটনি বাণিজ্যতরী **হেক্টর** নোঙ্গর ফেলে, প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকে দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত ভারতবর্ষে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে দেখা দেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে তারিখটি ছিল ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। হকিন্স কেন এত দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ভারতে আসেন তারও কারণ ছিল। বহু বছর থেকে ওলন্দাজ বণিকেরা ইংলন্ডে গরম মসলা সরবরাহ করত। তারা সহসা একদিন গোলমরিচের দাম প্রতি পাউন্ডে পাঁচ শিলিং করে বাড়িয়ে দেয় যার ফলে ইংলন্ডে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর চব্বিশ জন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর উদ্যোগে গঠিত হলো ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি। একশো পঁচিশ জন শেয়ারহোল্ডারের প্রদত্ত চাঁদায় কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭২০০০ পাউন্ড। এরপর তিন মাসের মধ্যে এক রাজকীয় সনদবলে ইংলন্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ কোম্পানিকে উত্তমাশা অন্তরীপের অপর প্রান্তের সকল অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্যের পূর্ণ অধিকার দান করেন।[১]

এই কোম্পানিরই অন্যতম পণ্যবাহী জাহাজ **হেক্টর**। তখন ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন চতুর্থ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর। **হেক্টর**-এর সাহসী কাপ্তান হকিন্স কিছু সংখ্যক পাঠান দেহরক্ষীসহ শাহী দরবারে উপস্থিত হলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শ্বেতাঙ্গ বিদেশীকে শুধু সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্ষান্ত হন নি, তাঁকে বিপুল পরিমাণ মহামূল্যবান উপঢৌকন প্রদান ছাড়াও শাহী ফরমানের মাধ্যমে সুরাট বন্দরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দান করেন। বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের পর অল্পকালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি আশাতীতরূপে সমৃদ্ধি লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে নীল, গরম মসলা, চিনি, রেশম ও মসলিন জাহাজ বোঝাই করে নিয়মিতভাবে ইংলন্ডে পাঠাতে থাকে। ইংলন্ডে প্রচুর পরিমাণে অর্থাগম

---

১ Larry Collins & Dominique Lapierre : ***Freedom At Midnight***, (Avon, 1975), pp. 11-12.

www.pathagar.com

হতে থাকে কোম্পানির বদৌলতে, যার ফলে পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে সেদেশে শিল্প-পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ ঘটে।

কোম্পানির কর্মক্ষেত্র শুধু সুরাট বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সাধারণত বণিক-পুঁজিবাদের প্রসারের জন্য উপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে কোম্পানির সওদাগরি জাহাজগুলি নতুন নতুন উপনিবেশের সন্ধানে পাল উড়িয়ে দেয়। একই উদ্দেশ্যে জব চার্নক নামে আর একজন দুর্ধর্ষ কাপ্তান মালাবার উপকূল, মাদ্রাজ অতিক্রম করে গঙ্গাতীরবর্তী সুতানুটি গ্রামে জাহাজ ভেড়ান এবং সেখানেই বসতি নির্মাণ করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। উল্লেখ্য যে কলিকাতা মহানগরী সুতানুটি এবং অপর দুটি গ্রাম কালীঘাট ও গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

বাংলায় এসে কোম্পানির চতুর কর্মচারীগণ এদেশের রাজনীতির, বিশেষ করে রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ধারাটি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। কোম্পানির উচ্চাভিলাষী কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভের শ্যেনদৃষ্টি পড়ে নবাবের সিংহাসনের দিকে। তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন যে বাংলার শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করতে হলে চক্রান্ত ও অস্ত্রবলের আশ্রয় নিতে হবে। মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে যাঁরা শক্তিধর ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেককে তিনি সহজে দলে ভিড়াতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নবাবের সিপাহসালার মীর জাফর এবং অন্যান্যের মধ্যে খাদিম হোসেন, ইয়ার লতিফ খান, মানিকচাঁদ, রায় দুর্লভ, উমিদ রায়, রাম নারায়ণ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নন্দকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ। এঁদের চক্রান্তের দরুন বাংলা বিহার উড়িষ্যার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে (২২ জুন, ১৭৫৭) পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে মাত্র নয় শত ইংরেজ সৈনিক ও দু'হাজার ভারতীয় সিপাহী রবার্ট ক্লাইভের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল। অপর পক্ষে নবাবের বিশাল সেনাবাহিনীতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি জয়ী হতে পারেন নি। এর কারণ, প্রথমত নবাবের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, দ্বিতীয়ত মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে অনেকে আত্মস্বার্থকে বড়ো করে দেখেছিলেন বলে স্বদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হন নি, তৃতীয়ত ইংরেজদের যে রকম উন্নত ধরনের মারণাস্ত্র ও শক্তিশালী নৌবহর ছিল নবাবের তা ছিল না এবং চতুর্থত নবাবের প্রশাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ বা অধিকার ছিল না বলে দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়কালে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইঙ্গ-হিন্দু ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধে নবাবের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিল।[২] এই মত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত তা বলা যায় না।

---

২ Azizur Rahman Mallick : ***British Policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856,*** (Bangla Academy, Dhaka, 1977) p. 70

www.pathagar.com

প্রকৃত ইতিহাস এই যে, ষড়যন্ত্রে ইংরেজ ও হিন্দুদের সঙ্গে নবাবের কতিপয় আত্মীয় এবং অনেক মুসলমান সামাজিক ও সামরিক এলিটও যুক্ত ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের ভারত সাম্রাজ্য দখলের সূচনা ঘটেছিল বাংলার মাটিতে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় মীর জাফর মসনদে বসেন। তখন প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোম্পানির হাতে। মীর জাফর শুধু পুতুল নবাব। মীর জাফরের নবাবী শেষ হবার পর তাঁর জামাতা মীর কাসেমকে কোম্পানি মসনদে বসায়। কিন্তু মসনদের মোহ তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। কোম্পানির ঔদ্ধত্য ও দেশীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কোম্পানি যেসব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তিনি তা বন্ধ করে দেন। এর ফলে অনিবার্যভাবেই তাঁকে ইংরেজ শক্তির মোকাবেলা করতে হয়েছে বিভিন্ন রণাঙ্গনে।[৩] বারংবার পরাজিত হয়েও মীর কাসেম আশাহত হন নি। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করে শেষবারের মতো ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু বক্সারের প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করেও (অক্টোবর, ১৭৬৪) শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। এটাই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে অর্থাভাব, হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতা, সুজাউদ্দৌলার প্রধানমন্ত্রী মহারাজা বেনী বাহাদুর ও সম্রাটের দেওয়ান সিতাব রায়ের চক্রান্ত ছিল নবাবের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। রবার্ট ক্লাইভ, ভেরেলস্ট ও কার্টিয়ার প্রমুখ কোম্পানির চতুর গবর্নরগণ রাজ্যজয়ের যে প্রক্রিয়া শুরু করেন, পরবর্তী একশো বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন গবর্নর জেনারেলের প্রচেষ্টায় তা পুরোমাত্রায় সার্থকতা লাভ করে। রাজ্যজয় বা রাজ্যসম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কতিপয় ইংরেজ গবর্নর জেনারেল তা লঙ্ঘন করে রাজ্যজয়ের নেশায় মেতে ওঠেন। রাজ্যবিস্তারের অদম্য স্পৃহার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ষড়যন্ত্র ও প্রয়োজনবোধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন। চতুর্থ গবর্নর জেনারেল রিচার্ড ওয়েলেসলির শাসনামলে হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, গোয়ালিয়র, দাক্ষিণাত্য ও বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকাসহ বিশাল ভারতীয় ভূখণ্ড ইংরেজের করায়ত্ত হয়। প্রবল মারাঠা, রাজপুত ও শিখশক্তিও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়। এর ফলে সিন্ধু, পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজপুতশাসিত রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতে ইংরেজ শক্তির পুরো একশো বছরও লাগে নি। এই একশো বছরের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে হীন ষড়যন্ত্র এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস।

---

৩ কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়াসুটি, উদয়নালা এবং সবশেষে বক্সারের প্রান্তরে যুদ্ধ হয়

www.pathagar.com

ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব

তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রায় দুশো আটান্ন বছর স্থায়ী ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের পরিসরে কোম্পানির দুঃশাসন ও উৎপীড়নের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে ওঠে। কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন ও সম্পদ নিষ্কাশনের দিকে, জনকল্যাণের দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে নি। মোগল শাসনামলেও ভূসম্পত্তির মালিক ছিল রায়ত ; সম্রাট যেহেতু তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করেন, সে কারণে তারা সম্রাটকে প্রত্যক্ষভাবে খাজানা দিত। এই সনাতন ভূমিব্যবস্থার মূলে কোম্পানি কুঠারাঘাত করে। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রথমে চব্বিশ পরগনা ও পরে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানির কর্মকর্তাগণ নীলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রায়তের জমি জোরপূর্বক দখল করতে থাকে। নীলচাষের জন্য দাদনদাতা, মহাজন, ফটকা দালাল ও ঠিকাদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এদের সহায়তায় কোম্পানির রায়তনিপীড়ন চলতে থাকে ক্রমবর্ধমান মাত্রায়। য়ুরোপে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করত সামন্ত নৃপতি, অপর পক্ষে মোগল সাম্রাজ্যে এ অধিকার ভোগ করত রায়ত। কিন্তু কোম্পানির কর্মকর্তারা এই পার্থক্যকে আমল দেয় নি। কাজেই তারা বাংলার অধিকাংশ ফসলের জমি জোরপূর্বক নীলচাষের জন্য ব্যবহার করতে থাকে। নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত হতে লাগল রায়ত শ্রেণী। একদিকে কোম্পানি নীলের ব্যবসায় আশাতীতভাবে মুনাফা লাভ করতে থাকে, অপর পক্ষে দরিদ্র কৃষক শ্রেণী সর্বস্বান্ত হতে লাগল। সারা বাংলা শ্মশানভূমিতে পরিণত হলো। এরই পরিণতি ১৭৭০-এর মহাদুর্ভিক্ষ।

স্বাভাবিকভাবেই নীলকরদের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে রায়ত শ্রেণীর মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমেও প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে থাকে। তৎকালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের নাটক **নীল দর্পণ** নীলকরদের অত্যাচারের এক করুণ আলেখ্য। এসব কারণে বুদ্ধিজীবী ও দরিদ্র রায়ত শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হলো প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মনোভাব। শোষিত ও উৎপীড়িত মানুষ মাত্রেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক শ্রেণীর — এরূপ একটা চেতনা তাদের মধ্যে জাগ্রত হতে থাকে। ক্ষীণভাবে হলেও এই চেতনা থেকে সঞ্চারিত হয় জাতীয়তাবোধ। ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ (১৭৮৩), কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং চম্পারণে নীলচাষীদের বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর বিক্ষোভের বিস্ফোরণ। রায়ত, নীলচাষী ছাড়াও কোম্পানির অধীনে চাকুরিরত ভারতীয় সিপাহীরাও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮৫৭-এর সিপাহীবিদ্রোহ এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অনস্বীকার্য যে ১৮৫৭-এর সিপাহীবিপ্লব জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম মাইলফলক। প্রকৃতপক্ষে এদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম তখন থেকেই।

www.pathagar.com

প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ঃ কোম্পানির শাসনের ব্যর্থতা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ সনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাবলে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করে। মহারানী তাঁর ঘোষণাপত্রে যদিও বলেন যে "ভারতের জনগণের সমৃদ্ধিই তাঁর শক্তি", কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরবর্তী প্রায় দু'শো বছরব্যাপী ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস বস্তুত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ইতিহাস। ইংরেজ শাসকেরা প্রভু এবং ভারতীয় জনগণ 'ইতর জাতের' (Lesser breeds) এরূপ ধারণা শুধু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের মনেই ছিল না, তৎকালীন ইংরেজ কবি ও চিন্তাবিদদের মধ্যেও কেউ কেউ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছেন। কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং সোজাসুজিভাবে বলেন যে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজগণ আইন ব্যতিরেকে 'ইতর জাত'কে শাসন করবে। চিন্তাবিদ জে. এস. মিলও তাঁর কৃষ্টিক আপেক্ষিকতাবাদ (Cultural Relativity)-এর মাধ্যমে অনেকটা একই ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, যেহেতু ইংরেজ জাতি কৃষ্টিগত দিক থেকে উন্নত, তারা অনুন্নত জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকে শ্বেতাঙ্গ শাসক ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে কখনো আত্মিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি — তাদের সম্পর্কটা ছিল প্রভু-ভৃত্যের বা শাসক-শোষিতের।

ঔপনিবেশিক শোষণ ঃ ইংরেজ শাসকদের মাত্রাহীন শোষণের ফলে ভারতবর্ষ বহুবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যার ফলে মৃত্যুবরণ করে অগণিত মানুষ। কেবল মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলেই এই উপমহাদেশে চব্বিশ বার দুর্ভিক্ষ হয় এবং বিশ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।[৪] বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য রপ্তানি দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। ১৮৫৮ সনে অর্থাৎ যে বছর ব্রিটিশ সরকার ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে ধারণ করে সে বছর এদেশ থেকে আটত্রিশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য কাঁচামাল ইংলন্ডে রপ্তানি করা হয়। ১৯০১ সনে সারা ভারতের জনগণ যখন অভাব-অনটনক্লিষ্ট তখন এদেশ থেকে তিরানব্বই লক্ষ পাউন্ড মূল্যের খাদ্যশস্য পাচার করা হয়।[৫] সরকারি ঋণের মাত্রাও তখন ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রথম থেকেই ইংরেজ সরকারের লক্ষ্য ছিল এদেশে বিলাতী পণ্যের বাজার তৈরি করা এবং তা সফল করার জন্য তারা বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এসেছে। অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণের ফলে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে বণিক-পুঁজিবাদ দ্রুতগতিতে এদেশে শিকড় বিস্তার করে এবং এরই সূত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতি ও শিল্প-পুঁজিবাদের প্রসার ঘটে। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর উত্থান এবং উভয়ের সংঘাত উপমহাদেশের সমাজজীবনে এক

---

৪ অরবিন্দ পোদ্দার, **রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব**; (কলিকাতা, ১৯৮২) পৃ. ২

৫ অরবিন্দ : ঐ, পৃ. ২

www.pathagar.com

নতুন জটিলতা সৃষ্টি করে। যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায় যে ব্রিটিশ শাসকদের ঔপনিবেশিক শোষণপ্রক্রিয়ার ফলে এদেশে শ্রেণীসংঘাতের সূচনা ঘটে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতির প্রয়োজনে অসংখ্য শিল্প-কারখানা তৈরি হলো, শিল্পকৃষ্টির উন্মেষ ঘটল। এর প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হলো নগরায়ন প্রক্রিয়া, যার ফলে সনাতন গ্রামকেন্দ্রিক জীবনধারা ও উৎপাদনপদ্ধতি বিপুলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলো।

আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ঃ ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে এই উপমহাদেশে ভয়ংকর রকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা দেখা দেয়। সনাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অনেক ক্ষেত্রে ধসে পড়ে। তৎকালীন য়ুরোপে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল একথা যেমন সত্য, আবার এ-ও সত্য যে য়ুরোপে উভয়ের ব্যবহার হয়েছিল প্রধানত মানবকল্যাণের কাজে। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে এই উপমহাদেশে প্রশাসনিক সংহতি ও শাসকদের বাণিজ্যিক স্বার্থে উভয়কে প্রধানত ব্যবহার করা হয়। উনিশ শতকের শেষ পাদে রেলপথ ও ডাক-তার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস পায়। যোগাযোগ ও চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ইংরেজ সরকারের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের কাজটি যেমন সহজতর হলো, তেমনি ইংরেজ বণিক ও পুঁজিপতিদের পক্ষেও কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ এবং সম্পদ নিষ্কাশনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। আধুনিকায়নের এই প্রক্রিয়া ইংরেজ সরকার ও পুঁজিপতিগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করেছে। অপর দিকে এর গভীর প্রভাব এদেশের জনজীবনেও দুর্লক্ষ্য নয়। আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় সনাতন জীবনধারার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং একই সাথে সামাজিক গতিচাঞ্চল্যের (Social mobility) মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এককালে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ; আধুনিক যোগাযোগ ও চলাচল ব্যবস্থার প্রসারের ফলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই ঘনিষ্ঠতা থেকে জাতীয় ঐক্যচেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল।

ইংরেজি ভাষার প্রচলন ঃ ফারসী ভাষার পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজির প্রচলন ঘটে ১৮৩৭ সনে — গবর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক-এর শাসনামলে। কোন কোন বিদেশী লেখকের মতে, বহুধা বিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল একই সরকারি ভাষার আওতায় চলে আসার ফলে সকল অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যের সেতুবন্ধন রচিত হয়। এ যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। মোগল আমলে এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। প্রশ্ন উঠে, সরকারি ভাষা হিসাবে ফারসি ভাষার প্রচলন কি সর্বভারতীয় ঐক্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল? সরকারি ভাষা ছাড়াও সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দি ও উর্দু বহু পূর্ব থেকে উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ, বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের জনগণের ভাববিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম ছিল উর্দু বা হিন্দি

www.pathagar.com

ভাষা। উভয় ভাষা কি উপমহাদেশে ঐক্যচেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল? বাস্তব অবস্থা বরং উল্টো সাক্ষ্য দেয়।

প্রকৃতপক্ষে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যখন ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হয়, তখন থেকেই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের ফাটল প্রশস্ততর হতে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায় নির্দ্বিধায় ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে যার ফলে অল্পকালের মধ্যে তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক আমলাতান্ত্রিক এলিট গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। সরকারি চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে তারা সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পেল। অপরপক্ষে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্মৃতি সম্মোহিত করে রাখল মুসলিম সম্প্রদায়কে। এককালে তিনটি মহাদেশের শাসনদণ্ড তাদের হাতে ন্যস্ত ছিল এই চেতনা তাদের মন ও মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলেই তারা ঘৃণাভরে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে। হিন্দু সম্প্রদায় যখন ধাপে ধাপে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে, তখন ঐতিহ্যাশ্রয়ী মুসলিম সমাজ বিভোর হয়ে রইল অতীতের স্বপ্নে।

উদারবাদী ভাবধারার সূচনা ঃ এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। সনাতন গোঁড়া মতবাদের (Dogmatism) পরিবর্তে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ (Rationalism) ক্রমবর্ধমানভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই প্যাচাত্যের যুক্তিবাদ ও উদারবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। জন লক, বার্কলে, হিউম, রুসো, বল্‌তেয়ার ও লাইবনিজ প্রমুখ চিন্তাবিদ, যাঁরা য়ুরোপে জ্ঞানোজ্জ্বল যুগের (Age of Enlightenment) সৃষ্টি করেন, তাঁদের উদারবাদী মতাদর্শ বিপুলভাবে বুদ্ধিজীবী মহলকে অনুপ্রাণিত করে। মানবসাম্য, পরমতসহিষ্ণুতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, স্বায়ত্তশাসন, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সংস্কার আন্দোলনের গুরুত্ব তাঁদের চিন্তা ও চেতনায় প্রবলভাবে সাড়া জাগায়। পরবর্তীকালে এসব উদারবাদী ভাবধারার ভিত্তিতে স্বরাজ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হয়। পাশ্চাত্য দর্শন ও মতাদর্শ শুধু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মহলের রাজনীতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল তাই নয়, তাদের প্রত্যাশার স্তরও উন্নীত করেছিল। প্রসঙ্গত ১৯৩৩ সনে হাউস অব কমন্‌স-এর সভায় প্রদত্ত মেকলের উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন ". . . ভারতীয়রা যখন য়ুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তারা ভবিষ্যতে কোন এক সময় হয়তো য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানও দাবি করবে . . . সে সময়টা হবে ইংরেজের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত সময়।"[৬]

ব্রিটিশ প্রশাসন

ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে সরকারের দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে। শাসকগণ জনকল্যাণ অপেক্ষা প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করার দিকে অধিকতর

---

৬ A. B. Keith (ed.) : A *Speeches And Documents On Indian Policy, 1750-1921;* (London, 1922) p. 265

www.pathagar.com

মনোযোগ দান করে। তারা শক্তিশালী পুলিশ, সেনাবাহিনী ও অমলাতন্ত্র গড়ে তোলে ; উপমহাদেশকে বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রেলপথ, জাহাজ চলাচল ও ডাক-তার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্তরক্রমিকতা (hierarchy) এবং সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রক্রিয়া পূর্বাপেক্ষা জটিলতামুক্ত ছিল বলা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশাসন জনবিচ্ছিন্ন ছিল বলে সাধারণ নাগরিকের দাবিদাওয়া, অভাব-অভিযোগের কথা প্রায়ই সরকারের কর্ণে পৌছাত না বা পৌছালেও সরকার তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না।

সংস্কারপ্রয়াস ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ কোন প্রকার সংস্কারমূলক বিধিবিধান প্রবর্তনের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। পরবর্তী সময়ে তাঁরা এদেশের ভূমিব্যবস্থা, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি ও প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দীর্ঘকাল ধরে ভূস্বামী ও রায়তের মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘাত বিদ্যমান ছিল তাঁর অবসানকল্পে শাসকগণ ১৭৯৩ সনে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement) কায়েম করেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হলে ভূস্বামী ও রায়তের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছিল উল্টো। বস্তুত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র ফলে জমিদার শ্রেণীর শোষণক্ষমতা অসামান্যরূপে বৃদ্ধি পায় এবং তার পরিণতিতে দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে।

তবে ব্রিটিশ সরকারের সংস্কারপ্রয়াস সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়। প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথার মতো একটি কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রথার উচ্ছেদ ঘটেছিল। এর ফল কল্যাণকর হয়েছিল নিঃসন্দেহে। এ সময় পাশ্চাত্যের উদারবাদী ভাবধারার প্রভাবে এবং বিভিন্ন সংস্কারধর্মী বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে নতুন নতুন সংস্কারবাদী সমাজ ও মিশন গড়ে ওঠে। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, থিওসফিক্যাল মিশন প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭] এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড যতই ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে — বিশেষত শিক্ষিত মহলে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের প্রবণতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই শিথিল হতে থাকে 'কনফরমিটি'-এর দৃঢ় বাঁধন।

নিয়মতান্ত্রিক ধারার সূচনা ঃ উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ শাসনের কর্তৃত্ববাদী (authoritarian) ধারার পাশাপাশি আর একটি ধারাও প্রবহমান ছিল — সেটি

---

৭ K. P. Karunakaran : ***Indian Politics from Dadabhai Naoroji to Gandhi,*** (New Delhi, 1975), p. 36.

www.pathagar.com

নিয়মতন্ত্রবাদের (Constitutionalism) ধারা। এই ধারার উৎস ছিল উদারবাদ, যার প্রবক্তা জন লক, বার্কলে ও জে. এস. মিল। উদারবাদী রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব ব্রিটিশ সরকারকেও স্পর্শ করেছিল। তাছাড়া, সংসদীয় পদ্ধতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ব্রিটিশ জাতির ছিলই। উভয় কারণে ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির অনুরূপ একটি শাসনপদ্ধতি ভারতীয় উপমহাদেশে পর্যায়ক্রমে প্রবর্তনের প্রয়াস পায়। এ ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় বিশ শতকের শুরু থেকে। ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫–এর ভারতশাসন আইন এই প্রয়াসের ফসল। তবে এ কথাও সত্য যে ইংরেজ সরকার সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী থাকলেও নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা পুরোপুরিভাবে হস্তান্তর করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিল না। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী সরকার ও দক্ষ সিভিল সার্ভিস গঠনের দিকে। তারা চেয়েছিল কিছু সংখ্যক জনপ্রতিনিধির সমর্থনপুষ্ট এমন একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে, যার সাহায্যে তাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব হবে। অপর দিকে গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি শিক্ষিত সমাজের প্রবল আকর্ষণ ছিল বলে তারা রাজনীতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নির্ণয়কর্মে অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ সময়ে উপমহাদেশে আধুনিক সংবাদপত্রের প্রসার ঘটে। সংবাদপত্রগুলি মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা ভোগ করত বলে রাজনীতিক দিকনির্দেশনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরেছিল। কাজেই যুক্তিসংগতভাবে বলা যায়, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইংরেজ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারপ্রয়াস এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল।

ব্রিটিশ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধানত কর্তৃত্ববাদী (authoritarian)। তা সত্ত্বেও ১৮৩৩ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ইন্ডিয়া এ্যাক্ট সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ও সাম্যনীতি অনুসরণের কথা ঘোষণা করে। অর্থাৎ, ইংরেজ অধিকৃত উপনিবেশসমূহের অধিবাসীরা সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান সুযোগ লাভ করবে এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়।[৮] কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগণ এ নীতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করেন নি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় সরকারি চাকুরির সিংহভাগ দখল করে নিয়েছিল। ১৯০১ সনের শুমারিতে দেখা যায় যে তৎকালীন বঙ্গদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ মোট লোকসংখ্যার মাত্র ১০·৬৮% ভাগ হয়েও সরকারি চাকুরির ৮২·২% ভাগ চাকুরিতে অধিষ্ঠিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মোট জনসংখ্যার ৫১% ভাগ ছিল মুসলমান[৯] ১৯১২–১৩ সনে ৩৫০টি সরকারি চাকুরির শূন্য পদে

---

৮ Keith : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

৯ *Census of India,* 1901, vol. VI-A ; p. 297-333, p. 486.

www.pathagar.com

মাত্র ৫০ জন মুসলিম প্রার্থী নিয়োগলাভ করে ; বাকী শূন্য পদগুলি পূরণ করে অমুসলিম সম্প্রদায়। সরকারি চাকুরিতে এরূপ বৈষম্যের ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকে।

ইংরেজ শাসনামলে রাজনীতির ধারা

আমরা আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক সমাজ বলতে যা বুঝি তার অস্তিত্ব ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বা তার পূর্ববর্তী কালে এই উপমহাদেশে আদৌ বিদ্যমান ছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক সমাজ বলতে বুঝায় এমন এক সমাজ, যেখানে মানুষ গতানুগতিক প্রথা ও লোকাচারের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেই জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও মান নির্ধারণ করে এবং যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগের ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষের মত-প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের সমান সুযোগ আছে। ইংরেজ আমলের পূর্বে রাজনীতি সীমাবদ্ধ থাকত রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এবং তার প্রকাশ ঘটত প্রাসাদ ষড়যন্ত্ররূপে। রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের বা যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের অধিকার সাধারণ নাগরিকের ছিল না।

ইংরেজ শাসনামলে এই ধারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। মোটামুটিভাবে ইংরেজ শাসনকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায় — কোম্পানির শাসন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন। উভয় পর্যায়ের শাসন সর্বতোভাবে অভিন্ন ছিল একথা বলা যায় না। তবে আধুনিক রাজনীতির সূচনা ঘটেছিল দ্বিতীয় পর্যায় থেকে। কোম্পানির শাসনামলে বিদেশী বণিক ও পুঁজিপতির অবাধ শোষণ ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল যার ফলে দরিদ্র রায়ত ও নীলচাষীর পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় তারা শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মজলুম বা নিপীড়িত জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধর্মীয় বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক রেষারেষি তখন পর্যন্ত ঐক্যের মূলে ফাটল ধরায় নি।

এ সময়ে ধর্মীয় আন্দোলনগুলিও প্রতিরোধ সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত ওয়াহাবি ও ফরায়জি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। উভয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ ইসলামের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার ও মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করেন সত্য, তবে তাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। ওয়াহাবি ও ফরায়জি নেতাগণ যে শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, ইতিহাসের বিচিত্র প্রক্রিয়ায় তারা ছিল বিদেশী বা বিধর্মী — যেমন, ইংরেজ, হিন্দু জমিদার, শিখ, মারাঠা ইত্যাদি। উভয় আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন হিসাবে তার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের রাজনীতিতে আন্দোলন ও প্রতিরোধপদ্ধতির সূচনা এভাবেই ঘটেছিল।

১৮৫৭ সনের সিপাহীবিপ্লব প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সিপাহী একজোট হয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবন্ধন ইংরেজ শাসকেরা সুনজরে দেখে নি। তারা বুঝতে পেরেছিল যে দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান যতদিন ঐক্যবদ্ধ থাকবে ততদিন দাপটের সঙ্গে ভারতশাসন করা তাদের জন্য সহজ হবে না। কাজেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ইংরেজ সরকার বিভেদকরণের ভিত্তিতে শাসনের (Policy of Divide and Rule) পথ বেছে নেয়। যেসব মুসলমান সৈনিক সিপাহী বিপ্লবে নেতৃত্বদান করেন তাদের চিহ্নিত করা হয় সরকারের প্রধান শত্রু হিসাবে। অসংখ্য মুসলমান বিপ্লবী সেনাকে সরকারের নির্দেশে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হলো। ইংরেজ সরকারের চরম নৃশংসতা মুসলিম জনমানসে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়।

একাধিক কারণে ইংরেজ সরকারের পক্ষে বিভেদকরণ নীতি কার্যকর করা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, সরকারের করুণাপ্রার্থী উচ্চবিত্ত শ্রেণী ও অমাত্যবর্গ সরকারের কাজে সমর্থন দান করে, এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শগত দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সরকারের জন্য সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় সর্বাগ্রে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল বলে সরকারি আমলাতন্ত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে অতীতের মোহে আচ্ছন্ন মুসলমান সম্প্রদায় প্রায় শতাব্দীর ব্যবধানে পিছিয়ে থাকল। কতিপয় শিক্ষাবিদ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভারতের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে ভারতের মুসলিম শক্তি কখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারেন নি, বরং মুসলিম সমাজই নানাভাবে হিন্দু সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।[১০] এ অভিমত তর্কসাপেক্ষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান মুসলিম সম্প্রদায় আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে সত্য, কিন্তু তার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সত্তাগত স্বাতন্ত্র্য আদৌ বিনষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না। আবার উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু সমাজের উপর ইসলামী কৃষ্টির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর Autobiography-তে এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভে তাঁকে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন গ্রামের একজন মৌলবী সাহেব। এ সত্ত্বেও দেখা গেছে, ভারতের 'মহামানবের সাগরতীরে শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে লীন' হলেও বিভিন্ন

---

১০ G. B. Mathur :*Growth of Muslim Politics in India* ; (Delhi, 1978) ; p. 1 এবং Mallick : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-১২ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টিক স্বাতন্ত্র্য মোটামুটিভাবে অক্ষত থেকে গেছে। বহুধা বিভক্ত উপমহাদেশে একটি মহাজাতি গড়ে ওঠে নি তার অন্যতম কারণ এটাই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও সখেদে বলেছিলেন, "যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না।"[১১] এ থেকে বুঝা যায় যে উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রবণতা প্রবল ছিল বলে এ দেশের রাজনীতি দ্বিমুখী, এমনকি বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

সিপাহী বিপ্লবোত্তরকালে ধর্মীয় জাতিবাদের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে। পাশ্চাত্য জাতিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সংসদীয় ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে পরোক্ষভাবে ধর্মীয় জাতিবাদের বিকাশধারকে প্রভাবিত করে। পূর্বে এসব মতবাদ ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে উপমহাদেশবাসীদের পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে দুইটি — স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা — ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।"[১২] উনিশ শতকের সূচনায় ব্রিটিশ সরকার যখন থেকে সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী হয় তখন মুসলিম নেতৃবন্দের মনে এই আশঙ্কা জাগ্রত হয় যে নতুন নির্বাচনভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু থাকলে হিন্দু সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নির্বাচনে জয়লাভ করবে অর্থাৎ বিধানসভাসমূহে হিন্দু প্রতিনিধিবর্গই একাধিপত্য বিস্তার করবে। ১৮৮২ সনে এদেশে সর্বপ্রথম স্বায়ত্তশাসন চালু করা হয়। পৌরসভা, জেলাবোর্ড ইত্যাদি এ সময় গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় যেভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল তাতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয় নি। মুসলমানদের আশঙ্কা নিরসনের জন্য ১৯০৯ সনে মর্লি-মিন্টো যে সংস্কারনীতি ঘোষণা করেন তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। সুরেন ব্যানার্জী প্রমুখ হিন্দু নেতা অবশ্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩২ সনের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (Communal Award) ব্রিটিশ সরকার স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নেয়।

স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ প্রকৃতপক্ষে বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান নেতৃত্বের নিকট স্বতন্ত্র নির্বাচন ছিল তাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও রাজনীতিক স্বার্থ রক্ষার প্রধান রক্ষাকবচ ; অপর পক্ষে হিন্দু নেতৃত্বের চোখে এ ছিল এক দিকে ভারতের মহাজাতিক ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় এবং অপরদিকে বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধা মোট কথা,

---

১১ দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, (কলিকাতা, ১৯৮৫), পৃ. ৭ থেকে উদ্ধৃত

১২ দেশ, ঐ, উদ্ধৃতি, পৃ. ৭

www.pathagar.com

উভয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শগত ব্যবধান উপমহাদেশের সকল রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে স্থায়ী সমস্যারূপে দেখা দেয়। খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯–২৪) ও অসহযোগ আন্দোলনকালে (১৯১৯) এবং লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট (১৯১৬) ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) গৃহীত হওয়ার সময় উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল সত্য, কিন্তু তা-ও সাময়িকভাবে মাত্র। বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ফলে রাজনৈতিক জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। পেশওয়া রাজত্বের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে মারাঠী হিন্দুদের উত্থান, শিবাজী উৎসব, লোকমান্য তিলকের গণপতি অনুষ্ঠান, অরবিন্দের শক্তিপূজা, বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার, আর্য সমাজের জন্ম এবং জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব উপমহাদেশের রাজনীতিক পরিমণ্ডলে বিপরীতমুখী আবর্ত সৃষ্টিতে যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছে। রাজনীতিতে ধর্মীয় জাতিবাদ ক্রমেই উগ্রজাতিবাদে (Chauvinism) পরিণত হয়েছে যেজন্য পাশ্চাত্য লোকায়তবাদ এদেশের মর্মমূলে শিকর বিস্তার করতে পারে নি।

উনিশ শতকের শেষভাগে উপমহাদেশের রাজনীতি প্রধানত ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তবে উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। অর্থাৎ রাজনীতিক ধারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রাজনীতিক নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশ অনুসারে। সমাজের এলিট যাঁরা — যেমন রাজা, মহারাজা, শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ভূস্বামী — তাঁরাই প্রধানত নেতৃত্বদান করেছেন বা নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন। এমনকি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মতো রাজনৈতিক দল জন্মলগ্ন থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সহায়তা ও নৈতিক সমর্থন লাভ করেছিল বলেই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পেরেছিল। সম্ভবত একারণে গোড়ার দিকে রাজনীতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ক্ষমতাধারী মহলের সম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ ছিল সাধারণ জনগণের সঙ্গে ততটা ছিল না। তাছাড়া, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ব্রিটিশ সরকারের দিকে। সরকারের সুনজর বা অনুকম্পা লাভই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য যে কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে তারা দেখেছে উপেক্ষার দৃষ্টিতে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন আসে উচ্চশিক্ষিত স্বাধিকারসচেতন নেতৃত্বের আবির্ভাবের পর থেকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী, সংবাদপত্রের সম্পাদক, ডাক্তার ও শিক্ষক। কিছুসংখ্যক জমিদার ও ব্যবসায়ীও এঁদের মধ্যে ছিলেন। অবশ্য গোড়ার দিকে ইংরেজ শাসনের অবসান তাঁদের কাম্য ছিল না। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে ইংলন্ডের উদারবাদী চিন্তা ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধি সরকারব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন যেজন্য ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় ইংলন্ডীয় আদলে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁরা উৎসাহী ছিলেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতি তাঁরা অনীহা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা ও ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ শাসকদের

www.pathagar.com

বিদ্বেষমূলক মনোভাব যতই প্রবলতর হতে থাকে উপমহাদেশের নেতৃবর্গও ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই বিক্ষোভ ক্রমশ সংক্রমিত হয় জনগণের মধ্যে।

১৮৬১ সনের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট-এর ভিত্তিতে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে সম্প্রসারিত গবর্নর জেনারেলের নির্বাহী কাউন্সিল ও আইনসভা গঠন করা হয় তাতে কেবল সরকার মনোনীত সরকারি ও বেসরকারি সদস্যগণকে অংশগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিব্যবস্থা তখনো প্রবর্তিত হয় নি। স্বাভাবিক কারণেই এ ধরনের শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। এর পর ১৮৮৩ সনে লর্ড রিপন উপমহাদেশের বিচারব্যবস্থায় ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্যমান জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইলবার্ট বিল কার্যকর করার প্রয়াস পান। এই বিলের বলে ভারতীয় বিচারপতিগণ অভিযুক্ত ইংরেজ নাগরিকের বিচারকার্য সম্পাদনের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু ইংরেজ জাতির প্রবল প্রতিবাদের মুখে বিলটি শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়। এ-ও একটি কারণ যেজন্য তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবর্গ ইংরেজ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে ওঠে যখন বড়লার্ট লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৯ সনে রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনে সরকারকে রাজনৈতিক কর্মীদের বিনাবিচারে আটকের ক্ষমতা দেওয়া হয়। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে গোটা উপমহাদেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে ; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগদান করে। এ সময়ে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ জনতার উপর গুলীবর্ষণ করে ইংরেজ সেনাপতি ডায়ার ; নিহত হয় এক হাজার মানুষ, আহত হয় দেড় হাজার। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড উপমহাদেশের রাজনীতির মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। তোষণবাদী রাজনীতির পরিবর্তে প্রতিরোধবাদী রাজনীতির সূচনা ঘটে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। একই সময় খেলাফত আন্দোলনের ঢেউ গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন পরিচালনা করেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ। ব্রিটিশ সরকারের মুসলিম দমন ও নির্যাতন নীতি মুসলিম জনমনে আগে থেকেই তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল। বিশেষত ওয়াহাবি নেতৃবৃন্দ ও সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সিপাহীদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নৃশংস আচরণ, ফারসির পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রচলন, ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণ, আলীগড় এম. এ. ও কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার ব্যাপারে সরকারের অস্বীকৃতি, কানপুরে মসজিদে অগ্নিসংযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মুসলিম জনগণের উপর গুলীবর্ষণ (১৯১৩ সন), খেলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীকে কারারুদ্ধকরণ ইত্যাদি কারণে মুসলিম সম্প্রদায় আগে থেকেই অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিল। এই বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে — খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

ইংরেজ শক্তি কর্তৃক তুরস্কের সুলতানের উপর হামলার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। একদিকে আন্দোলন যেমন চলতে থাকে অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারও অব্যাহতভাবে মুসলিমনির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। এ সময় (১৯২১ সন) মালাবার উপকূলের মুসলমান মোপলা সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যেজন্য সরকারের নৃশংসতার শিকার হয়েছিল অসংখ্য মোপলা। তৎকালীন কোন কোন সংবাদপত্রে মোপলা বিদ্রোহকে নিছক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে প্রচার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ছিল ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ। খেলাফত আন্দোলনের সরকারবিরোধী চরিত্রের কারণে ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবর্গ প্রথম দিকে এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করলেও শেষের দিকে তাঁরা সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে উপমহাদেশের জনমানসে সর্বভারতীয় মহাজাতি-চেতনা কখনো দানা বাঁধে নি ; বরং দেখা গেছে যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজ স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। এরই অনিবার্য পরিণতি ঘটেছে উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতিবাদের বিকাশ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও অজস্র রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত ত্রিখণ্ডিত হয়েছে। মার্কসবাদী লেখকগণ ভারতের প্রচণ্ড রাজনৈতিক আবর্তকে শ্রেণীতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, নতুন শিল্পপতি গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষার তাগিদে উপমহাদেশের রাজনীতিতে এরূপ জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছিল। তাঁদের যুক্তি, ভারতবিভক্তির জন্য মূলত এই শ্রেণীই দায়ী, কারণ বিভাগোত্তর কালে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে তারাই।

www.pathagar.com

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও রাজনীতি

২

ওয়াহাবি আন্দোলন

তরিকা-ই-মুহম্মদিয়া আন্দোলনই ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসকগণ মুহম্মদিয়াপন্থীদের হেয় করার উদ্দেশ্যে বিদ্রূপাত্মকভাবে ওয়াহাবি নামে আখ্যায়িত করে।[১] অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায় এই নামকরণের বিরুদ্ধে কখনো প্রবল আপত্তি তুলেছে এমনও শোনা যায় না। হয়তো ওয়াহাবিরা আরব দেশের নেযদ রাজ্যের ধর্মীয় নেতা মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের (১৭০৩-১৭৯৩) অনুসারী ছিলেন বলেই ওয়াহাবি হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে আপত্তি করেন নি।

মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের ধর্মপ্রচার কার্য প্রথমে মক্কা নগরীতে সীমাবদ্ধ ছিল। মক্কাবাসীদের অধঃপতন লক্ষ্য করে তিনি আরবের মুসলিম সমাজে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে প্রবর্তনের প্রয়াস চালান। এতে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যার ফলে তিনি বাধ্য হয়ে নেযদ-এর আমীর মুহম্মদ বিন সউদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমীরের সহায়তায় তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুত তাঁরই একক প্রচেষ্টায় নেযদ-এ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর থেকেই মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বিদেশী, বিভাষী ও বিধর্মীদের শাসনামলে ইসলাম বিপন্ন হবে ভেবে তাঁরা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চালাতে থাকেন। উপমহাদেশে যেসব মনীষী ওয়াহাবি নেতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ছিলেন ওয়াহাবি আন্দোলনের পথিকৃৎ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ওয়াহাবি আন্দোলনের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ রচনা করেন এবং সৈয়দ আহমদ বেরেলভী তা বাস্তবে রূপায়ণের ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

---

১ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৮২), পৃ. ২৭৮

www.pathagar.com

৩

মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৪)

মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ ১৭০৩ সনে দিল্লীর এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আল ফায়্যাদ আহমদ কুতুব আল দীন। তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহিম বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে বিশিষ্ট ইসলামী আইনবেত্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইসলামী বিধিবিধান সংকলনের জন্য যে পরিষদ গঠন করেন শাহ আবদুর রহিম ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। এই সংকল ফতোয়া-ই-আলমগিরি নামে পরিচিত।

পিতার শিক্ষাধীনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ কোরআন, হাদিস, ফেকাহশাস্ত্র এবং ইসলামের ইতিহাসে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দুইশত। তিনি ফারসি ভাষায় কোরআনের তরজমা ছাড়াও হাদিস শাস্ত্রের উপর বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেন। ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য অনেকেই তাঁকে ইমাম গাযযালীর সমতুল্য মনে করেন। তিনি জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়ার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তৎকালীন অবস্থার প্রভাব

দার্শনিকগণ সাধারণত যেভাবে তাদের সমকালীন সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হন তদ্রূপ উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অবক্ষয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তা ও চেতনাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। ইংরেজ, শিখ ও মারাঠা শক্তির আক্রমণে উপমহাদেশের মুসলিম আধিপত্য তখন বিপর্যস্ত। অপর দিকে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক মানসিকতা, ইসলামের মৌল আদর্শের প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা ইত্যাদি কারণে ইসলামী শক্তির বুনিয়াদ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের, বিশেষত মুসলিম ভারতের পুনরুজ্জীবনচিন্তা তাঁকে আন্দোলিত করে। তিনি মনে করেন, মুসলিম সমাজে 'কুফরি' বা ইসলামবিরোধী রাজনীতির প্রচলনই মুসলমান সম্প্রদায়ের পতনের অন্যতম

www.pathagar.com

কারণ। অতএব মুসলিম সমাজকে সর্বাগ্রে কুফরিমুক্ত করতে হবে ; এজন্য প্রয়োজনবোধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের পথ অবলম্বন করা কর্তব্য।

ইংরেজ শক্তির বিরোধিতা

মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইংরেজ রাজশক্তিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি অশুভ শক্তি হিসাবে গণ্য করেন ; কারণ তাঁর মতে অমুসলিম রাজশক্তির শাসনাধীনে ইসলামী রীতিনীতি ও জীবনব্যবস্থার প্রসার ত ঘটেই না, বরং তার অবক্ষয় ঘটে। এ কারণে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করা তিনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন। সম্ভবত শাহ ওয়ালীউল্লাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজিজ ইংরেজশাসিত ভারতীয় উপমহাদেশকে দারুল হারব বা শত্রুর দেশ বলে আখ্যায়িত করেন।

জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান

শাহ ওয়ালীউল্লাহ শরিয়ত বা ইসলামী বিধিবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য রাষ্ট্রনেতাকে অবশ্যই জ্ঞানশক্তির অধিকারী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন — জাহেরী বা প্রকাশ্য জ্ঞান এবং বাতেনী বা গূঢ় জ্ঞান।[১] দৃশ্যমান জীবজগতের জীবনধারা ও মানবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায় জাহেরী জ্ঞান থেকে। অপর পক্ষে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য, যা দৃশ্যমান নয়, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় বাতেনী জ্ঞান থেকে। উভয় প্রকার জ্ঞানে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই আদর্শ মানব। এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি চর্চা করলে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। ইসলামকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উভয় প্রকার জ্ঞান সমানভাবে আয়ত্ত করা চাই।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনার কথা স্বীকার করেন বটে, তবে তা সনাতন ইসলামী ঐতিহ্যধারার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে নয় ; বরং ইসলামের আদি বৈশিষ্ট্যকে বহাল রেখে তা করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। প্রসঙ্গত তিনি আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশের কথা উল্লেখ করেন। মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিধিবিধান নাজেল করে এসেছেন। এসব বিধান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয়। এ বিধান লঙ্ঘনের অর্থ অকল্যাণ ডেকে আনা। তের শতকের য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্যবাদী চিন্তাবিদ সেন্ট টমাস একুইনাসও অনেকটা

---

১ A. C. Banerjee : *Two Nations*, (New Delhi, 1981), p. 46

www.pathagar.com

একইভাবে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট বিধান, যাকে তিনি **ঐশী বিধান** বলেছেন, তার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তবে উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ কোরআন এবং একুইনাস বাইবেলকে আল্লাহ্‌র বাণী ও বিধান সংবলিত ধর্মগ্রন্থ জ্ঞান করেছেন।

সমাজের বিবর্তনধারা

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সামাজিক বিবর্তনতত্ত্বটি তাঁর চিন্তাধারার গভীরতার পরিচায়ক। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের ন্যায় তিনিও সমাজের বিবর্তনধারা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেন।[২]

ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আদিম সমাজ। এই সমাজের মানুষ জঙ্গল বা পাহাড়ের গুহায় বাস করত এবং পশুপাখি শিকার করে অথবা ফলমূল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত। সমাজবদ্ধ জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। সহজাত প্রবৃত্তি বা instinct তাদের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করত। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক কর্তব্যবোধ সম্পর্কে তারা আদৌ সচেতন ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজের জন্ম হলো। এই সমাজের মানুষ জঙ্গল বা গুহা ছেড়ে এক-একটি পল্লীতে যূথবদ্ধভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তারা সমাজবদ্ধ জীবনে আস্থাশীল ছিল বলে তাদের মধ্যে সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত ছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে এল পৌর সমাজ বা শহরকেন্দ্রিক সমাজ। এই সমাজ ছিল অধিকতর সুসংহত এবং মানুষের ঘনিষ্ঠতর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। কেবল তাই নয়, তাদের জীবনের লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন।

চতুর্থ পর্যায়ের সমাজকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম সমাজ বলে উল্লেখ করেন। এই সমাজ আন্তর্জাতিক সমাজ। আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীগত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিক সমাজের স্থান। আন্তর্জাতিক সমাজে সমগ্র মানব জাতি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এরূপ সমাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় আদর্শ নেতার। কিন্তু এরূপ নেতা পৃথিবীতে দুর্লভ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতে বিভিন্ন মানবসম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠী যখন ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একই ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তারা এরূপ আন্তর্জাতিক সমাজ গঠন করে। এই সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে এমন এক বা কতিপয় নেতার (ইমাম) হাতে যিনি বা যাঁরা সৎ, ধার্মিক ও নীতিনিষ্ঠ এবং ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। যাঁরা এসব গুণের অধিকারী নন, তাঁরা আন্তর্জাতিক সমাজের অধিপতি হওয়ারও যোগ্য নন।

---

২ Benerjee : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারা অনুসরণ করলে বুঝা যায় যে আদি ইসলামী সমাজে যেরূপ খলিফাতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তারই আদলে তিনি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তবে খলিফাতন্ত্র যাতে রাজতন্ত্রে পর্যবসিত না হয় সেদিকে তিনি সতর্ক থাকতে বলেন। তাঁর মতে, ইসলামের পতনের জন্য দায়ী রাজতন্ত্র ; যতদিন খলিফাতন্ত্র প্রজাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান ছিল ততদিন ইসলামের গৌরব অম্লান ছিল। রাষ্ট্রনেতা কি প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা ধারণ করতে পারেন সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ রাষ্ট্রনেতা নির্বাচন করতে পারেন, অথবা জনসাধারণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনেতার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে, অথব বিদায়ী খলিফা নতুন খলিফা মনোনীত করতে পারেন, অথবা বলপ্রয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা যেতে পারে।[৩] তবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বলপ্রয়োগ বা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি।

আইনের শাসন

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি শরিয়তের বিধান। অর্থাৎ, রাষ্ট্র পরিচালিত হবে শরিয়তের বিধান মোতাবেক।[৪] মানবকল্যাণ ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যই এসব বিধান তৈরি করা হয়েছে। শরিয়তের বিধান চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভের একমাত্র পথ। এর সাহায্যে পবিত্রতা, নম্রতা, মিতাচার ও আত্মসংযম ইত্যাদি সদগুণের অধিকারী হওয়া যায়। তাঁর মতে, ব্যক্তির শাসন অপেক্ষা আইনের শাসন শ্রেয়। আইন বলতে বুঝায় কোরআন বা শরিয়তের বিধান। তবে রাষ্ট্রনেতা বা আইনপ্রণেতাগণ যে আইন রচনা করবেন তা অবশ্যই কোরআনভিত্তিক হতে হবে। কোন আইন শরিয়ত মোতাবেক রচিত হয়েছে কিনা তা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবেন। যুক্তিবিচারের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে ইজতিহাদ বলা যেতে পারে। শাসকের প্রণীত আইন যদি শরিয়তের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তা অগ্রাহ্য করার অধিকার জনসাধারণের আছে। এ থেকে বুঝা যায় যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন স্বৈরতন্ত্র বা কোরআনের পরিপন্থী বিধিবিধানের ঘোর বিরোধী।

---

৩ Banerjee : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮–৪৯

৪ কোরআন বা ইসলামের বিধানই শরিয়তের বিধান

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিকতাবাদ

তাঁর চিন্তাধারার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিকতাবাদ। দেশ জাতি গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মুলসমানকে তিনি এক কওম বা জাতির সদস্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষ একটি দেশ বা অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়কে প্রাধান্য দেন নি ; পৃথিবীর সকল মুসলমান তাঁর চোখে সমান। তাঁর বিশ্বাস, পৃথিবীর মানবসমাজ যেদিন আন্তর্জাতিক ঐক্য ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে সেদিন থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রেষারেষি ও সংঘর্ষেরও অবসান ঘটবে। উল্লেখ্য যে মধ্যযুগীয় য়ুরোপের মহাকবি দান্তে তাঁর ডে মনার্কিয়া গ্রন্থে এ ধরনের আন্তর্জাতিক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্বরাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরেন। বস্তুত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ পৃথিবীর সকল জাতীয় রাষ্ট্রের সমবায়ে এমন একটি বিশ্বসমাজ গঠনে আগ্রহী ছিলেন, যার মূল ভিত্তি আন্তর্জাতিক ঐক্য ও মৈত্রী। তিনি মনে করেন, জাতীয় রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সমাজের প্রথম সোপান। অর্থাৎ, জাতীয় রাষ্ট্রের সিঁড়ি বেয়ে আন্তর্জাতিক সমাজে প্রবেশ লাভ করা যায়। তবে জাতীয় রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুসংহত না হলে আন্তর্জাতিক সমাজেও অনিবার্যভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সুতরাং জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হলো শক্তিশালী নেতৃত্ব। রাষ্ট্রনেতাকে শক্ত হাতে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন ছাড়াও বহিঃশক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করতে হবে। কোন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার চাপে যদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে, তাহলে শক্তিশালী গোষ্ঠীপতিগণ নেতৃত্ব ধারণ করবে এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা পুরুদ্ধারের জন্য তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। তিনি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সেজন্য সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

মূল্যায়ন

মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহর সামাজিক ও রাজনীতিক চিন্তাচেতনায় অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়। এই উপমহাদেশের রাজনীতিক আবহাওয়া তাঁর আমলে যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল। বলা বাহুল্য, সে সময় তাঁর চিন্তাধারা মুসলিম সমাজকে নতুনভাবে উজ্জীবনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর ধ্যানধারণা প্রকৃতপক্ষে ধর্মতত্ত্ব ও সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন নি বটে, তবে তাঁর মতাদর্শ ওয়াহাবি আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এদিক থেকে তাঁকে ওয়াহাবি আন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপকার বলা যায়।

কথা উঠতে পারে যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্প্রদায়গত স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি এবং তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার যে রূপরেখা দান করেছেন তাতে আদি ইসলামী

www.pathagar.com

শাসনব্যবস্থার চিত্রই ফুটে উঠেছে। এরূপ সমালোচনা কতখানি যুক্তিসম্মত তা বিচারবিশ্লেষণের দাবি রাখে। তবে স্মর্তব্য যে তিনি আজীবন ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের মর্মবাণী তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলনীতির বিশ্বজনীনতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল, যে কারণে দেশকাল নির্বিশেষে সকল সমাজে তার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কেও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু তা বলে তাঁর মতাদর্শ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয় নি, বরং তিনি সকল জাতি গোষ্ঠীর প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেছেন। তাছাড়া যে সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘাত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে গোটা উপমহাদেশ বিপর্যস্ত, সে সময় পতনমুখী মুসলিম ভারতকে সুসংহতরূপে পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস তাঁর জন্য মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। মুসলিম সমাজের তথা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য তিনি বিভিন্ন তরিকার — যথা সুন্নি, শিয়া, সুফি, হানাফি, ওয়াহাবি, মুজাদ্দিদি, ওয়াহদাতুল ওয়াজুদি, মুতাযাল্লি, আশারি, মোল্লা প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় বিধানে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল একটি বিশ্বরাষ্ট্রিক সমাজের দিকে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বহুধা বিচ্ছিন্ন মানব সমাজ মানবের জন্য কল্যাণকর হয় না। মধ্যযুগীয় য়ুরোপের মহাকবি দান্তে এবং উনিশ শতকের কাল্পনিক সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ের অনেকটা এ ধরনের বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। তা বলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জাতিগত স্বতন্ত্র সত্তাকে অস্বীকার করেন নি। তিনি জাতীয় সত্তার মূল্য স্বীকার করলেও আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থাকে অধিকতর গুরুত্ব দান করেছেন।

তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তিনি অগ্রগতির প্রতিবন্ধক মনে করেন। তিনি শাসক ও শাসিতের মধ্যে আর্থনীতিক ভারসাম্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, তবে কি প্রকারে তা করা যাবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নি। তিনি শাসককে শুধু বিলাসিতা বর্জন করে সরল জীবন যাপনের পরামর্শ দান করেছেন এবং প্রজাকুলের উপর যাতে বিপুল করের বোঝা চাপানো না হয় সেদিকে শাসকবর্গকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেন, উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক, তাঁতী প্রভৃতি, যারা অপরের সেবা করে আসছে, তাদের মালবাহী পশুতে পরিণত করা অন্যায়।[৫]

পরিশেষে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ শুধু ইসলামী তত্ত্ববিশারদ ছিলেন না, একজন প্রতিভাধর চিন্তাবিদ হিসাবেও স্বাক্ষর রেখেছেন।

---

৫ Banerjee : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

www.pathagar.com

৪.

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী
(১৭৮৬-১৮৩১)

ভারতীয় উপমহাদেশে মুহম্মদিয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। তাঁর জন্ম উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে — ১৭৮৬ সনে। তিনি যৌবনে ধর্মীয় নেতা মওলানা শাহ আবদুল আজিজ-এর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। শাহ আবদুল আজিজ তৎকালীন ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষকে **দারুল হারব** বা দুশমনের দেশ বলে ফতোয়া জারি করেন এবং শাসকের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রচার করেন। স্বাধীনতাকামী সৈয়দ আহমদ জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বহস্তে ধারণ করেন। এই জেহাদে শামিল হবার জন্য তিনি শিয়া সম্প্রদায় সহ সকল মুসলমানকে আহ্বান করেন।

ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস

সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবি আন্দোলনের মূলমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন ১৮২১ সনে মক্কায় অবস্থানকালে। উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের অধঃপতন ও বিপন্নদশা লক্ষ্য করে তিনি বিচলিত হন। মুসলমানদের বিপন্নদশা শুরু হয়েছিল মোগল আমল থেকেই। তাঁর মতে, বিধর্মীদের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান যেরূপ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করছে তার ফলে এই সম্প্রদায়ের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি ইসলাম ধর্মকে পরিশুদ্ধ রূপে পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়াস চালাতে থাকেন। এই প্রয়াস সার্থক করার অভিপ্রায়ে তিনি নিজেকে ইমাম মেহদি বলে ঘোষণা করেন যাতে মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর একত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে ;
২. প্রত্যেকের জন্য আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য ;
৩. বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠান বর্জনীয় ;
৪. অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা অনুচিত :

www.pathagar.com

৫. ইসলাম ধর্মকে পরিশুদ্ধরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনবোধে জেহাদ করা কর্তব্য।

৬. পৌত্তলিকতা মহাপাপ ;

৭. আল্লাহ্‌র বিধানে বিশ্বাসী খলিফার নেতৃত্বে শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে ; এবং

৮. সরকারের কর্তব্য জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ করা।

শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা

উল্লিখিত নীতিমালার সার্থক প্রয়োগের লক্ষ্যে ওয়াহাবিগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাময়িকভাবে হলেও ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। এই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নেয্‌দ রাজ্যে প্রবর্তিত শাসনপদ্ধতির তেমন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। সরকারের কার্যধারা দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয় ; একটি শাখার উপর ধর্মীয় রীতিনীতি ও নিয়ম কানুনের যথাযথ প্রয়োগ, বিচারকার্য সম্পাদন, নবনিযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ও বিভিন্ন এলাকায় কর্মীশিবির গঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় এবং অপর শাখাকে সামরিক বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিশেষত জেহাদ সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ, শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, সেনা, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ ; ব্রিটিশবিরোধী প্রচারকার্য, ব্রিটিশ সরকারের সেনাবাহিনীতে গুপ্তচর প্রেরণ ইত্যাদি দ্বিতীয় শাখার এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়।

ওয়াহাবিদের হিজরত

সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর রাজনৈতিক তৎপরতা ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখে নি। সরকার নানাভাবে সৈয়দ আহমদের বিপ্লবী কর্মপ্রয়াসকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, এমন কি ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। সৈয়দ আহমদের দুর্ভাগ্য এই যে তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম রাজন্যবর্গের অনেকেই তাঁর আন্দোলনে সমর্থন দান করেন নি, কারণ তাঁরা ওয়াহাবিদের সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমকে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী মনে করতেন। এছাড়া মহারাজা রনজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে প্রবল শিখশক্তিও মুলসমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য বিরোধিতা ছাড়াও নানাভাবে ওয়াহাবিদলন করতে থাকে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৈয়দ আহমদের সঙ্গে রনজিৎ সিং-এর সংঘর্ষ বাঁধে।

এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী তাঁর অনুসারীগণকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে হিজরতের নির্দেশ দান করেন। এই

www.pathagar.com

অঞ্চলগুলি জেহাদ পরিচালনার জন্য সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু মওলানা বেরেলভী শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ১৮৩১ সনের ৬ মে বালাকোটের যুদ্ধে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অবদানের গুরুত্ব

মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী প্রধানত একজন জেহাদী মনোভাবাপন্ন ধর্মীয় নেতা হলেও তাঁর অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি পতনমুখী বিশাল সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি যেরূপ নিরলসভাবে সংগ্রাম করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বের দাবি রাখে। মুসলিম জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ও ইসলামী জীবনধারা ও শাসনপদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে কৌশল ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তা ছিল প্রতিরোধমূলক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সন্ত্রাসমূলক। উপমহাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের সূচনা এভাবেই ঘটেছিল।

বিদেশী বিধর্মীদের শাসন মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না এই বিশ্বাস তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। ইংরেজের শাসনাধীনে মুসলিম সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন ক্রমেই দ্রুততর হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অবশ্য ঘটনাচক্রে অধিকাংশ সময় তাঁকে শিখশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। মওলানা বেরেলভীর অন্যতম বিশেষত্ব এই যে তিনি ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বটে, তা বলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নি। বরং অন্যান্য ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি সৌহার্দ্য রক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের য়ুরোপীয় খ্রীস্টান ধর্মগুরু সেন্ট অগাস্টিন যেভাবে লৌকিক জগতে **সিটি অব গড** প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, মওলানা বেরেলভীও অনেকটা অনুরূপভাবে তাঁর মাতৃভূমিতে খোদায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে মওলানা সৈয়দ আহমদ লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসাবে সন্ত্রাস ও সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেন্ট অগাস্টিন সে পথে অগ্রসর হন নি। উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহে যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা সৃষ্টি করেছেন, মওলানা বেরেলভী তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রণী। ওয়াহাবি আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই। তাছাড়া, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী যে ভূমিকা পালন করেন তার গুরুত্বও কম নয়। তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়াসহ আরো অনেকে।

www.pathagar.com

৫

মীর নিসার আলী (তিতুমীর)
(১৭৮২-১৮৩১)

ওয়াহাবি আন্দোলন শুধু সাবেক অবিভক্ত ভারতের মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষত বঙ্গদেশেও তার বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ নীলকর ও হিন্দু জমিদার শ্রেণীর শোষণ-নিপীড়ন যখন চরমে ওঠে তখন বাঁচার তাগিদে দরিদ্র চাষী তাঁতি জোলা শ্রেণীও সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নেয়। আঠারো শতকের শেষভাগে রংপুর, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ও মানভূমে যে কৃষকবিদ্রোহ ঘটে তা ছিল এই শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। বাংলায় এই প্রতিরোধ সংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন ওয়াহাবি বীর মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

চিন্তা ও চেতনার বিকাশ

১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুরে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর চরিত্রে দুটি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও সত্যনিষ্ঠ, অপরদিকে অসমসাহসী। বিশিষ্ট মল্লবীর হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল বলে তিনি নদীয়ার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর অধিনায়ক পদ লাভ করেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে ওয়াহাবি আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। মওলানা বেরেলভীর মতাদর্শে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম ধর্মের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের দৈন্যদশা লক্ষ্য করে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়নের ফলে নিম্নবর্গের মুসলমান তখন সর্বস্বান্ত, বিপর্যস্ত। মুসলমান জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসেন তিতুমীর। তিনি উপলব্ধি করেন, শোষণ-উৎপীড়নের অবসান ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে দাঁড় করাতে হবে এবং তার একমাত্র উপায় শক্তহাতে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ করা। তিনি মনে করেন, ইসলামকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমত ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে কায়েম করতে হবে ; দ্বিতীয়ত

www.pathagar.com

যেসব আচার-অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতার স্পর্শ রয়েছে তা বর্জন করতে হবে। বিশেষ করে তিনি মোহররম অনুষ্ঠান, পীরের মাজারে গান-বাজনা ও মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় তা বর্জন করতে বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তিতুমীর প্রধানত মওলানা বেরেলভীর মতাদর্শ অনুসরণ করেন।

সংগ্রামী জীবন

ইসলাম প্রচারকালে তিতুমীর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা-ই তাঁকে সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। ইংরেজ নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়নে মুসলমান রায়তেরা তখন বিপন্ন। রায়তশ্রেণীর অধিকাংশ ছিল দরিদ্র মুসলমান। উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদারগণ তাদের করভারে জর্জরিত করেই ক্ষান্ত থাকে নি, উপরন্তু পূজাপার্বণ ইত্যাদির জন্যও তারা মুসলমান প্রজার নিকট থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করত। চাঁদা প্রদানে কেউ অক্ষমতা প্রকাশ করলে তার উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হতো। মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় যখন জমিদার কিষেন দেব মুসলমানদের দাড়ির উপর জনপ্রতি আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করে। তদুপরি অত্যাচারী জমিদার যখন মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে তখন মুসলিম জনমনে প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বস্তুত উচ্চবর্ণের অমুসলিম জমিদারই সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য মূলত দায়ী ছিল।[১] এ অবস্থায় আপোষ-মীমাংসার পথে সমস্যার সমাধান হবে না দেখে তিতুমীর প্রতিরোধ সংগ্রামের পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী — তাঁতী, জোলা, কৃষক, কারিকর প্রভৃতি। ফকির মিসকিন শাহের নেতৃত্বে বহু ফকিরও বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁরা সকলে একজোট হয়ে **দারুল হারবকে দারুল ইসলামে** পরিণত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

বারাসাতের অদূরে নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে সেখান থেকে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তাঁর শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে পর্যুদস্ত হলো ইংরেজ কুঠিয়াল ও দেশীয় জমিদারদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা। তারাগনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, নাগরপুরের গৌর প্রসাদ চৌধুরী ও পূর্ণা-এর কিষেন দেব রায় অবস্থা বেগতিক দেখে গবর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর শরণাপন্ন হন। বেন্টিঙ্ক কালবিলম্ব না করে তিতুমীরের বিরুদ্ধে এক গোলন্দাজ বাহিনী প্রেরণ করেন। কামানের

---

১ Narahari Kaviraj :***Wahabi and Faraizi Rebels of Bengal,*** (New Delhi, 1982), p. 59

www.pathagar.com

গোলায় ধ্বংস হলো তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা এবং তিনিও শহীদ হলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ওয়াহাবি বিদ্রোহের সাময়িক অবসান ঘটলেও শোষিত শ্রেণীর বিদ্রোহ-চেতনা আদৌ অবদমিত হয় নি।

সংগ্রামের তাৎপর্য

তিতুমীরের সংগ্রামকে মোটামুটিভাবে দু'ভাবে বিচার করা যায়। প্রথমত এ ছিল ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ, দ্বিতীয়ত শোষক শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম অথবা বলা যায় শ্রেণী সংগ্রাম। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিতুমীর নিছক ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চেয়েছিলেন — সে কারণে তাঁর প্রতিরোধ সংগ্রামকে মুক্তিযুদ্ধ বা শ্রেণীসংগ্রাম বলা অযৌক্তিক। এ যুক্তি খণ্ডন করা দুঃসাধ্য নয়। তিতুমীর সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবাপন্ন ও ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন সত্য এবং সে কারণেই তিনি চেয়েছিলেন এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে মানবসাম্য বিদ্যমান থাকবে। তিনি বিদেশী শক্তির প্রাধান্য ও কায়েমীস্বার্থের দুর্গ চূর্ণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে তিতুমীর ও অন্যান্য ওয়াহাবি নেতা কখনো অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নি। তবে তিতুমীর যখন থেকে বিদেশী আধিপত্যমুক্ত সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন তখন থেকে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও দেশীয় শোষক ও উৎপীড়ক শ্রেণী। এ অবস্থায় তিনি বাধ্য হয়ে উভয় কায়েমীস্বার্থচক্রের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সুতরাং তিতুমীরের সংগ্রামকে এক হিসাবে মুক্তিসংগ্রাম বা শ্রেণীসংগ্রাম বলা অযৌক্তিক নয়।

তিতুমীরের বিদ্রোহ প্রধানত দুটি কারণে সফল হয় নি। প্রথমত, যে শোষিত শ্রেণীর সপক্ষে তিনি অস্ত্রধারণ করেন তাদের সংহতি-চেতনা আঞ্চলিক সীমারেখার বাইরে পরিব্যাপ্ত ছিল না। এ কারণে ইংরেজ শাসক ও দেশীয় জমিদারদের সম্মিলিত শক্তির পক্ষে অঞ্চলকেন্দ্রিক আন্দোলন দমন করা কঠিন হয় নি। সারা দেশের শোষিত শ্রেণী একজোট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবস্থা হয়তো অন্য রকম হতো।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে দেখা গেছে যে, উন্নত রণকৌশল ও মারণাস্ত্রের সাহায্যে এক দেশ অপর দেশকে সহজেই পদানত করেছে। ইংরেজের হাতে ছিল শক্তিশালী কামান আর তিতুমীরের হাতে বাঁশের লাঠি। কাজেই কামানের মুখে তাঁর যে পরিণতি ঘটেছিল তা ছিল অনিবার্য।

তিতুমীরের সংগ্রাম সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর মৃত্যুর পরেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা থেমে যায় নি, বরং

www.pathagar.com

ক্রমশ জোরদার হয়েছে। তিতুমীর তথা ওয়াহাবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলন ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে জনসাধারণ, সিপাহী ও তরুণ ছাত্র সমাজ। এক সময় কলিকাতা মাদ্রাসার ওয়াহাবি ছাত্ররাও ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই সংগ্রামী চেতনারই পরিণতি ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লব।

www.pathagar.com

সংস্কার আন্দোলনের অপর ধারা

৬

ফরায়জি আন্দোলন

আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলার মুসলিম সমাজ নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে যখন দুর্দশাগ্রস্ত সে সময় ফরায়জি নেতৃবৃন্দ মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি সুসংহত শক্তিরূপে দাঁড় করাতে প্রয়াসী হন। ফরায়জি আন্দোলন মূলত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে তৎকালীন সামাজিক পাশ্চাৎভূমি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা আবশ্যক।

ফরায়জি আন্দোলনের সামাজিক পশ্চাদভূমি

বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমান নবাব, অভিজাত পরিবারবর্গ ও দরিদ্র রায়তকুল ক্রমবর্ধমানভাবে বিপন্নদশায় পতিত হয়। পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানির অনুগ্রহপুষ্ট নবাবদের ক্ষমতা বলতে কিছুই ছিল না। কোম্পানি নবাবদের রাজস্বের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে ক্ষান্ত থাকে নি, তাদের শাসনক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেয়। ১৭৬৪ সনে বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাসিম-এর পরাজয় ঘটলে ইংরেজ-শক্তির আধিপত্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ সনে নবাবের বার্ষিক ভাতা ছিল তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা, ১৭৭২ সনে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ষোল লক্ষ টাকা।[১] এভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক ভাতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার ফলে নবাব সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। আবার কোম্পানির চক্রান্তের ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলিও ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। নবাবী আমলে এসব পরিবারের আয়ের উৎস ছিল প্রধানত তিনটি — সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব, রাজস্ব আদায় এবং বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষমতা।[২] কিন্তু কোম্পানির আমলে মুসলমান সেনাপতিগণ চাকুরিচ্যুত হলেন এবং লর্ড কর্নওয়ালিস ও স্যার জন্য শোর-এর শাসনকালে মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীর স্থানে বহাল হলো হিন্দু

---

১ Mallick : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২ ঐ, পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

কর্মচারী। এছাড়া কর্নওয়ালিস-এর আমলে সরকারি উচ্চপদগুলি কেবল ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, যার ফলে এসব পদে মুসলমানদের নিয়োগ লাভের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হলো। এরপর ১৮৩৭ সনে ফারসির পরিবর্তে যখন সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তিত হলো তখন থেকে মুসলমানদের দুর্দশা চরমে ওঠে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মোগল আমল থেকে ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। কাজেই বহু বছর থেকে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মকর্তাগণ এই ভাষার মাধ্যমে সরকারি দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত ছিল। ইংরেজ সরকার সহসা ফারসির পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করাতে সম্ভ্রান্ত মুলসমানগণ মর্মাহত হয়। তারা ঘৃণাভরে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে যার ফলে শাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চতর পদগুলি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। অপরদিকে এ সময় হিন্দু সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা নির্দ্বিধায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থার পরিচায়ক। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় কোম্পানির অধীনে কেরানীগিরি করার ব্যাপক সুযোগ পায়। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই কোম্পানির অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু মধ্যবিত্ত **বাবু** শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। কোম্পানি আমলে প্রথম একশত বছর এই বাবুগণই সকল প্রকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

কোম্পানির শাসনকালে শুধু মুসলমান নবাব, অভিজাত মুসলিম পরিবারসমূহ ও উচ্চপদস্থ মুসলমান চাকুরিজীবীরা সর্বস্বান্ত হয় নি, তাদের সঙ্গে চরম দুর্দশার শিকার হয়েছে নিম্নবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী — কৃষক, তাঁতী, কারিকর প্রভৃতি। কৃষকের কথাই ধরা যাক। মোগল আমল থেকে কৃষক বা রায়ত ছিল ভূমির প্রকৃত মালিক। কৃষক জমি চাষ বা ফসল উৎপন্ন করার স্বাধীনতা ভোগ করত। তবে রাষ্ট্র যেহেতু তাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে সে কারণে তারা নির্দিষ্ট হারে সম্রাটকে প্রত্যক্ষভাবে কর প্রদান করত। সম্রাট ও রায়তের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু কোম্পানির অত্যাচারী নীলকর সাহেবগণ এই সনাতন ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিব্যবস্থার উপর মারাত্মক আঘাত হানে। তারা নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ধান, পাট, ডাল ইত্যাদির পরিবর্তে অসহায় কৃষককে নীল চাষ করতে বাধ্য করে। যেসব চাষী নীল চাষের ব্যাপারে আপত্তি জানায় তারা হলো নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার। বহু ক্ষেত্রে ইংরেজ নীলকরগণ রায়তের স্বত্বাধিকার অস্বীকার করে তাদের জমিতে ইজারাদার বা দালালের মাধ্যমে জোরপূর্বক নীলচাষের ব্যবস্থা করে। এর ফলে সাধারণ কৃষক যেমন সর্বস্বান্ত হলো, অপরদিকে তেমনি নীলের ব্যবসায় কোম্পানি আশাতীতভাবে মুনাফা অর্জন করতে লাগল।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি মুসলিমপ্রধান অঞ্চলের জমিগুলি ছিল নীলচাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এ কারণে এসব অঞ্চলের উপরই নীলকরদের শ্যেনদৃষ্টি। পড়ে। বাংলার এই বিশাল এলাকার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল রায়তের উপর ইংরেজ নীলকরগণ যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার চালায় ইতিহাসে তার নজীর বিরল। তার উপর ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেকটা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো কাজ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিতে লর্ড কর্নওয়ালিস এক নতুন জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করেন যারা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। যারা এককালে রাজস্ব আদায়কারী ছিল তারা কর্নওয়ালিসের সহায়তায় রাতারাতি জমিদার হয়ে গেল। কর্নওয়ালিশ সম্ভবত মনে করেছিলেন যে নতুন জমিদারগণ প্রজার সুখশান্তির দিকে নজর রাখবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অন্য রকম দেখা গেল। প্রজার কল্যাণচিন্তার পরিবর্তে তারা প্রজাপীড়ননীতি অনুসরণ করতে থাকে। নতুন জমিদারগণের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য এগিয়ে আসে জোতদার, ইজারাদার বা ঠিকাদার শ্রেণী। এদের দাপট অবশ্য কোম্পানির শাসনকালেও প্রবল ছিল। নতুন জমিদারদের তহবিলে যারা সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিত তারাই পেত জোতজমির ইজারা। ইজারাদারদের প্রধান লক্ষ্য ছিল চুক্তি মোতাবেক জমিদারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব মুনাফা লাভ করা। জোতজমি ও কৃষক সম্প্রদায় ছিল তাদের আয়ের প্রধান উৎস। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শোষণের শিকার হলো দরিদ্র কৃষক। অর্থের লোভে জমিদার, জোতদার, ইজারাদার একজোট হয়ে কৃষকদের উপর নানা প্রকার করভার চাপাতে থাকে। দরিদ্র কৃষক বাধ্য হয়ে তার ভিটেমাটি বন্ধক দিয়ে মহাজনের নিকট থেকে জমিদারের খাজনার টাকা সংগ্রহ করত। মূল ঋণের টাকার উপর চক্রবৃদ্ধি হারে যে সুদ জমা হতো তা পরিশোধ করাই কৃষকের পক্ষে অধিকাংশ সময় সম্ভব হতো না, মূল ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা। এ অবস্থায় মহাজনেরা সর্বস্বান্ত কৃষককে তার ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে নিজেরাই তা দখল করে নিত। উল্লেখ্য যে বাংলার অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান, কিন্তু তাদের যারা শোষণ করত অর্থাৎ জমিদার, জোতদার, ইজারাদার, মহাজন প্রভৃতি, তারা ছিল প্রধানত অমুসলমান। তার উপর এদের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে ইংরেজ নীলকর। এদের অনাচার-উৎপীড়নে জর্জরিত হয় কৃষককুল। এরা কৃষকের উপর ইচ্ছামতো মোটা অঙ্কের কর ও খাজানা ধার্য করেই ক্ষান্ত থাকত না, পূজা-পার্বন ইত্যাদির জন্যও মুসলমান রায়তের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করত। দরিদ্র রায়তের পক্ষে প্রায়শই বিরাট অংকের খাজানা বা চাঁদা পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। এ কারণে তাদের উপর চালানো হতো নির্মম দৈহিক নির্যাতন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দরিদ্র কৃষক শ্রেণী কিরূপ নির্যাতন ভোগ করেছে তার আভাস পাওয়া যায় লর্ড হেস্টিংস-এর

www.pathagar.com

বিবরণ থেকে। তিনি বলেন, ". . . the Settlement has, to our painful knowledge, subjected almost the whole of the lower classess . . . to most grievous oppression."[৩] [. . . আমরা জেনে ব্যথিত হয়েছি যে (চিরস্থায়ী) বন্দোবস্তের ফলে প্রায় গোটা নিম্নশ্রেণীই সর্বাপেক্ষা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছে।] তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম কৃষক শ্রেণীই নির্যাতনের প্রধান শিকার হয়েছে। মুসলিম জনমনে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় যখন অমুসলিম জমিদারগণ মুসলমানদের ধর্মকর্মের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এর স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়। বংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), চুয়ার বিদ্রোহ, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ও মানভূমের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৯৯), শেরপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৮২৫-৩৩), নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদের নীল বিদ্রোহ (১৮৬০) গোটা বঙ্গদেশকে প্রকম্পিত করে তোলে। এই বিদ্রোহাত্মক পটভূমিতে ফরায়জি নেতা শরিয়ত উল্লাহ্ বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ধারণ করেন।

৩ Mallick : প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

www.pathagar.com

৭

হাজী শরিয়ত উল্লাহ্
(১৭৮১-১৮৪০)

হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ ১৭৮১ সনে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা ও হুগলীতে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি আঠারো বছর বয়সে মক্কা গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি ওয়াহাবি আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রায় কুড়ি বছর বিদেশে অবস্থানের পর তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন থেকে ওয়াহাবিদের ন্যায় অক্লান্তভাবে ইসলাম প্রচারকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তিনি কিছুকাল আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ফরায়জি মতাদর্শ

আদর্শগত দিক থেকে ফরায়জি ও ওয়াহাবিদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। বরং বলা যায়, ওয়াহাবি আন্দোলনেরই আর একটি ধারা ফরায়জি আন্দোলন। ওয়াহাবিদের ন্যায় হাজী শরিয়ত উল্লাহও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিদেশী বিধর্মীদের রাজত্বে ইসলামী জীবনব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে না। এ সম্ভব কেবল ইসলামী রাষ্ট্রে। যে দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি সে দেশ **দারুল হারব** বা শত্রুর দেশ। ভারতবর্ষ যেহেতু বিদেশী বিধর্মী ইংরেজ জাতির শাসনাধীন সে কারণে এই দেশও **দারুল হারব**। শত্রুর দেশে যেসব মুলমান বসবাস করে তাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণ করাও এক প্রকার অসম্ভব। অর্থাৎ দেশে যতদিন ইংরেজের আধিপত্য বিদ্যমান থাকবে ততদিন মুসলমানদের পক্ষে ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসনসমূহ যথার্থভাবে পালন করা সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি স্বদেশের মুলসমানদের জুমআ ও ঈদের নামাজ বর্জনের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি পীরপূজা, পীরের দরগায় ওরস মানত ও মহররম পালনের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, ইসলামের রজ্জু শক্তভাবে ধারণ করাই ঐক্যের একমাত্র পথ। তিনি উপলব্ধি করেন যে শোষণ ও উৎপীড়নের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে মুসলিম সম্প্রদায়কে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে দাঁড়াতে হবে। পবিত্র কোরআনে যে পাঁচটি অবশ্য পালনীয় (ফরজ) মৌলনীতির কথা বলা হয়েছে তা যথার্থভাবে পালনের উপর তিনি বিশেষ

www.pathagar.com

গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পাঁচটি ফরজ হলো ঃ ঈমান বা আল্লাহ্‌র একত্বে ও রেসালতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত।

মানবসাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র ধর্মচিন্তা ও সমাজচিন্তার সমান্তরাল ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইসলামী সাম্যবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সাম্যের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি বলেন, সকল মুসলমান ভাই ভাই, অতএব মুসলিম সমাজে অসাম্য ও বর্ণ বা শ্রেণীভেদের কোন স্থান নেই। বর্ণভেদ বা শ্রেণীভেদ মাত্রই কুসংস্কার। এরূপ কুসংস্কার লালনের অর্থ মহাপাতকী হওয়া। এই মতাদর্শের ভিত্তিতে তিনি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান **আশরাফ** ও **আতরাফ**-এর শ্রেণীতে বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা করেন।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র আদর্শের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবিত্ত মুসলমান পেশাজীবী শ্রেণীসমূহ আকৃষ্ট হয়। শোষিত **আতরাফগণ** এই নতুন আদর্শের মধ্যে দেখতে পেল মুক্তির আলো। কাজেই দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী ও তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র পতাকাতলে যূথবদ্ধ হলো। অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারের উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তিলাভের আশায় এই নিম্নবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণীসমূহ যে নেতৃত্বের আশ্রয় খুঁজছিল তারই সন্ধান পেল হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র মধ্যে। তিনি মূলত ছিলেন ধর্মনেতা, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তায়। কৃষক, তাঁতী, তেলি প্রভৃতি নির্যাতিত শ্রেণী ধর্মনেতার নেতৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেখে স্থানীয় জমিদারগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তারা নানাপ্রকার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। উল্লেখ্য যে সেকালে রায়ত ও কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং জমিদারগণ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। কাজেই শোষক শ্রেণী কৃষকদের ঐক্যপ্রয়াসকে সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত বলে প্রমাণের চেষ্টা করে। কেবল তাই নয়, মুসলমান রায়তের উপর জমিদারের অত্যাচারের মাত্রাও প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ফরায়জিদের প্রতিরোধ আন্দোলনও ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। সারা দেশে তখন অভাব-অনটন। লবণ দুর্মূল্য। এ অবস্থায় ফরায়জি কর্মীগণ নুন-ভাতের দাবি তোলে।[১] ব্যবসায়ী মহাজন আতংকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরায়জি আন্দোলন শক্তিশালী শোষক শ্রেণীর প্রবল আক্রমণের মুখে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হাজী শরিয়ত উল্লাহ তাঁর চট্টগ্রামস্থ বাসভবন থেকে বিতাড়িত হন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে জন্মস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৪০ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

---

১ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রদত্ত তথ্য

www.pathagar.com

শাসনতান্ত্রিক মতবাদ

রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি বিষয়ে হাজী শরিয়ত উল্লাহর মতবাদ বিস্তারিতভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে কিনা জানা যায় না। তবে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শের অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত মুনশীগঞ্জের রেকাবি বাজারে তিনি যে ফরায়জি বসতি গড়ে তুলেছিলেন সেখানে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার আদলে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা থেকে বুঝা যায়, তিনি শাসনব্যবস্থায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রাধান্য বজায় রাখার পক্ষপাতী। অর্থাৎ, যাঁরা নির্বাচিত প্রতিনিধি কেবল তাঁরাই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব পালনের অধিকারী। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, গণনির্বাচিত পঞ্চায়েতগণ কখনো জনকল্যাণবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তিনি অবশ্য ইসলামী শাসনপদ্ধতি কায়েম করার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। ইসলামের রীতিনীতি ও কোরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এটাই তাঁর কাম্য ছিল। এছাড়া সরকারের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তিনি আর কোন ব্যাখ্যা দান করেছেন কিনা সন্দেহ। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি মানবসাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

গুরুত্ব বিচার

আঠারো শতকের শেষার্ধে যেসব আন্দোলন বাংলার সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর মধ্যে ফরায়জি আন্দোলন অন্যতম। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে পতনোন্মুখ মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবনকল্পে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ফরায়জি আন্দোলন শুরু করেন। কাজেই এক হিসাবে ফরায়জি আন্দোলন ছিল ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার ও বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হাজী শরিয়ত উল্লাহ তার মূলোৎপাটনে ব্রতী হয়েছিলেন।

আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে ফরায়জি আন্দোলন ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। নীলকর ও জমিদারের উৎপীড়নে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় যখন জর্জরিত তখন এই সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাজী শরিয়ত উল্লাহ এগিয়ে আসেন। তাঁর এই প্রয়াস স্বাভাবিকভাবেই শোষক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এদিক থেকে হাজী শরিয়ত উল্লাহকে শ্রেণীসংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎরূপে চিহ্নিত করা যায়।

বস্তুত হাজী শরিয়ত উল্লাহ এমন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা কায়েমের পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়নের লেশমাত্র থাকবে না, যেখানে মানুষ সাম্যের ভিত্তিতে জীবনাচরণ করবে। এজন্য তিনি বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি ও ব্যাধির প্রতি

www.pathagar.com

অকুতোভয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যে সমাজ মানবসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সে সমাজে শ্রেণীবিচ্ছিন্নতা ও শোষণ-উৎপীড়ন থাকে না। মানবসাম্যবাদে তাঁর দৃঢ় আস্থা তাঁর চিন্তাধারাকে এক নতুন তাৎপর্য দান করে। তিনি মানুষকে একটি নির্জীব ব্যক্তিসত্তারূপে দেখেন নি, তাকে দেখেছেন একটি অধিকারসচেতন, মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হিসাবে। একারণে মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ তিনি বরদাশ্‌ত করেন নি। এ দিক থেকে প্রাচীন হেলেনিস্টিক চিন্তাবিদ যেনো ও খৃসিপাসের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারা তুলনীয়, কারণ তাঁরা উভয়ে মানুষের ব্যক্তিক সত্তার মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেন। তাছাড়া হাজী শরিয়ত উল্লাহর কৃতিত্ব এই যে তিনি জনসাধারণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। কোন বিদেশী লেখক এই অভিমত পোষণ করেন যে হাজী শরিয়ত উল্লাহ যেহেতু ধর্মের পতাকাতলে আন্দোলন পরিচালনা করেন সে কারণে তিনি সাম্প্রদায়িক ও সেক্টারিয়ান মানসিকতামুক্ত হতে পারেন নি।[২] এ অভিমত আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ মনে হলেও হাজী শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

২ Wilfred Cantwell Smith : ***Modern Islam in India,*** (Lahore, 1943), pp. 189-90

www.pathagar.com

৮

মুহম্মদ মহসিন (দুদু মিয়া)
(১৮১৯-১৮৬২)

হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মহসিন ওরফে দুদু মিয়া পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮১৯ সনে মাদারিপুর মহকুমার মুলফৎগঞ্জে দুদু মিয়ার জন্ম। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি পিতার কাছে কোরআন ও হাদিস শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে তিনি হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এবং সেখানে ওয়াহাবি ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। ওয়াহাবি মতাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য তারও পূর্বে পিতার সামাজিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি সুসংহত শক্তিরূপে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাতে থাকেন। তাঁর সংগঠনী শক্তি ছিল অসাধারণ। এজন্য তিনি অল্পকালের মধ্যে মুসলিম সমাজে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

দুদু মিয়ার আন্দোলন

বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণ মেলে যে দুদু মিয়ার নেতৃত্বেই ফরায়জি আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী রাজনীতিক-সামাজিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করেছিল। পিতার ন্যায় তিনিও শুধু ধর্মীয় সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেন নি, বরং তিনি সমাজের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধিসমূহ নির্মূল করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, সমাজে বিদ্যমান অসাম্য ও শ্রেণীগত বৈষম্যই সমাজের অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। অতএব, প্রথমত সমাজের সকল মানুষকে এক কাতারে শামিল করতে হবে এবং তাদের মধ্যে রচনা করতে হবে সাম্য ও মৈত্রীর সেতুবন্ধন ; দ্বিতীয়ত শোষণ ও নির্যাতনের কবল থেকে দীনদরিদ্রকে রক্ষা করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস, খাঁটি ইসলামী শাসনপদ্ধতি কায়েম করা হলে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে। তবে কেবল প্রচারকার্য দ্বারা লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। তা করতে হলে আন্দোলন এমনকি প্রতিরোধ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হবে। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার মতাদর্শগত ও পদ্ধতিচিন্তাগত পার্থক্য প্রসঙ্গত লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

প্রথম জন কিছুটা নরমপন্থী ও প্রচারকার্যের মাধ্যমে সংস্কারে বিশ্বাসী। কিন্তু দ্বিতীয় জন অনেকটা উগ্রপন্থী এবং প্রতিরোধ বা সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী।

প্রশাসনচিন্তা

মুহম্মদ মহসিন (দুদু মিয়া) শুধু সংগ্রামী নেতা ছিলেন না, একজন সুদক্ষ সংগঠক হিসাবেও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি যেভাবে পূর্ববাংলার প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করেন তা থেকে তাঁর প্রশাসনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রধানত খিলাফতের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসন-কাঠামো রচনা করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে ইমাম বা খলিফার হাতে। খলিফা একাধারে ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রনেতা। তিনি একদিকে যেমন মুসলমান নাগরিকের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় জীবনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, অপরদিকে রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য যে মধ্যযুগের য়ুরোপীয় খ্রীস্টান চিন্তাবিধ গিলাসিয়াস যেভাবে আধ্যাত্মিক ও লোকায়ত শক্তিকে দুটি স্বতন্ত্র তরবারিরূপে চিন্তা করেছেন[১] দুদু মিয়া সেভাবে দেখেন নি। তিনি লোকায়ত শক্তিকে ধর্মীয় শক্তির অধীনে রেখেছেন।

দুদু মিয়ার প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতগুলি **হলকা** বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক **হলকা** গঠন করা হয়েছে তিন শত থেকে পাঁচ শত পরিবার নিয়ে। **হলকার** প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে **সিয়াসি খলিফাকে** অর্থাৎ প্রধান খলিফার প্রতিনিধিকে। **সিয়াসি খলিফার** কাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি রক্ষা, হলকার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাজে সহযোগিতা করা। তবে স্থানীয় পর্যায়ে দুদু মিয়া ন্যায়বিচারের স্বার্থে পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। এছাড়া তিনি গোটা রাষ্ট্রের শাসনভার **মিয়ার** হাতে ন্যস্ত করার কথা বলেন। 'মিয়া' অর্থ প্রধান খলিফা। **মিয়া** রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন, সকল নাগরিক যাতে সাম্যের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে পারে তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর মামলা-মোকদ্দমার বিচার করবেন আইনের ভিত্তিতে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বত্র গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অস্বীকার করেন নি। এ প্রসঙ্গে দেশবাসী কিভাবে শত্রুর মোকাবিলা করবে সে বিষয়ে দুদু মিয়া তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, শত্রুপক্ষ যদি আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে রাজী না থাকে সেক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক বা সহিংস পন্থা গ্রহণ করা

---

১ George H. Sabine : ***A History of Political Theory,*** revised ed. (New Delhi, 1973), pp. 188-190

www.pathagar.com

অন্যায় নয়। এমন কি যারা তাঁর আদর্শের বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। এখানে প্রাচীন ভারতের কৌটিল্য বা আধুনিক য়ুরোপের মেকিয়াভেলীর চিন্তাধারার সঙ্গে দুদু মিয়ার চিন্তাধারার কিছুটা মিল দেখা যায়।

জনমনে দুদু মিয়ার প্রভাব

বাহাদুরপুর ছিল দুদু মিয়ার প্রধান কর্মকেন্দ্র। এখানে অবস্থানকালে তিনি শোষক ও উৎপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধবাহিনী সংগঠিত করেন। নীলকর ও হিন্দু জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দরিদ্র কৃষক শ্রেণী দলে দলে এই প্রতিরোধবাহিনীতে যোগদান করে। উল্লেখ্য যে কিছু সংখ্যক হিন্দুও দুদু মিয়ার প্রশাসন-ব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিয়োগলাভ করেছিল। দুদু মিয়ার আন্দোলনে কৃষকদের বিপুল সংখ্যায় যোগদানের প্রধান কারণ এই যে তারা এ আন্দোলনকে শোষণমুক্তির আন্দোলন হিসাবে দেখেছিল। নির্যাতিত মানবতার প্রতি দুদু মিয়ার সহমর্মিতা জনমানসে স্বাভাবিকভাবে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। দরিদ্র কৃষক, তাঁতী, কারিকর প্রভৃতি যখন দুদু মিয়ার নেতৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নূন-ভাতের দাবি তোলে তখন শোষকগণ তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। উপরন্তু দুদু মিয়ার তথা ফরায়জিদের ইসলামী সমাজবাদ একদিকে যেমন দরিদ্র জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল অপরদিকে শোষকদের মনে সৃষ্টি করেছিল প্রবল অতঙ্ক।

দুদু মিয়ার সমাজবাদের মূলকথা, বিশ্বের মালিক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্, সুতরাং পার্থিব জগতের ভূসম্পত্তিসহ সকল প্রকার সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকও আল্লাহ্।[২] এমনকি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিকেও তিনি অবৈধ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। তদ্রূপ কর বা খাজানা যদি দিতে হয় তা আল্লাহর পথে দিতে হবে, কোন ব্যক্তি তার দাবিদার হতে পারে না। তৎকালীন জমিদারগণ রায়তের উপর যে তেইশ প্রকার খাজানা ও কর আরোপ করেছিল দুদু মিয়া তাকে বেআইনী ও নীতিবিরুদ্ধ বলেন। জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ অত্যন্ত সোচ্চার ছিল। তিনি বলেন, প্রজাপীড়ন ও প্রজাশোষণ শুধু অন্যায় নয়, পাপও বটে। মানুষ মাত্রেই আল্লাহর দাস, কোন জমিদার-জোতদারের প্রজা নয়। কাজেই জমিদারকে কোন কর বা খাজানা প্রদান করাও অন্যায়। জমিদারকে যাতে অবৈধ ভূমিকর বা খাজানা দিতে না হয় সেজন্য দুদু মিয়া কৃষকগণকে সরকারি খাসমহলে বসবাস করতে নির্দেশ দান করেন। এছাড়া ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রজার নিকট থেকে যেসব চাঁদা জোরপূর্বক আদায় করত দুদু

---

২ Mallick : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

www.pathagar.com

মিয়া তার প্রবল বিরোধিতা করেন এবং এ ধরনের চাঁদা দিতে মুসলমান প্রজাদের নিষেধ করেন।

দুদু মিয়ার প্রতিরোধ আন্দোলন দমনের জন্য শোষক শ্রেণী একজোট হয়ে প্রজাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। এসময়ে মুসলমান প্রজা জমিদারের কাছারিতে যেরূপ দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার বিবরণ বহু তথ্য থেকে পাওয়া যায়। ডঃ এ. আর. মল্লিক বলেন, "The beards of the recalcitrant ryots were tied together and red chilli powder given as snuff."[৩] অর্থাৎ, অবাধ্য রায়তদের দাড়িতে একসাথে গিঁট বেঁধে দেওয়া হতো এবং লাল মরিচের গুঁড়ো নস্যির মতো নাকে পুরে দেওয়া হতো। নীলকর ও জমিদারের এ হেন নির্যাতন সত্ত্বেও দুদু মিয়ার প্রতিরোধ সংগ্রাম মোটেও স্তিমিত হয় নি, বরং ক্রমশ প্রবলতর হয়েছে। ১৮৬৯ সনের খাজানা আইন ও ১৮৮৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মধ্যবর্তী কালে এই সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল।

ফরায়জি আন্দোলন কি শ্রেণী সংগ্রাম?

পূর্ববর্তী আলোচনায় ফরায়জি আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে আভাস দেওয়া হয়েছে। বস্তুত ফরায়জি আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যাবে যে এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সামাজিক-রাজনৈতিক, এমনকি শ্রেণীবাদী সংগ্রামের চরিত্র লাভ করেছিল। শোষিত রায়ত-কৃষক শ্রেণীর জীবন ধারনের অধিকার সুরক্ষাকল্পে ফরায়জি নেতা মুহম্মদ মহসিন (দুদু মিয়া) নীলকর ও জমিদার প্রভৃতি শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে দমনের উদ্দেশ্যে শোষক শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে খুন, সন্ত্রাস ও রাজদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করে। বিচারে অবশ্য কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। তবু সিপাহি বিপ্লবকালে দুদু মিয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগের দরুন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় যার ফলে ১৮৬২ সনে তাঁর সংগ্রামী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দুদু মিয়ার ভূমিকার গুরুত্ব বিচার

বাংলার সামাজিক-রাজনীতিক ক্ষেত্রে দুদু মিয়া যে অবদান রেখেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রথমত তিনি ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনের প্রধান নেতা হয়েও নির্যাতিত মানবতার দুর্দশা মোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শোষক শ্রেণীর উৎপীড়নের কবল থেকে নিঃসহায় দরিদ্র শ্রেণীকে রক্ষার জন্য তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। বস্তুত তার অনুসৃত রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রধানত আন্দোলনবাদী এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংগ্রামবাদী। পরবর্তীকালে

---

৩ Mallick : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে উপমহাদেশের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

দ্বিতীয়ত, শ্রেণীবিভক্ত ভারতীয় সমাজে মানবসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য দুদু মিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানবসমাজে বিদ্যমান শ্রেণীভেদ-প্রথা শোষণ-নির্যাতনের উৎস এই উপলব্ধি তাঁকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতরাং পূর্ববাংলার শ্রেণীসংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে দুদু মিয়াকে চিহ্নিত করা যায় নিঃসন্দেহে।

তৃতীয়ত, দুদু মিয়ার সম্পত্তিতত্ত্বে তাঁর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত। পার্থিব জগতের সকল প্রকার সম্পত্তি ও সম্পদের মালিক আল্লাহ্, মানুষ তার মালিকানা দাবি করতে পারে না — দুদু মিয়ার এই ধারণায় সমাজবাদের বীজ নিহিত রয়েছে। তাঁর ধারণা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ সম্পত্তি সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এ নয় যে কিছু সংখ্যক মানুষ সম্পত্তি ভোগ করবে এবং জনসাধারণ অভুক্ত থেকে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করবে। ইংলণ্ডের চিন্তাবিদ জন লক-এর সম্পত্তিতত্ত্বেও কিছুটা এরকমের ভাবধারার আভাস পাওয়া যায়। আল্লাহপ্রদত্ত পার্থিব সম্পদে সকলের অধিকার সমান — জন লক-এর এই ধারণার সঙ্গে দুদু মিয়ার সম্পত্তিচিন্তার যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে সম্পত্তি ও সম্পদ রাষ্ট্রের বা সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিনা সে বিষয়ে দুদু মিয়ার ধারণা তেমন সুস্পষ্ট নয়। যেহেতু তিনি ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রবক্তা, এ থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি কোরআনের অনুশাসন মোতাবেক সম্পত্তিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে দুদু মিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে উৎপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষার প্রয়াস পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে ততটা উৎসাহী ছিলেন কিনা সন্দেহ। কোম্পানির কবল থেকে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রশ্নটি তাঁর কাছে মুখ্য ছিল না, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটানো। যেহেতু জমিদার শ্রেণীকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উৎপীড়নকারী শক্তি হিসাবে দেখেছিলেন, সম্ভবত সেকারণে তিনি সর্বাগ্রে এই শক্তিকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ দেশোদ্ধার অপেক্ষা নির্যাতিত মানবতার মুক্তির প্রশ্নটি তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। দুদু মিয়ার অবদান এই যে তিনি যে সংগ্রামী ধারার সূচনা করেন তৎকালের ও পরবর্তীকালের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তার বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে বলা যেতে পারে যে দুদু মিয়ার আন্দোলন শুধু বাংলায়, বিশেষত পূর্ব বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল বলে তা সর্বভারতীয় আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে নি। আবার এ কথাও বলা যায় যে ফরায়জি আন্দোলনের আর একটি ধারা অর্থাৎ ওয়াহাবি ধারা সমগ্র উপমহাদেশের পটভূমিকায় বিস্তারলাভ করেছিল।

www.pathagar.com

নবজাগৃতির সূচনা

৯

রামমোহন রায়
(১৭৭৪-১৮৩৩)

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপে এক নবযুগের সূচনা ঘটে। এ সময় ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব এবং ফ্রান্সের রক্তক্ষয়ী বিপ্লব — যা ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) নামে পরিচিত — সারা বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম বিপ্লবটি অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। বস্তুত উভয় বিপ্লবের প্রভাবে নতুন নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল। শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদ, স্বাতন্ত্র্যবাদ এমনকি সমাজবাদের পশ্চাদভূমি রচনা করেছিল, অপরদিকে ফরাসী বিপ্লব মানবজাতিকে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল। এসময়ে ভারতের কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনধারার সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মির্জা এ'তেশামউদ্দীন, যিনি রামমোহনের পূর্বে ১৭৬৫ সনে বিলাত ভ্রমণ করেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ সনে, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামমোহন আজীবন ধর্মশাস্ত্র চর্চা ও অধ্যাত্মবাদের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন। জ্ঞানচর্চার সূত্রে তিনি বহু ভাষাও আয়ত্ত করেন; বিশেষত আরবি ফারসি উর্দু ফরাসী লাটিন ও গ্রীক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। তিনি **বেদান্তসূত্র** ও **বেদান্তসারসহ কেন, ঈশা, কঠ, মুণ্ডক** ও **মাণ্ডুক্য** এই পাঁচটি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ

তুহ্‌ফাতুল মুয়াহ্‌হিদীন, মনজারাতুল আদিয়ান, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি ছিলেন **সম্বাদ কৌমুদী, মিরাতুল আখবার** ও *Brahmanical Magazine* নামক তিনটি পত্রিকার প্রকাশক।

রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষাপট

রামমোহনের পক্ষে স্বগৃহে নির্বিঘ্নে শাস্ত্রচর্চা করা সম্ভব হয় নি। তিনি হিন্দুধর্মের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এজন্য স্বগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তিনি রংপুরের কালেক্টর জন ডিগবি'র দফতরে সেরেস্তাদারের পদে

www.pathagar.com

যোগদান করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি দেওয়ান-এর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন ডিগবিকে মুগ্ধ করে এবং অচিরে উভয়ে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। ডিগবি'র সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে রামমোহন পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ফরাসী বিপ্লবের মর্মবাণী এবং জন লক, মঁতেক (Montesquieu) রুসো, বলতেয়ার (Voltaire), ও জেফারসন প্রমুখ মনীষীর মতাদর্শ তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। একজন সমাজসচেতন মুক্তবুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে রামমোহন অল্পকালের মধ্যে বিদ্বৎসমাজে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রামমোহন যখন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নতুন রাজনীতিক সচেতনতার উন্মেষ ঘটে যার ফলে প্রাচীন বা সনাতন বিধিবিধান, আচারবিচার ইত্যাদি মানবকল্যাণের সহায়ক কিনা সে সম্পর্কে তারা বিচারব্যাখ্যা শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত মহলে ধর্মের ব্যাপারে **কনফরমিটির** বা অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে যুক্তির কষ্টিপাথরে সবকিছু যাচাই করে নেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণ রাজশক্তির প্রতি যে উদাসীনতা প্রদর্শন করে উনিশ শতকের সূচনা থেকে এই মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে ওঠে ইংরেজ রাজপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাছাড়া, হিন্দু সমাজে তখন পর্যন্ত জাতীয়তাবোধ তেমন সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত হয় নি, যে কারণে বিদেশী, বিজাতি ও বিভাষী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অসহযোগিতা করার প্রশ্ন তাদের কাছে দেখা দেয় নি। তৃতীয়ত, এ সময় হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকে। এর মূল কারণ ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ যেভাবে সরকারি চাকুরি, আইন-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে তার ফলে তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল হতাশা দেখা দেয়। এই হতাশাই উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘাতের মূল কারণ।

বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় চিন্তা

আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সামাজিক ও রাজনীতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্বকীয় চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গড়তে প্রয়াসী হন। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় তিনটি ভিন্নমুখী ধারা লক্ষণীয় ঃ গ্রীকো-ইসলামী ধারা, বৈদান্তিক ধারা এবং পাশ্চাত্য উদারবাদী ধারা। প্রথম ধারা থেকে তিনি এরিস্টটলের যুক্তিবাদ, ইসলামের একেশ্বরবাদ ও মানবসাম্যের আদর্শ গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়

www.pathagar.com

ধারা থেকে গ্রহণ করেন বেদান্ত দর্শনের, বিশেষ করে শংকরের অদ্বৈতবাদ এবং তৃতীয় ধারা থেকে যুক্তিবাদ, প্রয়োগবাদ ও উদারবাদ। এই তিনটি ধারাই তাঁর চিন্তাজগতে সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কারণে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিশেষত হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার উচ্ছেদকল্পে তিনি অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। উপরন্তু তিনি হিন্দুসমাজে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথার ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, হিন্দুসমাজে প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথার কারণে এই সমাজ বহুধা বিভক্ত, এজন্য কোন বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনীতিক প্রশ্নে হিন্দুসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয় নি।[১] বলা বাহুল্য রামমোহন যেভাবে কদর্য লোকাচার, পৌত্তলিকতা ও সতীদাহ ইত্যাদির ঘোর বিরোধিতা করেন সেজন্য সনাতনপন্থী হিন্দুগণ তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন।

রাজা রামমোহন তাঁর ব্রাহ্মধর্মে বিভিন্ন ধর্মের, বিশেষত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টধর্মের মূল আদর্শসমূহ সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, সকল ধর্মের মূল আদর্শ মোটামুটিভাবে অভিন্ন। মানবকল্যাণ, সত্যানুসন্ধান, ন্যায়নিষ্ঠ জীবনাচরণ ও বিশ্বস্রষ্টার উপাসনা সকল ধর্মের মূল আদর্শ। তবে দেশ, কাল, আবহাওয়া ও নৃতাত্ত্বিক কারণে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উপসনাপদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মানুষ যখনই মূল ধর্মাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারই পরিণতিতে নানারকম কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের মোহ তাকে আচ্ছন্ন করেছে।[২] রামমোহন চেয়েছিলেন সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচনা করতে। কিন্তু একথাও সত্য, তিনি সার্বভৌমিক ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিতে সকল ধর্মের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষপাতী। অর্থাৎ কোন ধর্মমতের উপর আঘাত হানা তিনি পছন্দ করেন নি। অথবা কোন ধর্মের অবলুপ্তি বা বিভিন্ন ধর্মমতের একীভূতকরণ কোনটিই তাঁর লক্ষ্য ছিল না।[৩] মোট কথা, রাজা রামমোহন এমন এক ধর্মমত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী যা সর্বজনীন এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার সহায়ক।

রামমোহনের ধর্মীয় মতবাদের মূল উৎস বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র। তিনি বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও কোরআন থেকে চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে স্বীয় ধর্মাদর্শ নির্মাণ করেন। তাঁর ধর্মচিন্তায় ইসলামী সুফিবাদের প্রভাবও লক্ষণীয়। তা বলে রামানন্দ, চৈতন্য, নানক বা কবীরের ন্যায় তাঁকে ধর্মপ্রচারক বলা যায় না। আসলে সনাতন সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি এক সর্বজনীন উদারবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

---

১ Amitabha Mukherjee : ***Reform and Regeneration in Bengal,*** (Calcutta, 1968), p. 140

২ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : **বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা** (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ. ৩২

৩ ঐ, পৃ. ৩৪

www.pathagar.com

রাজনৈতিক মতাদর্শ

রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তার মূলকথা মানবকল্যাণ। তাঁর ধর্মচিন্তার মূলকথাও তাই। এজন্য কিশোরী চাঁদ মিত্র তাঁকে A Rreligious Benthamite বলেছেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন সেদেশের হিতবাদী বা উপযোগবাদী চিন্তাবিদদের (Utilitarians) সান্নিধ্য লাভ করেন। বিশেষত বেনথাম ও জেম্‌স্ মিল-এর হিতবাদী মতবাদ তাঁর চিন্তাজগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এছাড়া য়ুরোপের প্রয়োগবাদী দর্শনের (Pragmatism) প্রভাবে গোঁড়া মতবাদ, অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির উপর তাঁর বিশ্বাস লোপ পায়। তিনি বলেন, অলৌকিক কিছুতে আস্থা স্থাপন করতে গেলে বাস্তব ও কল্পিত বস্তুর মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তায় সনাতন মূল্যবোধ ও য়ুরোপীয় প্রয়োগবাদের সমান প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রামমোহনের অপর বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রধানত আরোহী (inductive) পদ্ধতিকে আশ্রয় করে রাষ্ট্রচিন্তার কাঠামো নির্মাণ করেন। অর্থাৎ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিত্তিমূলে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিষ্ঠিত। তিনি পূর্বচিন্তিত প্রপঞ্চের ভিত্তিতে সুবিন্যস্তভাবে রাষ্ট্রচিন্তা রচনা করেন নি, যেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার অস্পষ্টতা দুর্লক্ষ্য নয়। তবে যেহেতু তিনি নিজে হিতবাদের অনুসারী সে কারণে তিনি রাষ্ট্রকে দেখেছেন একটি কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে। রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম শক্তি এই প্রত্যয়ে তাঁর অনাস্থা ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হাতে কুক্ষিগত থাকা অন্যায় এ-কথা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেন। মনে হয় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এবং আধুনিক ফরাসী দার্শনিক মঁতেক (Montesquieu) উভয়েই রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করেছেন। রাষ্ট্রে ব্যক্তির শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এরিস্টটল বা মঁতেক-এর ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন, নির্বাহী ও বিচার ক্ষমতা বিশেষ ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকলে ঐ ব্যক্তি বা বিভাগ অনিবার্যভাবে স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে। এটা যাতে না ঘটে সেজন্য রামমোহন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, নির্বাহী ও বিচার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে যথাক্রমে বিধানসভা, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের হাতে। বস্তুত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পালন করা হলে আমলা-অমাত্যের দৌরাত্ম্যও হ্রাস পাবে। আইন রচনার ক্ষমতা আমলাকে দেওয়া হলে তার পরিণাম শুভ হয় না একথা তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। এ্যাডামের প্রেস অর্ডিন্যান্স-এর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি তাঁর যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেন।

www.pathagar.com

রামমোহন রায় মানবসমাজকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন ঃ প্রতারক, প্রতারিত ; যারা প্রতারক ও প্রতারিত উভয়ই এবং যারা দুয়ের কোনটি নয়।[৪] এ ধরনের শ্রেণীগুলি বিদ্যমান থাকার কারণে মানবসমাজে অনৈক্য বৈষম্য ও দুর্দশা বিরাজমান। ইংরেজ শাসনামলেও প্রতারক শ্রেণীর হাতে অন্যেরা যেভাবে প্রতারিত হয়েছে তার ফলে নির্যাতিত শ্রেণী শুধু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছে তাই নয়, তারা শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বস্তুত শোষণ-উৎপীড়ন সাধারণ মানুষকে অধিকতর রাজনীতিসচেতন করে তোলে।

রামমোহন স্বদেশের স্বাধীনতার সপক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি প্রথম দিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে এর কল্যাণকর দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভারতের সার্বিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে আরো বহু বছর এদেশে ইংরেজ শাসন বিদ্যমান থাকা উচিত। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে ইংরেজ জাতির শাসনপদ্ধতি, বিধিবিধান, ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষাপ্রণালী, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণব্যবস্থা ও জুরি দ্বারা বিচার ইত্যাদি যতদিন না এদেশে পূর্ণরূপে প্রবর্তিত হবে ততদিন প্রকৃত অর্থে এদেশের কল্যাণ ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ থাকবে। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনে ও বিচার বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নাগরিককে নিয়োগদানের সুপারিশ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সনাতন ভারতীয় শাসনপদ্ধতিকে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার আদলে গড়ে তুলতে আগ্রহী। আবার, তিনি বিচারব্যবস্থায় সর্বপ্রকার ধর্মীয় বা জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতা করেন। বিশেষত তিনি ১৮২৭ সনের জুরি আইনের জাতীয় বৈষম্যমূলক চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করেন।

রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তার ব্যাখ্যায় যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইংলণ্ডের উদারবাদী আদর্শের গভীর প্রভাব এর মূল কারণ। প্রকৃতপক্ষে এদেশে উদারবাদী আদর্শ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রামমোহনই সর্বপ্রথম রচনা করেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে একথা রামমোহন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। স্বভাবতই তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে সংবাদপত্রের সরকারবিরোধী সমালোচনা বা প্রচারণার প্রতি সরকার সঙ্গত কারণেই সহনশীল মনোভাব পোষণ করে নি। ১৭৮০ সনে প্রতিষ্ঠিত *Hicky's Bengal Gazette* সংবাদপত্রের

৪ Amitabha : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

www.pathagar.com

জগতে এক নতুন ধারার সূচনা করে। সংবাদপত্রের নৈতিক দায়িত্ব সরকারের অন্যায় কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করা এবং প্রয়োজনবোধে সঠিক পথনির্দেশ করা — এই মহৎ নীতি সমুন্নত রাখার কাজে পত্রিকাটি অক্লান্ত প্রয়াস চালায়। ১৭৯৯ সনে লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে সরকারের সচিব বা প্রতিনিধির পরীক্ষা ব্যতিরেকে পত্রিকা প্রকাশ করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি এই আদেশ লঙ্ঘন করে পত্রিকা প্রকাশ করে তাহলে তাকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হবে। এ ছাড়া তিনি সংবাদপত্রের জন্য নীতিমালাও ঘোষণা করেন। কিন্তু *Calcutta Journal*-এর সম্পাদক জে. এস. বাকিংহাম এবং **সম্বাদ কৌমুদী** ও **মিরাত-উল আখবার**-এর সম্পাদক রাজা রামমোহন সরকারের নির্দেশ ও নীতিমালা অগ্রাহ্য করে সরকারের কর্মকাণ্ডের যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা প্রকাশ করতে থাকেন। গবর্নর জেনারেল জন এডাম এতে রুষ্ট হয়ে বাকিংহামকে নির্বাসনদণ্ড দেন। উপরন্তু তিনি এ মর্মে এক প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করেন (১৪ মার্চ, ১৮২৩) যে গবর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে কেউ পত্রিকা প্রকাশ করতে পারবে না। প্রচলিত নিয়মানুসারে এই অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) নিবন্ধীকরণের জন্য সুপ্রীম কোর্টে পেশ করা হয়। এই প্রেস অধ্যাদেশ-এর বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা সুপ্রীম কোর্টে এক আর্জিপত্র পেশ করেন। আর্জিপত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখা হয়।[৫] আর্জিপত্রের সারমর্ম ছিল ঃ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার না থাকলে মানবচরিত্রের উৎকর্ষ ঘটে না। এই স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা আদর্শ সরকারের উচিত নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত ক্ষতিকর হয় না, বরং এই অধিকার হরণ করা হলে অপকার সাধিত হয়। তা ছাড়া স্বাধীন সংবাদপত্রের সাহায্যেই সরকার জনগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জনে সক্ষম হয়।

সুপ্রীম কোর্ট এই আর্জিপত্র অগ্রাহ্য করে। এর প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর **মিরাত-উল-আখবার**-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। রামমোহন ও অন্যান্য নেতা এই প্রতিবাদী আন্দোলনকে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডঃ আর. সি. মজুমদার 'ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা' বলে উল্লখ করেন।

স্বাধীনতাতত্ত্ব

রাজা রামমোহনের নিকট স্বাধীনতা ছিল অত্যন্ত প্রিয়। স্বাধীনতা বলতে তিনি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা অঞ্চলের স্বাধীনতা বুঝান নি, তাঁর স্বাধীনতাতত্ত্ব আন্তর্জাতিকতাবাদী। তিনি

---

৫ সৌরেন্দ্রমোহন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন, বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতার জয় ঘোষিত হোক। তিনি বলেন, Enemies to liberty and friends of despotism have never been and will never be ultimately successful.[৬] (অর্থাৎ, যারা স্বাধীনতার শত্রু এবং স্বৈরতন্ত্রের মিত্র তারা কখনো সফল হয়নি এবং কখনো হবেও না।) তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র স্বাধীন পরিবেশেই মানুষের সৃজনী সত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। যে সমাজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেখানে মানবসত্তা লাঞ্ছিত হয় এবং সৃজনী প্রতিভা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

স্বাধীনতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ হেতু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল উদারপন্থী। সমাজের শোষিত শ্রেণীর স্বাধিকার সুরক্ষার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর কৃষকনির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর প্রতিবাদ করেই (১৮৩১ খ্রীঃ) ক্ষান্ত থাকেন নি, কৃষকদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। তবে রামমোহনচরিত্রের আর একটি দিক প্রসঙ্গত তুলে ধরা আবশ্যক। তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্পক্ষেত্রে যে চরম অনাচার চলছিল, যার ফলে দরিদ্র শ্রমিক ও তাঁতী সম্প্রদায় চরম বিপন্নদশায় পতিত হয়েছিল, সে-সম্পর্কে রামমোহন তেমন উচ্চবাচ্য করেন নি। তাছাড়া ইংরেজ সরকার ইংলণ্ডের স্বার্থে যেভাবে ভারতীয় শিল্পসংহার করে স্বদেশে শিল্পবিপ্লব সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতকে পরিণত করেছিল ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজারে, এ বিষয়েও রামমোহন নীরব ছিলেন। বরং দেখা যায় যে তিনি ইংলন্ডের সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যের সুফলের কথাই লিখে গেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের মূলে ব্রিটিশ স্বার্থের যে প্রশ্নটি জড়িত ছিল তার সাথে স্বদেশের শিল্পস্বার্থকে অভিন্নভাবে দেখেছিলেন। ভারতের শিল্পস্বার্থ ও ব্রিটিশ জাতির শিল্পস্বার্থ এক হতে পারে না একথা তিনি সম্ভবত উপলব্ধি করেন নি।

পরিশেষে, রাজা রামমোহনের যুগ ছিল রাজনীতিক সচেতনতার এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতিক আন্দোলনের সূচনাকাল। সে সময় একদিকে যেমন নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রসার ঘটে, অপর দিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক বিধিবিধানও প্রবর্তিত হয়। আবার গদ্যসাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রভূত উৎকর্ষ ঘটেছিল সে সময়। বিশেষত রামমোহন বাংলা সাহিত্যে যে গদ্যরীতির সূচনা করেন তার মাধ্যমে সামাজিক আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস অধিকতর সার্থকতা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা হচ্ছে সমাজচেতনা ও সামাজিক আবেদন। উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগৃতি বা রেনেসাঁর ঢেউ জাগে তার পটভূমি রচনা করেন রামমোহন এবং তদীয় সহযোগীবৃন্দ। নির্দ্বিধায় বলা যায়, এই রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ রাজা

৬ Amitabha : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

www.pathagar.com

রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

> ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করে গেছেন রামমোহন রায়। . . . আত্মবিস্মৃতির দৈন্য থেকে তিনি আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আপোষহীন, বন্ধনহীন অন্তরের শক্তি দিয়ে দেশে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন।

www.pathagar.com

উদারবাদী রাজনীতি

১০

সৈয়দ আহমদ খান
(১৮১৭-১৮৯৮)

সৈয়দ আহমদ খান তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের নবজাগৃতির অন্যতম পথনির্দেশক। ১৭ অক্টোবর ১৮১৭ সনে দিল্লীর এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি শিক্ষালাভ করেন পারিবারিক পরিবেশে। আরবি উর্দু ও ফারসি ভাষা চর্চা ছাড়াও কোরআন, হাদিস প্রভৃতি ইসলামী ধর্মসাস্ত্রে তিনি প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক রীতিতে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। যৌবনের প্রারম্ভে প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সেরেস্তাদার হিসাবে কাজ করেন। ১৮৩৯ সনে আগ্রার কমিশনার দফতরে নায়েব মুন্সী বা ডেপুটি রিডার-এর পদ লাভ করেন এবং ১৮৪১ সনে ফতেহপুরের সাবজজ পদে উন্নীত হন। শেষ পর্যায়ে তিনি দিল্লীর সাবজজ ছিলেন।

রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে **আসবাব-ই-বাগওয়াতে হিন্দ** (১৮৫৮), *The Loyal Mohammedans of India* (১৮৬০), *Essays on the life of Muhammad* এবং কোরআনের উর্দু অনুবাদ ও ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি **তাহজীব-উল-আখলাক** নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সৈয়দ আহমদ খান অনগ্রসর মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারকল্পে ১৮৭৫ সনে আলীগড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়টি প্রথমে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ও শেষে (১৯২০ সনে) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রধানত মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এর দ্বার সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য উন্মুক্ত ছিল।

সৈয়দ আহমদ খানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারণা থেকে মনে হতে পারে যে তিনি একজন একনিষ্ঠ ইংরেজভক্ত। তিনি ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের সুনজরে ছিলেন বলে চাকুরিক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেন। তাছাড়া সিপাহী বিপ্লবকালে তিনি যে রকম ঝুঁকি নিয়ে

www.pathagar.com

অনেক ইংরেজকে বিপদমুক্ত করেছিলেন সেকথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নর স্যার জন স্ট্রাসি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> ১৮৫৭ সনে তিনি (সৈয়দ আহমদ খান) যেরূপ সুস্পষ্ট অসমসাহসিকতা ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের মহৎ প্রমাণ রেখেছেন তদ্রূপ আর দেখা যায় নি। তিনি যে একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করেছেন তা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আমার নেই।[১]

সিপাহী বিপ্লবোত্তর ভূমিকা

সৈয়দ আহমদের আনুগত্য ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট এবং কে. সি. আই. ই. খেতাব দান করেন। তবে রাজানুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি স্বদেশবাসীর, বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষা করেন নি। বরং সিপাহী বিপ্লবোত্তর কালে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এ সময়ে আরো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুসলিম সমাজে নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মৌলভী চেরাগ আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং বদরুদ্দীন তায়েবজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারেন। নওয়াব আবদুল লতিফের **মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি**, সৈয়দ আমীর আলীর **সেনট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন** এবং বদরুদ্দীন তায়েবজীর **আনজুমান-ই-ইসলাম** ও দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত **দারুল উলুম** মুসলিম ভারতের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিপাহী বিপ্লব সৈয়দ আহমদের চিন্তা ও চেতনাকে বিপুলভাবে আন্দোলিত করে। বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কালে ইংরেজের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ, কারণ ঔপনিবেশিক সরকার বিপ্লবের জন্য প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করে। মুসলমানদের প্রতি ইংরেজের আক্রোশ ও বিদ্বেষভাব নিরসনের জন্য সৈয়দ আহমদ খান *The Causes of Indian Revolt* নামক পুস্তিকায় বিপ্লবের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যেহেতু ভারতীয় জনপ্রতিনিধিগণকে কখনো আইনসভায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নি, সে কারণে বহুদিন থেকে ভারতীয় জনমনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সরকারের সাফল্য ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে ইংরেজ সরকারের উচিত ছিল আইনসভায় জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ জনমতের মাধ্যমেই সরকার জানতে পারে তার কর্মসূচীসমূহ দেশবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। তিনি বলেন, "গণকণ্ঠই একমাত্র শক্তি, যা গোড়াতেই ভুলভ্রান্তি রোধ করতে পারে এবং যেসব বিপদ আমাদের উপর বিস্ফোরিত

---

১ Lieut Colonel G F I Graham : ***The Life and Work of Syed Ahmed Khan,*** (Delhi, 1885) p. 19, অনূদিত

www.pathagar.com

হয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে সে সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়।"[২] অতএব সরকারি সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ব্যাপারে জনগণের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য। জনমানসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সরকার যদি অজ্ঞ থাকে তাহলে সরকারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে বাধ্য। মোট কথা, শাসিত শ্রেণী সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই এবং তদুপরি সরকারকে অবশ্যই জনগণের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে।

প্রতিনিধি সরকারের সপক্ষে যুক্তি

বিধানসভায় জনপ্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার না থাকলে যেসব কুফল দেখা দেয় সৈয়দ আহমদ তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ঃ

এক সরকার যেসব বিধিবিধান প্রণয়ন করে তা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না ;

দুই সরকার জনমত শুনতে পায় না ;

তিন অযৌক্তিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ পায় না ;

চার সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, জনসাধারণ সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝে থাকে ; এবং

পাঁচ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে যে আইনই প্রবর্তিত হোক না কেন তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

সৈয়দ আহমদ খানের মতে, ইংরেজ সরকার প্রতিনিধি-শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলেই তারা বিপ্লব ঠেকাতে পারে নি। তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি স্বাভাবিকভাবেই জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে যে কারণে সরকার যখনি আইন-কানুন জারি করেছে জনগণের কাছে তা ষড়যন্ত্রমূলক মনে হয়েছে। এছাড়া যারা ধর্মপ্রাণ তারা মনে করেছে যে তাদের ধর্মের উপর আঘাত হানার জন্যই সরকার আইন জারি করেছে। সরকার ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান যত হ্রাস পায় ততই সরকারের জন্য মঙ্গল। তিনি বলেন,

> সরকারের উচিত জনসাধারণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক রক্ষা করা। সরকার ও জনগণের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের বা সবল-দুর্বলের সম্পর্কের মতোই। বিধাতা জনমনে জৈবিক প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করেছেন যাতে সবল দুর্বলের প্রতি সদয় থাকে এবং দুর্বলকে প্রতিপালন করে। পুরুষই নারীকে জয় করে, নারী পুরুষকে নয় ; কাজেই

২ Graham : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

> সরকারের কাজ প্রজার বন্ধুত্ব অর্জন করা, সরকারের বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা প্রজার কাজ নয়।[৩]

প্রসঙ্গত সরকার ও জনগণকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন যে সরকার হচ্ছে বৃক্ষের মূল এবং জনগণ তার শাখা-প্রশাখা। মূল যেরূপ হবে বৃক্ষও হবে তদ্রূপ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি বিচার করা যায় না। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের শাসনব্যবস্থায় উভয়ের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয় নি যার ফলে জনগণ ইংরেজ সরকারকে 'মৃদু বিষক্রিয়া, বালুকণার রজ্জু, আগুনের প্রতারক শিখা' ইত্যাদি রূপে দেখেছে। তিনি প্রশ্ন করেন, "শাসক ও শাসিতের অবস্থান যখন এরূপ দাঁড়ায় তখন (জনগণের পক্ষ থেকে) কোন প্রকার আনুগত্য বা সদিচ্ছা প্রত্যাশা করা যায় কি?"[৪] সৈয়দ আহমদ মনে করেন, ইংরেজ সরকার ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভাববিনিময়ের সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে সিপাহী বিপ্লবের ন্যায় বিদ্রোহাত্মক ঘটনা ঘটত না। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বলতে তিনি ইংলন্ডের পার্লামেন্টারি সিস্টেম-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই সংসদীয় ব্যবস্থাকেই তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন, কারণ প্রতিনিধি-শাসনের মাধ্যমেই জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে 'ইংরেজ জাতির সম্পদ ও প্রজ্ঞার ফসল' বলে উল্লেখ করেন। তবে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেই জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে এমন কোন কথা নেই। যারা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবে তাদেরও সক্ষম ও জনদরদী হওয়া চাই। এ প্রসঙ্গে তিনি জে. এস. মিল-এর *Political Economy* থেকে এই উদ্ধৃতি তুলে ধরেন ঃ

> যে ব্যক্তি প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আগ্রহী, যদি সে সক্ষম হয় এবং তার জনগণের পাশে দাঁড়াবার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে তা হলে প্রত্যেক বা যেকোন ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ উপেক্ষার কবল থেকে নিরাপদ থাকবে। (অনূদিত)[৫]

আইনতত্ত্ব

সৈয়দ আহমদের মতে, প্রতিনিধি-সংসদই আইন প্রণয়নের অধিকারী। সংসদ যে আইন পাশ করে তাতে সাধারণত সমগ্র দেশবাসীর মনোভাব প্রতিফলিত থাকে। তবে সংসদের উচিত দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সকলের গ্রহণযোগ্য আইন রচনা করা। তাঁর মতে, রাজা-বাদশাহর আইনকে প্রকৃত অর্থে আইন বলা চলে না। রাজা-বাদশাহ মাত্রেই সীমাহীন ক্ষমতা ধারণ করে। তাছাড়া, রাজতান্ত্রিক সরকারের অর্থ

---

৩ Syed Ahmed Khan : ***The Causes of Indian Revolt*** (Tr. GFI Graham : প্রাগুক্ত, (Delhi, 1885) p. 50, অনূদিত

৪ ঐ, পৃ. ৩৮

৫ Graham : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪ উদ্ধৃতি, অনূদিত

www.pathagar.com

যুক্তি ও ন্যায়বিবর্জিত সরকার। এই সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালীপনা ও কোপণতা।[৬] তিনি ভারতীয় রাজাদের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে তারা সব সময় দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে শাসন করে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শাসনে অনাচার, জুলুম ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির প্রবণতা প্রাধান্য পেয়েছে। তারা আইনের শাসনের পরিবর্তে ক্ষমতার শাসন প্রয়োগ করেছে যার ফলে সাধারণ মানুষ হয়েছে নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার। জনসাধারণের দাবিদাওয়ার প্রতি তারা কখনো কর্ণপাত করে নি। সুতরাং তিনি মনে করেন, ভারতবাসীদের ভাগ্য নির্ধারণের ভার এমন এক কৃষ্টিবান জাতির হাতে ন্যস্ত করা উচিত যাদের শাসনব্যবস্থা 'প্রজ্ঞা, যুক্তিবোধ ও ন্যায়ধর্মের' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ধারণা, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাই এসব গুণগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি বলেন ঃ

> বিধাতাই ভারতবাসীদের উপর ইংরেজ জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। কারণ তারাই এ দেশকে ন্যায়ানুগ আইন উপহার দিয়েছে।[৭]

সৈয়দ আহমদের আইনচিন্তায় প্রাকৃতিক বিধান (Law of Nature) বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিধাতা যে শাশ্বত বিধান অনুযায়ী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন তা-ই তাঁর মতে প্রাকৃতিক বিধান। এই বিধানবলে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বস্তুনিচয় এবং যা কিছু নির্বস্তুক তা অস্তিত্ব লাভ করে এবং এই বিধানই আবার বস্তুগত ও নির্বস্তুক সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রাকৃতিক বিধান দুর্লঙ্ঘ্য, কারণ তা বিধাতার আইন। যেহেতু ইসলাম ও প্রাকৃতিক বিধান উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি সে কারণে উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান। বস্তুত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে প্রাকৃতিক বিধান ক্রিয়াশীল বলে স্বয়ং আল্লাহও এ বিধান লঙ্ঘন করেন না।[৮] উল্লেখ্য, জামালউদ্দিন আফগানী সহ কতিপয় বিশিষ্ট ইসলামী শাস্ত্রবিদ সৈয়দ আহমদের প্রাকৃতিক বিধানতত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁকে নিছক জড়বাদী বলে আখ্যায়িত করেন। সৈয়দ আহমদের প্রাকৃতিক বিধানতত্ত্বের সঙ্গে মধ্যযুগীয় য়ুরোপের পাণ্ডিত্যবাদী খ্রীস্টান চিন্তাবিদ সেন্ট টমাস একুইনাসের শাশ্বত আইন ও ঐশী আইনতত্ত্বের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আহমদের প্রাকৃতিক বিধানতত্ত্বে একুইনাস-এর শাশ্বত ও ঐশী আইনের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে।

জাতিবাদ ও ঐতিহ্যচেতনা

সৈয়দ আহমদ জাতিবাদের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তাকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবপ্রসূত বলা যায় না। ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে

---

৬ Graham : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৭ ঐ, পৃ. ৯০

৮ A. C. Banerjee : প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

www.pathagar.com

তাঁর জাতিতত্ত্বে। তাঁর জাতিবাদের মূল ভিত্তি স্বদেশ — ধর্ম নয়। ধর্মসম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে জাতি তৈরি হয় না। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ যখন একাত্ম হয়ে এক রাষ্ট্রে বসবাস করে তখন তারা জাতিসত্তা লাভ করে। তিনি ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে নববধূর দুটি আঁখিরূপে কল্পনা করেন। একটি আঁখি বাদ দিয়ে যেমন নববধূর কল্পনা করা যায় না তেমনি ভারতের ক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে সমকক্ষ না হলে ভারত পূর্ণ শক্তির অধিকারী হবে না। তৎকালীন ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। কাজেই মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার তাগিদ তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। রাজ্যহারা, শক্তিহারা মুসলমান সম্প্রদায়কে মর্যাদার আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তিনি অব্যাহত রাখেন। এক দিকে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে তাদের ঐতিহ্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন, অপরদিকে তাদের অগ্রগতির লক্ষ্যে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর নিরলস প্রয়াসের ফসল আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে বলেন ঃ

> তোমরা কে একবার ভেবে দেখ। . . . আমরা সেই জাতি যারা দু'শ বা সাত'শ বছর ধরে ভারত শাসন করেছি . . আমাদের জাতির শিরায় তাদের রক্ত প্রবহমান যারা শুধু আরবকে নয়, সেই সাথে এশিয়া ও য়ুরোপকেও প্রকম্পিত করেছে।[৯]

এই উক্তিতে সৈয়দ আহমদের গভীর ইতিহাসচেতনা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিসেরো, সেন্ট অগাস্তিন, ইবনে খলদুন, মেকিয়াভেলী ও নীৎসে প্রমুখ চিন্তাবিদের ভাবধারার মূলেও এরূপ ইতিহাসচেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। ইতিহাস সম্পর্কে সৈয়দ আহমদের উক্তিটি প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন, "জ্ঞানের ভিত্তিতে যে ইতিহাস রচিত হয় তাতে শুধু প্রকৃত ও নিরপেক্ষ চিত্র বিধৃত থাকে না, তা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করে।"

নবজাগৃতির পথিকৃৎ

সৈয়দ আহমদ খানের গুরুত্ববিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই কথা উঠতে পারে যে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ইংরেজভক্ত যে কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। উপরন্তু ইংরেজ জাতির আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থার প্রতি তিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করেন সেজন্য কেউ কেউ তাঁর বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। তাছাড়া অধিকার অর্জনের ব্যাপারে তিনি সুস্পষ্টভাবে কোন রাজনৈতিক পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছেন কিনা সে বিষয়েও

---

৯ A. C. Banerjee : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০, অনূদিত

www.pathagar.com

প্রশ্ন উঠতে পারে। বরং তিনি ইংরেজ রাজশাক্তির প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বলে কোনপ্রকার আন্দোলন, বিশৃঙ্খলা বা রক্তপাত সমর্থন করেন নি।

কিন্তু তৎকালীন রাজনীতিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিচার করলে সৈয়দ আহমদের অবদানের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, তিনি যে সময় তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন সেটা সিপাহী বিপ্লবের যুগ। তখন অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায় যেভাবে ইংরেজ রাজশক্তির আক্রোশের শিকার হয়েছিল তাতে একটি জাতিগোষ্ঠী হিসাবে তাদের বেঁচে থাকা দায় হয়ে ওঠে। এই বিশাল মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ আহমদ খান। তিনি অনুভব করেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের ফল মুসলমানদের জন্য আরো মারাত্মক হবে। তাতে করে মুসলমানদের উপর ইংরেজের আক্রোশের মাত্রাই শুধু বৃদ্ধি পাবে না, এমনকি তার ফলে মুসলমানদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে। এ অবস্থায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ-নীতির পরিবর্তে ইংরেজের আক্রোশ প্রশমনের নীতি অনুসরণ করা শ্রেয় মনে করেন। এর সুফল তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করেছিলেন কৌশলগত কারণে — রাজভক্তির বশবর্তী হয়ে নয়।

দ্বিতীয়ত, তিনি ইংরেজ জাতিকে শ্রদ্ধা করেছেন তাদের গণতান্ত্রিক বিধিবিধান ও শাসনপদ্ধতির জন্য — ইংরেজদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি অনুভব করেন যে একমাত্র সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণ তাদের প্রতিনিধিবর্গের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। রাজতন্ত্রে এ সুযোগ জনগণের থাকে না। এই উপমহাদেশে প্রাচীন কাল থেকে রাজতন্ত্রের একাধিপত্য বিদ্যমান থাকাতে সাধারণ নাগরিক রাজনৈতিক অধিকার দূরের কথা, এমনকি কখনো মৌলিক অধিকারও ভোগ করার সুযোগ পায় নি। রাজতন্ত্রে শাসক ও প্রজার মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিদ্যমান থাকে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এ কারণে তিনি অনুভব করেন যে ইংরেজ জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই সরকার ও জনগণ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে। তবে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তিনি যে ধারণা প্রকাশ করেন তা থেকে তাঁর অভিজাত শ্রেণীর প্রতি দুর্বলতা ধরা পড়ে। নিম্নবর্গের অশিক্ষিত চাষা প্রতিনিধির আসন লাভ করুক এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সম্ভবত তাঁর নিজের শ্রেণীগত অবস্থান তাঁর চিন্তাচেতনাকে প্রভাবিত করেছিল বলে তিনি শ্রেণী-মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

তৃতীয়ত, তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি 'কওম' হিসাবে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে তিনি সাম্প্রদায়িক জাতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভিন্ন সময় জাতি সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তা থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বদেশবাসী সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে একই জাতিভুক্ত মনে করেছেন। এ থেকে বলা যায় যে

www.pathagar.com

তিনি স্বদেশভিত্তিক জাতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে সম্প্রদায় বা ধর্মভিত্তিক জাতিবাদকে গুরুত্ব দেননি। অনস্বীকার্য যে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। এজন্য তাঁকে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্‌গাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এ কথাও সত্য যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি কখনো অন্যায় পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। বরং দেখা যায় যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সম অধিকার ভোগ করেছে। একজন আত্মসচেতন মুসলমান হিসাবে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে দুর্দশা-নিপীড়নের কবল থেকে রক্ষা করার কাজটিকে নৈতিক দায়িত্ব মনে করেছেন। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় যতদিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের সমকক্ষ না হবে ততদিন তাদের দৈন্য-দুর্দশা ঘুচবে না। তাঁর মতে, মুসলিম সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত থাকলে সর্বভারতীয় জাতিবাদের বিকাশ ঘটবে না। সৈয়দ আহমদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই মুসলিম সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিল। এই উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে নগরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলার কাজে তিনি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এজন্য তাঁকে মুসলিম ভারতের নবজাগৃতির পথিকৃৎ বলা যায়।

www.pathagar.com

সহযোগবাদী রাজনীতি

১১

নওয়াব আবদুল লতিফ
(১৮২৮-১৮৯৩)

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার কিছু সংখ্যক অভিজাত মুসলিম পরিবার ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এসব পরিবারের সন্তানেরা ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের সাথে সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারাও গ্রহণ করেন। বিশেষত আইনের শাসন, উদার গণতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। আবার এঁরাই ধ্বংসোন্মুখ মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তবে এঁরা সংগ্রামের পথকে শ্রেয় মনে করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে সংগ্রামের পথে সমাজের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে। ফরায়জি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে সংগ্রামী ধারার সূচনা ঘটেছিল তা এঁদের অনুসৃত নীতির ফলে অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে।

নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরও ছিলেন তেমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ইংরেজ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় থেকে মুসলিম সমাজকে উন্নতির পথে পরিচালনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১৮২৮ সনে ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে তাঁর জন্ম। কলিকাতা মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষালাভের পর মাত্র উনিশ বছর বয়সে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুকাল অধ্যাপনার পর তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মাদ্রাসা ও কলেজের ইন্‌সপেক্টর, আয়কর কমিশনার ও কলিকাতা পৌরসংস্থার শান্তিপাল বা জাস্টিস অব পীস হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এক সময় গবর্নরের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে মনোনীত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ভূপালের নবাবের দরবারে কিছুকাল প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি

নওয়াব আবদুল লতিফের দুটি রচনা থেকে তাঁর কর্মজীবন ও শিক্ষাচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচনাদ্বয়ের নাম ঃ *A Short Account of My Public Life* (কলিকাতা, ১৮৮৪)

www.pathagar.com

এবং *Short Account of My Humble Efforts to Promote Education Specially Among the Mahomedans.* উভয় রচনায়, বিশেষত দ্বিতীয়টিতে আবদুল লতিফ রাজনীতিক কর্মতৎপরতা অপেক্ষা শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্বের উপর অধিকতর জোর দেন। তিনি স্বীয় চিন্তাধারা ও লক্ষ্য ১৮৬৩ সনে অর্থাৎ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্নেও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কে বক্তৃতা, অভিভাষণ ও আলোচনার মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি এ সমিতি গঠন করেছিলেন[১]। এছাড়া তাঁর আর একটি লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজকে সাহিত্যকর্মে ও সমাজসেবাব্রতে উৎসাহিত করা। তা বলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর মননে ছায়া ফেলে নি। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতা ছিল তাঁর কাছে পীড়াদায়ক। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একই সঙ্গে সোসাইটির মাধ্যমে তিনি ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ চর্চার সুযোগ বৃদ্ধির প্রয়াস চালাতে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায়, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিধারা বর্জন করে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে ঐক্য ও মিলনের সেতুবন্ধ রচনায় আগ্রহী ছিলেন।

লতিফের রাজনীতিচিন্তা

আবদুল লতিফের রাজনীতিক ভাবধারায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে রাজনীতিক পদ্ধতি বিষয়ে তিনি যে পথনির্দেশ করেছেন তা পূর্ববর্তী ধর্মীয়-সামাজিক নেতৃবৃন্দের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। অর্থাৎ, প্রতিরোধ বা সংগ্রামের পথ বর্জন করে তিনি আপোষ ও সহযোগিতার পথে লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী। সম্ভবত তাঁর সামাজিক অবস্থান ও সরকারি জীবন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। নির্যাতিত কৃষকের ন্যায় তিনি স্বীয় জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন নি, বরং ইংরেজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। হয়তো একারণে তিনি সতর্কতার সঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ পরিহার করেন। এ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সমাজসচেতনতার অভাব ছিল না। বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হন। উভয়ের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝির অবসানকল্পে তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর যতদিন ইংরেজের আক্রোশ অব্যাহত থাকবে ততদিন

---

১ Enamul Haque : *Nawab Bahadur Abdul Latif ; His Writings and Related Documents ;* (Samudra Prakasani, Dhaka, 1968) p. 79

www.pathagar.com

মুসলমান সমাজ বিপন্নদশা থেকে মুক্তি পাবে না। কাজেই তিনি মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের সুদৃষ্টি অর্জনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি ওয়াহাবি ও ফরায়জি নেতাদের উক্তির প্রতিবাদে বলেন যে ইংরেজশাসিত ভারতকে **দারুল হারব** বা বিধর্মী দুশমনের দেশ বলা অযৌক্তিক, কারণ ইংরেজ সরকারের শাসনাধীনে মুসলিম সমাজের আত্মবিকাশ কোনভাবে ব্যাহত হয় নি। তিনি স্বীয় যুক্তিকে জোরদার করার জন্য মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ও মক্কা-মদিনার মুফতিগণের ফতোয়া তুলে ধরনের। এই ফতোয়াতে ব্রিটিশশাসিত ভারতকে **দারুল-ইসলাম** বলা হয়েছে। এই ফতোয়াবলে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অনাবশ্যক বলে উল্লেখ করেন। এমনকি ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর উক্তি করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি।

নওয়াব আবদুল লতিফের অনুসৃত নীতি স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজ সরকারের সমর্থন লাভ করেছিল। এর ফলে তিনি স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। মোটামুটিভাবে তাঁর লক্ষ্য ছিল তিনটি ঃ

এক মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষভাব দূরীকরণ ;

দুই মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ;

তিন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা।

ইংরেজি শিক্ষার প্রবক্তা

এই তিনটি লক্ষ্য অর্জনে নওয়াব আবদুল লতিফ অনেকটা সফলকাম হয়েছিলেন। তবে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্যোন্নয়নের উপর। তিনি বুঝেছিলেন, মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ থাকলে তাদের বিপন্নদশার অবসান হবে না। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটবে তার ফলে তারা আর্থিক দিক থেকে তত লাভবান হবে এবং সেসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক ভাববিনিময়ের পথও প্রশস্ততর হবে।

অনস্বীকার্য যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে কজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারকল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের অন্যতম। তবে এও সত্য যে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে সমান সুযোগ দানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৭৩ সনে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এই মনোভাব ব্যক্ত করেন। অবশ্য মুসলমানদের উপর তাঁর দৃষ্টি

www.pathagar.com

একটু বেশী মাত্রায় নিবদ্ধ ছিল। এর কারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানদের অনগ্রসরতা। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় আমি সকল দেশবাসীর জন্য, বিশেষত মুসলিম সমাজের জন্য শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্যয় করেছি।"[২]

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

আবদুল লতিফ স্বদেশের রাজনীতিক স্বার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বন্ধুতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন। এজন্য শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের সম অধিকারের সপক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। দি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাও তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কথা স্বীকার করেছে। উক্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে ঃ "তিনি (নওয়াব আবদুল লতিফ) হিন্দু অধিবাসীদের জন্য যেরূপ গভীরভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিসূচক মনোভাব চর্চা করেছেন তেমনটি কলকাতার অন্য কোন মুসলমান করেন নি।"[৩]

ইসলামী আদর্শ

নওয়াব আবদুল লতিফ আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন যেজন্য ইসলামী আইনকানুন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে উভয় ভাষাই তাঁর জন্যে সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর জীবনচিন্তার মূল উৎস ছিল কোরআন-হাদীস। কাজেই ইসলামী আদর্শ ও অনুশাসনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল অত্যন্ত গভীর। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্যরূপে তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা থেকেও ইসলামী বিধিব্যবস্থার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত তাঁর উদ্যোগেই 'মুসলিম বিবাহ্ ও তালাকের স্বেচ্ছামূলক নিবন্ধীকরণ বিলটি' (Voluntary Registration Bill on Muslim Marriage and Divorce) আইনে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া মুসলিম বিবাহ ও তালাক-এর রেজিস্ট্রার-পদ সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি কাজী অফিস পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন।

অধিকারচিন্তা ও সক্রিয় ভূমিকা

মৌলিক অধিকার বিষয়ে আবদুল লতিফের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জীবন ও সম্পত্তির অধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করেন। তাঁর মতে,

---

২ Nawab Abdul Latif Khan Bahadur, C. I. E. : ***A Short Account of My Public Life :*** (Calcutta, 1885) p. 7, অনূদিত

৩ ***The Hindu Patriot,*** Calcutta, January 12, 1885, অনূদিত

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব উভয় অধিকার সুরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জন লকও মানুষের তিনটি অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ; তা হলো জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার। আবদুল লতিফ ও জন লক-এর পার্থক্য এই যে জন লক স্বাধীনতার অধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকার বলেছেন, কিন্তু নবাব লতিফ এই অধিকারের কথা উচ্চারণ করেন নি। হয়তো বলা যেতে পারে যে তিনি নিজকে রাজভক্ত প্রজা মনে করতেন বলে এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা এড়িয়ে গেছেন।

তবু প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি কি সত্যই কর্তাভজা বা ইংরেজভজা ছিলেন? যদি বলা হয়, ছিলেন না, সে কথা অযৌক্তিক মনে করারও কোন কারণ নেই। এ কথা সত্য যে তিনি ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন, পদোন্নতি ও খেতাব পেয়েছেন — তিনি নিজেও তা অকপটে স্বীকার করেছেন।[৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকারের সহযোগী ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। এমন কি নীলকরদের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উত্থাপন করা হয়েছে যে তাঁর প্ররোচনায় কলারোয়ার রায়তেরা নীল চাষে আপত্তি করছে যেজন্য ঐ এলাকার এক অষ্টমাংশ সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।[৫] বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে আবদুল লতিফ নির্যাতিত রায়তের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার কাজে কখনো পিছিয়ে থাকেন নি, বরং এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। রায়তের অধিকার ও স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তিনি স্যার এ. ইডেনের সঙ্গে **ইণ্ডিগো কমিশন** (১৮৬০ সনে) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বস্তুত রায়ত-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই দক্ষিণ বঙ্গে নীলকরদের অত্যাচারের অবসান হয়।

উপসংহার

নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে মুসলিম সমাজের উজ্জীবনকল্পে তিনি যেভাবে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছেন তার মূল্য অনস্বীকার্য। তাঁর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরূপ সমালোচনাও উঠতে পারে। কেউ হয়তো বলবেন যে ইংরেজ রাজশক্তির অনুকম্পা লাভের জন্যই তিনি ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে এত উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ যুক্তির অসারতা সহজে ধরা পড়ে। মনে রাখা আবশ্যক যে তৎকালে মুসলিম সমাজ ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল পশ্চাৎপদ। এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজকে দুর্দশার কবল

৪ Nawab Abdul Latif : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫ Enamul Haque : প্রাগুক্ত, ফারগুসনের অভিযোগপত্র (৯ মে, ১৮৫৪), দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসেন আবদুল লতিফ। তিনি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে ইংরেজি শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন। ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই উপলব্ধি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল। তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বলেই উদার গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি পাশ্চাত্য মতাদর্শ ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষিত মুসলিম শ্রেণীর পরিচয় ঘটে।

নওয়াব আবদুল লতিফের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ভারতের মুসলিম রাজনীতির বিপ্লবী ধারার গতিরোধ করে সহযোগিতাবাদী রাজনীতির সূচনা করেন। অবশ্য, তারও পূর্বে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই ধারাটি প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ইংরেজ রাজশক্তির আক্রোশ হয়তো কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল, কিন্তু যুগপৎ ঔপনিবেশিক শোষক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের ধারায়ও ভাটা পড়ে। আবদুল লতিফ হয়তো মনে করেছিলেন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির স্বার্থে সহযোগিতাবাদী রাজনীতির পথ অনুসরণ করা শ্রেয়। বস্তুত তাঁর একাগ্র প্রয়াসের ফলে মুসলিম বাংলার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। তিনিই শুরু করেন মুসলিম বাংলার আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া এবং তাঁরই প্রয়াসের ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

ইসলামী ধারার রাজনীতি

১২

সৈয়দ আমীর আলী
(১৮৪৯-১৯২৮)

বিগত শতকের প্রথমার্ধে বাংলার যে ক'জন মুসলিম মনীষী উচ্চ পর্যায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন সৈয়দ আমীর আলী তাঁদের একজন। এঁদের বিশেষত্ব, এঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সূত্রে আধুনিক চিন্তাপ্রবাহের সংস্পর্শে এলেও ইসলামের ঐতিহ্য ও বিধানের গুরুত্ব বিস্মৃত হন নি। বরং বলা যায়, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও ইসলামী আদর্শ এ দুইই উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কারণে তাঁদের চিন্তাধারায় উদার ও গোঁড়া মতবাদের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছিল। সৈয়দ আমীর আলীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

শিয়া মতাবলম্বী পরিবারের সন্তান সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া শহরে, ১৮৪৯ সনে। বাল্যকাল থেকে তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ, বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন ; তারপর ইংলণ্ডে গিয়ে ইনার টেম্পল-এর বার-এট-ল পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৭৩ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পর্যায়ক্রমে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেগোর প্রফেসর পদে যোগদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য (১৮৭৮-৮৩), গবর্নরের আইসভার সদস্য (১৮৮৩-৮৫) এবং কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। এছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্যপদে বৃত হয়েছিলেন। ১৯০৪ সনে অবসর গ্রহণের পর বাকী জীবন তিনি ইংলণ্ডে কাটান।

রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা

সৈয়দ আমীর আলী তাঁর কর্মময় জীবনে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তা থেকে তাঁর মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে *Critical Examination of the*

www.pathagar.com

Life and Teachings of Muhammed (১৮৭৩), *Spirit of Islam* (১৮৯১), *Ethics of Islam* (১৯০৬), *A Short History of the Saracens* (১৮৯৮) এবং আইন বিষয়ে লিখিত আরো আটটি গ্রন্থ। এছাড়া তিনি ১৮৭৭ সনে **ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন** নামে একটি সমিতিও গঠন করেছিলেন। বস্তুত এই সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি নওয়াব আবদুল লতিফের **মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির** পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। উভয় সমিতির মধ্যে কোন নীতিগত পার্থক্য দেখা যায় না। নওয়াব আবদুল লতিফের ন্যায় সৈয়দ আমীর আলীও বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মুসলিম ভারতের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে এই সমিতি গঠন করেন। তিনিও বুঝেছিলেন, হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী ব্যতিরেকে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য তিনি সমিতির মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মুক্তভাবে ভাববিনিময়ের সুযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

তাঁর প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি ইসলামী আদর্শের আলোকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। তিনি *Spirit of Islam*-এ ইসলামের মাহাত্ম্য এবং বিপুল সংখ্যক জনমনে এর অপরিসীম প্রভাবের কথা বর্ণনা করেন এবং যুগপৎ এই ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম বলে দাবি করেন। ইসলাম ধর্মের যে দিকটি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তা হলো ইসলামী সাম্যবাদ। ইসলামী সাম্যবাদে তাঁর গভীর আস্থা থাকায় তিনি মানবসমাজের বর্ণগত বৈষম্য এবং ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ধর্মগুরুদের অহেতুক হস্তক্ষেপের প্রবল বিরোধিতা করেন। তাছাড়া ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইসলাম যেভাবে পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ সমুন্নত রেখেছে তার প্রতিও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত চিন্তায় তাঁর ইসলামপ্রীতির পরিচয় ধরা পড়ে। খ্রীস্টীয় সাত শতকে চার খলিফার আমলে আরবদেশে যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকে তিনি আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন। তবে খলিফাশাসনকে তিনি নিছক যাজকতন্ত্রের (Priesthood) সমতুল্য কিছু মনে করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে খলিফাশাসন যাজকতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেয় ও উত্তম।

তাঁর যুক্তি, খলিফাগণ কখনো আইনবহির্ভূত বা অবৈধ কর্মকাণ্ডের প্রশ্রয় দেন নি। তাঁরা ছিলেন হজরত মুহম্মদের (সঃ) প্রতিনিধি ও খোদায়ী আইনের অনুসারী। শুধু ব্যক্তিগত জীবনাচরণের বেলাতেই নয়, রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনার বেলায়ও তাঁরা কোরআনের অনুশাসন সমভাবে পালন করে গেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক রাষ্ট্রেও ইসলামী আইনকানুন নির্দ্বিধায় প্রবর্তন করা যেতে পারে, কারণ কোরআনের বিধানে জীবনাচরণের যেসব নীতিমালা ও নৈতিক দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা বিশ্বের যেকোন মানবসমাজে সমভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া ইসলামী বিধানসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এ দ্বারা মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক

www.pathagar.com

রাষ্ট্রচিন্তা এবং কোরআনে বর্ণিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সংক্রান্ত অনুশাসনের মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গতি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইসলামী বিধানমতে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থায় সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান, প্রত্যেক ব্যক্তি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অধিকারী এবং শাসক ও নির্বাহী বিভাগ তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য নাগরিক সমাজের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। স্বায়ত্তশাসন, করনীতি, শাস্তিব্যবস্থা, সম্পত্তিবন্টন ইত্যাদি বিষয়েও ইসলামী বিধানে কোন অস্পষ্টতা নেই। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, কোরআনের নীতিমালাই শাশ্বত বিধান। এ বিধান অমোঘ, অপরিবর্তনীয়; তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ অবস্থায় **ইজমা** বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ভিত্তিতে এবং সকলের সম্মতিক্রমে আইনবিদগণ কোরআনের নির্দেশের আলোকে অবশ্যই নতুন নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় সংবিধান রচনা বা ন্যায়নীতিবিরোধী আইনকানুন বাতিল করা যায়। লক্ষণীয় যে আমীর আলী নতুন আইন বা শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে আইনবেত্তা ও জনসাধারণের মতৈক্য বা **কনসেনসাস**-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে আঠারো শতকের ইংরেজ চিন্তাবিদ জন লক-ও সম্মতিতত্ত্বের ভিত্তিমূলে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলীর পরিকল্পিত রাষ্ট্রে খলিফা রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি একদিকে ধর্মীয় নেতা এবং অপরদিকে রাষ্ট্রনেতা। জ্ঞানে-গুণে ও সততার দিক থেকে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তিনিই রাষ্ট্রনেতা বা খলিফা হবেন। তবে খলিফার আসন লাভ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আমীর আলী হজরত মোহম্মদ (সঃ)-এর প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ শাসনব্যবস্থা মনে করেন। অবশ্য তৎকালীন ব্রিটিশশাসিত ভারতে এ ধরনের ইসলামী শাসন কায়েম করা অসম্ভব একথা তিনি বুঝেছিলেন। তথাপি মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনীতিক স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করেন। তিনি অনুভব করেন, মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার দেওয়া না হলে হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিধানসভায় সমুদয় আসন দখল করে নেবে। এরূপ অবস্থায় মুসলিম সমাজ আইনসভায় মত প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যে আইনসভায় এক বিরাট জনগোষ্ঠীর মত প্রকাশের অধিকার থাকে না তা মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ বিধান করতে পারে না।

নারীর অধিকার

মুসলিম নারী সমাজের অধিকার সম্পর্কে আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা উদার। তিনি বিশেষত কোরআনের আলোকে নারীর অধিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, যে সমাজ নারীর অধিকার ও মর্যাদা স্বীকার করে না তা বর্বর সমাজ। তিনি

www.pathagar.com

এরিস্টটলের ন্যায় কখনো বলতে চান নি যে **নীরবতাই নারীর ভূষণ**, বরং তিনি মনে করেন, পুরুষের ন্যায় নারীও সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকারের সমান দাবিদার। নারী সমাজের প্রতি তাঁর এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই তিনি মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ প্রথার (অর্থাৎ এক স্বামী কর্তৃক বহু স্ত্রী গ্রহণের) ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি, শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ) বহুবিবাহ প্রথা অনুমোদন করেছিলেন বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য। তা বলে এই প্রথাকে চিরকালের জন্য গ্রহণীয় প্রথা হিসাবে মেনে নেয়া যায় না। বস্তুত সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা রকম সংস্কারমূলক বিধিবিধান প্রবর্তিত হয়েছে যার ফলে স্থূল সমাজব্যবস্থা মার্জিত সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেসঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে স্থূল রীতিনীতিও। কাজেই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় বহুবিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে

সৈয়দ আমীর আলীর মতাদর্শের মূল্যায়ন করতে গেলে প্রথমে মনে হতে পারে যে চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে তিনি পশ্চাদ্‌মুখী। এরূপ ধারণার পশ্চাতে যুক্তি এই যে খ্রীস্টীয় সাত শতকে আরব সমাজে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তার সাথে আধুনিক উদার গণতন্ত্রের বিশেষ সঙ্গতি নেই। এ যুক্তির বিপক্ষে বলা যায় যে আমীর আলী যে কালে তাঁর ভাবধারা লিপিবদ্ধ করেন তখন এই উপমহাদেশে পাশ্চাত্য উদার গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে নি। তাছাড়া তাঁর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল পতনমুখী মুসলিম ভারতের পুনরুজ্জীবনের দিকে, সুতরাং ইসলামী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় যে ন্যায়নীতি, মানবসাম্য, গণসম্মতিভিত্তিক আইন ও শাসক নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া স্বীকৃতি পেয়েছিল তা কোন দিক থেকে আধুনিক উদার গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। কালের প্রবাহে মুসলিম সমাজে যেসব কুসংস্কার ও অগণতান্ত্রিক প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার জন্য ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে দায়ী করা যায় না। সৈয়দ আমীর আলী মনে করেন, ইসলামী দর্শনের প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। তিনি বলেন, খ্রীস্টীয় বারো শতকের পর এই দর্শনের বিলুপ্তি ঘটেছে যার ফলে ইসলামী চিন্তায় anti-rationalistic patristicism বা যুক্তিবাদবিরোধী পিতৃত্ববাদ শিকড় বিস্তার করেছে। এরই ফলে আদর্শ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরও অবসান ঘটেছে।

আবার প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, ইসলামী শাসনব্যবস্থার আদলে আমীর আলী যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন তা এই উপমহাদেশের ক্ষেত্রে কি আদৌ প্রযোজ্য? যদি ধরে নেওয়া যায় যে ইসলামী সমাজে মানবসাম্য, প্রত্যেকের ধর্মাচরণের অধিকার ও

www.pathagar.com

প্রতিনিধিশাসন ইত্যাদির পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, অমুসলিম সম্প্রদায়গুলি এ যুক্তি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেবে কিনা। কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা হতে পারে না ; যদি তা-ই হয়, তাহলে যে উপমহাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলমান সেখানে শুধু মুসলমানের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি সংরক্ষিত রাখা যাবে কি? অন্তত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা সম্ভব নয়। আমীর আলীর প্রধান দুর্বলতা এই যে সাবেক ভারতীয় উপমহাদেশে কিভাবে ইসলামী শাসন কায়েম করা যাবে সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট কোন পথনির্দেশ করেন নি।

দাসপ্রথা সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলীর মতবাদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যেহেতু মানবসাম্যের আদর্শ এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিক মর্যাদার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সে কারণে দাসপ্রথা সমর্থন করেন নি। তিনি ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও আইনকানুনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেন যে এর কোনটিতে দাসপ্রথার স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। দাসপ্রথা সম্পর্কে এরিস্টটল এবং আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে দেখা যাবে যে উভয়ের অবস্থান একেবারে বিপরীত মেরুতে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, দাসপ্রথা স্বাভাবিক ও সমাজের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু আমীর আলী এ মত স্বীকার করেন নি। তিনি এই প্রথাকে অস্বাভাবিক ও মানবসমাজের জন্য অকল্যাণকর বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে বহু প্রতিবেশী সমাজ দাসপ্রথা অব্যাহত রেখেছে বলেই আজো এই কদর্য প্রথার বিলুপ্তি ঘটে নি। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে বা জেহাদে পরাজিত সেনাবাহিনীকে দাসরূপে গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আপত্তি করেন নি, কারণ ইসলামী বিধানও তা স্বীকার করে।[১] আবার তিনি একথাও বলেন যে এই নীতি পরাজিত মুলসমান বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ কোন মুসলমান মানুষের দাস হতে পারে না। সে যদি যুদ্ধবন্দীও হয় তাহলেও তাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা অন্যায় এবং ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। অনেকের কাছে আমীর আলীর এই অভিমত মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতমূলক মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত যে আমীর আলী কেবল ইসলামের মৌল আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্যচেতনাও তাঁর মনোভঙ্গিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল যেজন্য মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার রক্ষার ব্যাপারে তিনি অনমনীয় ছিলেন। ইসলামী জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ ও শাসনব্যবস্থায় তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্যা ইসলামের আলোকে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিও উত্থাপন করেছিলেন। যদি বলা হয়, সৈয়দ আমীর আলীই সর্বাগ্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন সে কথা হয়তো অত্যুক্তি নয়।

---

১ A. C. Banerjee : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

www.pathagar.com

সৈয়দ আমীর আলী আন্দোলন বা বিপ্লবের পথে রাজনীতিক লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহী ছিলেন না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পন্থার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল বলেও জানা যায় না। বরং ব্রিটিশ জাতির আইনকানুন ও গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত এসব কারণে তিনি প্রতিরোধ বা আন্দোলনবাদী রাজনীতিকে দেখেছেন উপেক্ষার দৃষ্টিতে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাভাবিক কারণে তাদের আধিপত্য বৃদ্ধির সহায়ক মনে করেছে।

তবু একথা অনস্বীকার্য যে আমীর আলীর রচনাবলী এবং বিশেষ করে তিনি যেভাবে ইসলামের ঐতিহ্য বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন তা শিক্ষিত মুসলিম সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মুসলমানদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি বারংবার অঙ্গুলিনির্দেশ করে তিনি মুসলিম সমাজকে আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। নৈরাশ্যমথিত মুসলিম সমাজে প্রাণসঞ্চারের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবি রাখে। এদিক থেকে তাঁকে ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম অগ্রদূত বলা যায় নিঃসন্দেহে। তিনি একদিকে আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান মনে করেছেন, আবার অপর দিকে মানুষের চিরন্তন প্রয়াসের মূল্যও স্বীকার করেছেন। মানুষ তাঁর মতে বেঁচে আছে তাঁর চিরন্তন প্রয়াসের জোরে। তিনি বলেন, "Man cannot exist without constant effort. . . . The effort is from me, its fulfilment comes from God.[২]

২ A. C. Banerjee : প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি, পৃ. ১৮৭

www.pathagar.com

জাতিচিন্তার উদ্বোধন

১৩

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৮৪৮–১৯২৫)

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুস্পষ্ট ধারা বঙ্গদেশের শিক্ষিত মহলে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন ডিরোজিও'র অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী। প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার কবল থেকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে বাঁচাবার তাগিদে এই নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। এঁরা য়ুরোপের যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। এঁদের আর একটি বৈশিষ্ট্য, এঁরা ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেন। এজন্য এঁদের বামপন্থীও বলা হতো।

এ সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও মুক্তচিন্তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের ধ্যানধারণার প্রচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নব্যবঙ্গ দলের মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১) ছাড়াও *The Enquirer* (১৮৩১), *India Gazette, Bengal Chronicle,–The Reformer,* **বেঙ্গাল স্পেকটেটর** (দ্বিভাষিক), *The Quill* ইত্যাদি নামে কয়েকটি পত্রিকা তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তদুপরি এ সময়ে একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও জন্মলাভ করে। ইয়ং বেঙ্গলের পর প্রতিষ্ঠিত হয় Landholders Society বা জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), যুক্তফ্রন্ট (১৮৫১), ইন্ডিয়া লীগ (১৮৭৫) এবং ভারতসভা (১৮৭৬)। জমিদার সভাকে যদি বঙ্গদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল বলা যায় তাহলে ভারতসভা নিঃসন্দেহে প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রথমে তদানীন্তন বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের এই পরিবর্তনধারা লক্ষ্য করা আবশ্যক।

জীবন ও অভিজ্ঞতা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখেন নি। কলকাতার ডভটন কলেজ ও লন্ডনের

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পর সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭১ সনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি কলেজে অধ্যয়নকালেই উদারপন্থী হেনরী ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ার-এর উদারবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং আজীবন এই আদর্শ সমুন্নত রাখেন। তাঁর জন্য চাকুরিজীবন সুখকর হয় নি। সিলেটে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে তাঁকে 'অপরাধ চাপা দেবার চেষ্টা এবং মারাত্মক অসতর্কতা ও অসাধুতার' অভিযোগের ভিত্তিতে পদচ্যুত করা হয়। চাকুরি হারিয়ে তিনি আইনজীবী হিসাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে পথেও তিনি বাধা পান। তিনি সখেদে বলেন ঃ

> এভাবে আমার সম্মানজনক উচ্চাশা সফল করার সকল পথ রুদ্ধ করা হলো . . . আমার বুঝতে বাকি রইল না যে আমাকে এরূপ বিড়ম্বনা পোয়াতে হচ্ছে, কারণ আমি একজন ভারতীয় এবং এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্য যা সুসংগঠিত নয়, যার জনমত বলতে কিছু নেই এবং সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে মত প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। আমি যৌবনের প্রগাঢ় উষ্ণতা দিয়ে অনুভব করেছিলাম যে আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে চাষা, কাঠুরে বা ভিস্তিওয়ালা মাত্র।[১]

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের জীবন ছিল কর্মময়। তিনি কিছুকাল কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে একাদিক্রমে আট বছর বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে আরো আট বছর ইম্পিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯১৩-১৯২০)। এছাড়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রীপদেও কিছুকাল আসীন ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও রাজভক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁকে নাইট খেতাব দান করে (১৯২১)।

তিনি আত্মজীবনীমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম *A Nation in Making*. এছাড়া *Hindoo Patriot* পত্রিকার প্রতিবেদক এবং *Bengalee* পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে তিনি যেসব প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন তার সংখ্যা কম নয়। ১৮৭৬-এর জুলাই মাসে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি ঘোষণা করেন যে, এই সমিতির উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে তিনটি ঃ[২]

এক এই সমিতি ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করবে ;

দুই সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করবে ; এবং

---

১ Surendranath Banerjee : *A Nation in Making*; (Bombay, 1963), pp. 31-33, অনূদিত

২ Daniel Argov : *Moderates and Extremists in the Indian National Movement, 1883-1920* ; (Bombay, 1967), p. 3

www.pathagar.com

তিন জনগণের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করবে।

দলীয় ভিত্তিতে বা প্রাতিষ্ঠানিক পন্থায় প্রয়াস না চালালে লক্ষ্য অর্জন করা যায় না এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সুরেন্দ্রনাথ সম্ভবত ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন।

রাজনীতিতে প্রবেশ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের পদচারণা শুরু হয় অনেকটা আকস্মিকভাবে ; বলা যায় ১৮৮৩ সনে, যখন বিতর্কিত **ইলবার্ট বিল** প্রস্তাবিত হয় তখন থেকে। পূর্বে য়ুরোপীয় নাগরিকের বিচারকার্য সম্পাদনের অধিকার শুধু য়ুরোপীয় বিচারকগণ পালন করতেন। তদানীন্তন বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য ইলবার্টের প্রস্তাবিত বিলটি এই অধিকার ভারতীয় বিচারকগণকেও দান করে, যার ফলে ইংরেজ জাতি ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কালা আদমী তাদের বিচার করবে এটা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা চলে না। শেষ পর্যন্ত য়ুরোপীয়দের প্রবল প্রতিবাদের মুখে বিলটি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত বিল অনুযায়ী য়ুরোপীয়গণ অন্ততপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক য়ুরোপীয় জুরি দ্বারা বিচার প্রার্থনার অধিকার লাভ করে। এই সংশোধন স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে যেদিন এক ইংরেজ বিচারপতি মামলা প্রসঙ্গে হিন্দুদের পবিত্র শালগ্রাম শিলা আদালতে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। হিন্দুধর্মের প্রতি এরূপ অবজ্ঞাসূচক আচরণের প্রতিবাদ করেন সুরেন্দ্রনাথ। কিন্তু ইংরেজ বিচারপতি আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে কারাদণ্ড দেন। এই অন্যায় কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতাবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসভায় মিলিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলকাতাবাসীদের প্রথম প্রতিবাদসভা। এই ঘটনা অনেকটা আকস্মিকভাবেই সুরেন্দ্রনাথকে জাতীয় রাজনৈতিক নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অহিংস এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী। তাঁর মতে, সহিংস বা বিপ্লবাত্মক পন্থায় মহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় না। তাঁর এবং আনন্দমোহন বসুর যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় আহূত ন্যাশনাল কনফারেন্সে (১৮৮৩) তিনি যে ভাষণ দান করেন তা থেকেও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

> আমরা এমন কিছু করব না যাতে অত্যন্ত গৌণভাবেও বেআইনী কিছু ধরা পরে। আমরা আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান গ্রহণ করেছি।[৩]

---

৩ Argov : প্রাগুক্ত, পৃ. ২২, অনূদিত

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি যাতে সহিংস বা বিদ্রোহাত্মক রাজনীতিতে রূপান্তরিত না হয় সেদিকেও তিনি সকলকে সতর্ক থাকতে বলেন। তাঁর ধারণা, ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে কোন লাভ হবে না ; তা করতে গেলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। বরং ভারতীয় জনগণ যদি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও সদ্ভাব বজায় রাখে তাহলেই তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। ভারতীয়দের লক্ষ্য হওয়া উচিত সরকারের ছত্রছায়ায় থেকে ব্রিটিশ শক্তির আশ্রিত অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের মতো সমান রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করা।[৪] ইংরেজ জাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কোন মতে উচিত নয়। তিনি মনে করেন, এদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটলে তা হবে ভারতীয়দের জন্য আত্মহত্যার শামিল। "ঈশ্বর না করুন, এরূপ ঘোর দুর্দিন যেন কখনো না আসে" — সুরেন্দ্রনাথ। ইংরেজ জাতির প্রতি এরূপ শ্রদ্ধাশীল মনোভাব তিনি আজীবন পোষণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৯৫ সনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ভাষণ দান কালেও তিনি একই মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাষণের সারমর্ম এই যে ইংরেজের আগমনের পূর্বে এদেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। ". . . সারা দেশ তখন চোখের জলে ভাসছে, আর পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের কণ্ঠ থেকে উত্থিত হচ্ছে করুণ বিলাপধ্বনি . . . ব্রিটেন তখন ত্রাণকারী দেবদূতরূপে আবির্ভূত হলো, বয়ে আনল শান্তি ও আনন্দের বার্তা, প্রগতি ও সভ্যতার সুসংবাদ।"[৫]

প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথ এদেশে ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার ও দীর্ঘস্থায়িত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কারণে তিনি কংগ্রেসের 'হোমরুল' দাবিরও বিরোধিতা করেন। ১৮৯৫ সনের মার্চ মাসে **বেঙ্গলী** পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি বলেন যে ভারত যদি ব্রিটিশ ফেডারেল সাম্রাজ্যের অবিচ্ছিন্ন ও স্বায়ত্তশাসিত অংশ হিসাবে বিদ্যমান থাকতে পারে সেটাই হবে ভারতের জন্য মঙ্গলজনক। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি ভাষণের আংশিক উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য ঃ

> ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমরা চাই তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে কারণ এই মহান সাম্রাজ্যই অবশিষ্ট দুনিয়াকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ উপহার দিয়েছে।[৬]

---

৪ ঐ, *Bengalee* (৫ জানুয়ারি, ১৮৮৪ সংখ্যা) থেকে উদ্ধৃতি। পৃ. ২৩

৫ ১৮৯৫ সনে ভারতের জাতীয় সংগ্রেসে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ দ্রষ্টব্য, অনূদিত

৬ R. C. Palit (Ed.) : ***Speeches of Babu Surendranath Banerjee,*** Vol, V (Calcutta, 1894-1908), p. 85, অনূদিত

www.pathagar.com

এই উদ্ধৃতি থেকেও বুঝা যায় যে সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির শাসনপদ্ধতি, বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র সংসদীয় শাসনব্যবস্থাই মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংলন্ডীয় শাসনপদ্ধতির আদলে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর ধারণা, স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে একমাত্র ইংলন্ডই আদর্শ রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক ও নৈতিক জ্ঞানদাতা। তা বলে ভারতে উপনিবেশবাদী ইংরেজ সরকার যে ধরনের কর্তৃত্ববাদী সরকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তিনি তা আদৌ সমর্থন করেন নি। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে সরকার যেন তার বর্তমান ভারতশাসন নীতি পরিবর্তন করে শাসনব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি বলেন,

> . . . in the fulness of time India may find itself in the great confederacy of free states, English in their origin, English in their character, English in their institutions, rejoicing in their permanent and indissoluble union with England,[৭]

সুরেন্দ্রনাথ মনে করেন, হিংসা বা বিপ্লবের মাধ্যমে এরূপ গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। বিপ্লব বা অসহযোগ আন্দোলন জনমনে শুধু উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বিনষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং এর পরিণতিতে হিন্দু ও মুলসমান সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কেবল রাজনীতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে না, জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথও রুদ্ধ করে। আসল কথা, গণতান্ত্রিক শাসন বা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কাজটি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা উচিত। উল্লেখ্য যে, মনটেগু চেমস্‌ফোর্ড যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারনীতি ঘোষণা করেন (১৯১৮) সুরেন্দ্রনাথের ভাবধারায় তা-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। স্মর্তব্য যে সুরেন্দ্রনাথ নিজেও মনটেগু চেমস্‌ফোর্ড-এর সংস্কার সংক্রান্ত ভোটাধিকার কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই। বিশেষত বঙ্গভঙ্গ এবং রাজনীতিক্ষেত্রে স্বরাজপন্থীদের ভূমিকা উভয়ই তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একারণে তিনি একদিকে যেমন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রবল বিরোধিতা করেন (যে কারণে তাঁকে Surrender not Banerjee আখ্যা দেওয়া হয়), অপরদিকে স্বরাজ্য দলের নীতিতে অনাস্থা প্রকাশ করেন। সম্ভবত ১৯২৩ সনের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের

---

৭ *Report of the Eleventh Indian National Congress,* (Poona, 1895), p. 5

www.pathagar.com

মনোনীত প্রার্থী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন বলেই তিনি মনে মনে ওই দলের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর একটি উক্তি থেকে স্বরাজ্য দলের প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

> স্বরাজবাদীদের আধিপত্য বাংলার জনগণের নৈতিক বল নষ্ট করে দিয়েছে। অতীতের ন্যায়নিষ্ঠারও অবসান ঘটেছে তার সঙ্গে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রক্রিয়ায় এখন জোর এবং কপটতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৮]

এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমতার বা কপটতার রাজনীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে তিনি একথাও বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চাই সুগঠিত রাজনৈতিক দল। তাঁর মতে, রাজনৈতিক দলের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা চাই, তা না হলে রাজনৈতিক দল যতই কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করুক, তাতে বিশেষ ফল হয় না। শুধু কর্মতৎপরতার জোরে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বরাজ্যপন্থীদের নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করতে গিয়ে তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মূল্যায়ন

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের রাজনীতিক নবজাগরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি একদিকে সারা ভারতকে একই জাতীয় চেতনায় সর্বপ্রথম উদ্দীপিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং অপর দিকে ব্রিটেনের উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির আদলে এদেশের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তবে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় মৌলিকত্বের অভাব ছিল বলে চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি তেমন মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম হন নি। সম্ভবত এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত ডভটন কলেজে শিক্ষালাভকালে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও রীতিনীতির প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন যার ফলে ইংরেজ জাতির শাসনপদ্ধতি ও রীতিনীতির প্রতি তিনি আজীবন শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি যেভাবে ইংরেজকে ত্রাণকারী দেবদূতরূপে বর্ণনা করেছেন তা থেকে অনেকেই তাঁকে হয়তো ইংরেজভজা বলতে দ্বিধাবোধ করবেন না ; কিন্তু তাঁর মনোভাবের গভীরে প্রবেশ করলে সহজেই বুঝা যাবে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ইংরেজকে ভালবাসেন নি, ভালবেসেছেন তাদের রীতিনীতি, আইন ও শাসনপদ্ধতিকে। ইংরেজ জাতির আইন ও শাসনপদ্ধতি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মোপলব্ধির সহায়ক মনে করেই তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তা বলে তিনি ইংরেজ শাসকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ

---

৮ Surendranath : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২, অনূদিত

www.pathagar.com

করতে কখনো দ্বিধান্বিত হন নি। এমনকি প্রয়োজনবোধে তিনি ইংরেজের চুক্তিভঙ্গ ও অপশাসনের প্রতিবাদও করেছেন। তাঁর একটি উক্তি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন ঃ

> The history of Anglo-Indian administration is strewn broadcast with fragments of broken pledges.[৯] (ইংগ-ভারতীয় প্রশাসনের ইতিহাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে অঙ্গীকার ভঙ্গের অসংখ্য অংশ।)

সুরেন্দ্রনাথের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে বয়কট, ধর্মঘট এবং আন্দোলনের পথ অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন না। সম্ভবত একারণে স্বরাজ দলের রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি অশুভ কার্যকলাপ বলে উল্লেখ করেন। হয়তো কথা উঠতে পারে যে সুরেন্দ্রনাথ বয়কট, ধর্মঘট ইত্যাদির বিরোধিতা করে প্রকারান্তরে এদেশে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদী শাসনক্ষমতার বুনিয়াদ দৃঢ় করার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। এ কথায় যুক্তি আছে সত্য। তবু প্রশ্ন ওঠে, সুরেন্দ্রনাথ কি সত্যই সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদী শক্তিকে সমর্থন করেছেন? তাঁর মনোভাবের বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে এদেশে প্রতিনিধিশাসন কায়েম করা যাতে এদেশের জনমানুষও গণতন্ত্রের স্বাদ লাভ করতে পারে। তিনি অনুভব করেন, যেদেশে প্রাচীনকাল থেকে রাজতান্ত্রিক শাসন বিদ্যমান সেদেশে হঠাৎ এক সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই নানা জটিলতার সৃষ্টি হবে। কাজেই এরূপ শাসনপদ্ধতি পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করাই শ্রেয়। এজন্যই তিনি মনে করেছিলেন যে আন্দোলন বা প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করা হলে দেশের অগ্রগতি শুধু বিলম্বিত হবে না, সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে। সুতরাং রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করেন।

সনাতন মূল্যবোধের গুরুত্ব সুরেন্দ্রনাথ কখনো অস্বীকার করেন নি। বস্তুত সনাতন মূল্যবোধ তাঁর ভাবধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে বলেই রাজনীতিতে দুর্নীতি ও শঠতার অনুপ্রবেশকে তিনি ঘৃণার্হ মনে করেছেন। দুর্নীতি ও শঠতার রাজনীতি মানবকল্যাণের সহায়ক হয় না, এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়ায়ও এরূপ হীন পন্থার ঘোর বিরোধিতা করেন। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে মেকিয়াভেলী ও সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। মেকিয়াভেলী শাসককে প্রয়োজনবোধে কপটতা, নিষ্ঠুরতা এমনকি বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন।

---

৯ *The Bengal Legislative Council Proceedings,* Vol. XIV, No. 1, Fourteenth Session, 1924, p. 178

www.pathagar.com

অপর পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিতে এরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া মারাত্মক অপরাধ বলে মনে করেন।

সুরেন্দ্রনাথের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি রাজনীতিতে ব্যক্তির পরিবর্তে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠন এবং দু'বার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের মূলে তাঁর এই মনোভাবই ক্রিয়াশীল ছিল। তাছাড়া তিনি ব্যক্তির শাসন অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ নির্বাচিত সংসদের শাসনকে কল্যাণকর মনে করেছেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বদেশের শাসনকাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীমানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি স্বশাসনের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রদেশের, বিশেষত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমিতি গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সমিতির মাধ্যমে স্বশাসনের দাবি আরো জোরদারভাবে উত্থাপন করা যাবে। লক্ষণীয় এই যে সমিতি গঠনের ব্যাপারে তিনি সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষকে কখনো আহ্বান করেন নি। তিনি জনকল্যাণের কথা উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের কথা এড়িয়ে গেছেন।

পরিশেষে, সুরেন্দ্রনাথ আইনের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। তাছাড়া ভারতের নগরবাসী শিক্ষিত মহলে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির কাজে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে যাঁরা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন সুরেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রণী। একারণেই তাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গুরু বলা হয়।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের রাজনীতি

১৪

নবাব খাজা সলিমুল্লাহ (১৮৬৫-১৯১৫)

ঢাকার বিখ্যাত বিত্তশালী নবাব পরিবারে খাজা সলিমুল্লাহ ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবাব খাজা আহসানউল্লাহ। খাজা সলিমুল্লাহ বিত্তবৈভবের প্রাচুর্য ও নবাবী জৌলুসের মধ্য দিয়ে বড়ো হলেও চিন্তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন অনেক রাজ-রাজড়া থেকে আলাদা। বাল্যকাল থেকে তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং অল্প বয়সেই ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু। যৌবনকালে তিনি কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকুরি করার পর চাকুরি ত্যাগ করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেও এই উপমহাদেশে রাজা-মহারাজা, নবাব-জমিদার ও ভূস্বামীদের প্রবল প্রতাপ অব্যাহত ছিল। এর প্রধান কারণ, এঁরা ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি অনুগত ছিলেন বলে ইংরেজ সরকারও এদের প্রতি সদয় ছিলেন। ইংরেজ সরকারে প্রদত্ত খেতাবেও ভূষিত হয়েছেন অনেকে। খাজা সলিমুল্লাহও নাইট খেতাব পেয়েছিলেন। আবার, এঁদের অনেকে সমকালীন রাজনীতিতেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে অঢেল বিত্তসম্পদের জোরেই এঁরা সহজে রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তিদের সামাজিক পদমর্যাদার কথা চিন্তা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। নবাব সলিমুল্লাহর চিন্তাধারা আলোচনার পূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঈষৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বঙ্গভঙ্গ ঃ প্রতিক্রিয়া ও তাৎপর্য

ব্রিটিশ শাসনামলের সূচনা থেকেই বিশাল আয়তনের বঙ্গদেশে সুষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানান জটিলতা দেখা দেয়। অনেকের ধারণা বঙ্গদেশে বা বাংলায় পূর্ণ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার অভিপ্রায়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই ধারণা আংশিক সত্য তার প্রমাণ মেলে তৎকালীন বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এবং ইংরেজ শাসকদের বিবৃতি পত্রাদি ও প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বঙ্গদেশ পরিচিত ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নামে। ১৮৭৪ সন পর্যন্ত এই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ছিল বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে ইংরেজ রাজপুরুষগণ ১৮৫৪ সন থেকে বঙ্গদেশের মানচিত্র বিভিন্নভাবে পুনর্বিন্যাস বা পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছেন। একই বৎসরে বঙ্গদেশের জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে ইংরেজ শাসকবর্গের মধ্যে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন ছিলেন প্রধান। লর্ড কার্জনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৩ সনের ১০ জুন গবর্নর জেনারেল-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন ভারত সরকারের সচিব এইচ. এইচ. রিজলে। ওই বছরের শেষভাগে লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা ইন্ডিয়ান গেজেটে প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জন আশা করেছিলেন যে বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর পরিকল্পনাটি নির্দ্বিধায় সমর্থন করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, শুধু নেতৃবর্গই নন, বহু পত্রপত্রিকাও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তৎকালীন বাঙলার অন্যতম নেতা ইসমাইল হোসেন সিরাজী বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে বলেন ঃ

> ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দুটি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র। . . . . ভারতের জীবনীশক্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ এই জাতির একপ্রাণতার উপর নির্ভর করে।[১]

একই মনোভাব প্রকাশ করেন তৎকালীন বিখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল। তিনি বলেন, "So he (Carzon) was determined, come what may, to cleave Bengal in twain."[২] উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "লর্ড কার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ আমলা-শাসনের ভিত্তি মজবুত করা এবং তা করতে হলে বাঙালী জাতিকে দমন করতে হবে। যেরূপ ভীতিজনকভাবে তাদের রাজনৈতিক শক্তির ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে তাকে ধ্বংস করতে হবে এবং হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন যেভাবে দৃঢ়তর হচ্ছে তাকে অংকুরেই নস্যাৎ করে দিতে হবে। আসল কথা, লর্ড কার্জন চান একাধিক আইনসভার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রবর্তন করে বাঙালী জাতির সংহতি ও সমরূপতার উপর মরণ-ছোবল হানতে"।[৩] ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল ছাড়াও অন্যান্য নেতার মধ্যে যারা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল হালিম গজনবী, নওয়াব সামসুল হুদা, নওয়াব আব্দুল সোবহান চৌধুরী, মওলানা মোহাম্মদ

---

১ মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত : **বঙ্গভঙ্গ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১, পৃ. ৭৩

২ ১৪ এপ্রিল, ১৯০৬-এ বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। *The Bengalee*, Calcutta, 15th April, 1906-এ প্রকাশিত

৩ ঐ, ইংরেজি ভাষণের বাংলা ভাষ্য

www.pathagar.com

আকরাম খাঁ, নওয়াব সিরাজুল ইসলাম, নওয়াব আলী চৌধুরী, মীর মোহাম্মদ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এঁদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।

অপর দিকে হিন্দু নেতাগণ বঙ্গবঙ্গ পরিকল্পনার ঘোর বিরোধিতা করেন এই যুক্তিতে যে প্রস্তাবটি কার্যকর করা হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, প্যারীমোহন মুখার্জী, অম্বিকাচরণ মজুমদার ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু সহ আরো অনেকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের নিন্দা করেন। তৎকালীন দি বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট, দি নিউ ইন্ডিয়া প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা পালন করে।

হাওয়া প্রতিকূল দেখে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গে আসেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সপক্ষে জনসমর্থনের ভিত তৈরি করা। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার সারমর্ম এই যে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে পূর্ববঙ্গ একটি নতুন প্রদেশে পরিণত হবে। এর ফলে পূর্ববঙ্গে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রশাসনিক জটিলতার অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবহেলিত পূর্ববঙ্গের অভাবনীয় বহুমাত্রিক উন্নতি ও প্রসার ঘটবে।

যে উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে এসেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও "কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফরের পর মুসলমান নেতাদের সুর বদলে যায় এবং নবাব সলিমুল্লাহ সরকারি বক্তব্যের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠেন।"[৪] মোট কথা, কার্জনের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়ে নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেন। তিনি মনে করলেন, পূর্ব বঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হলে প্রথমত এ-অঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষা, আর্থব্যবস্থা, যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রশাসনিক উন্নয়নের দ্রুত প্রসার ঘটবে, এবং দ্বিতীয়ত, কলিকাতা-কেন্দ্রিক কায়েমী স্বার্থবাদী এলিটদের প্রভাবমুক্ত থেকে তিনি পূর্ববঙ্গে স্বীয় প্রভাব আরো প্রবলভাবে বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।

পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিবেশ অনুকূল মনে করে ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সনের ১৬ আগস্ট "অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদা জেলাকে চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন।"[৫] মোট ষোলটি জেলা নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়।[৬]

---

৪ মামুন : পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৫ কে. এম. মহসীন : (মামুন সম্পাদিত বঙ্গভঙ্গ) ঐ, পৃ. ১

৬ জেলাগুলির নাম ঃ আসাম, ত্রিপুরা, পার্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি

www.pathagar.com

এভাবেই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করা হয়। উল্লেখ্য যে, শেষ পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে নওয়াব সলিমুল্লাহ সহ অনেক মুসলিম নেতা নমনীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও অমুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁদের পূর্বের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ান নি। তাঁরা পূর্বের মতোই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এঁদের মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিলেন কতিপয় নেতা, তাঁদের মধ্যে ভাই গিরিশ চন্দ্র অন্যতম। তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নটি একজন পূর্ববঙ্গবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমি বঙ্গ-বিভাগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ।"[৭] বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের কারণ হিসাবে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে ঃ এর ফলে পশ্চাদপদ অনুন্নত পূর্ববঙ্গের অশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হবে ; বাণিজ্যবন্দর হিসাবে চট্টগ্রামের উন্নতি হবে ; পূর্ব বঙ্গীয়দের অর্থাগমের পথ খুলে যাবে এবং এ-দেশের কৃতবিদ্য লোকদের চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য নেতাদের প্রচারণাকে গিরিশচন্দ্র দুঃখব্রত বলে উল্লেখ করেন।[৮]

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করেন। বঙ্গদেশ বিভাগ এবং তার ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভাঙ্গন তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে আয়োজিত সভায় বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। বয়কট আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১১ সনের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।

যদিও বলা হয় যে, প্রধানত প্রশাসনিক সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে ইংরেজ সরকার লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর করেন, বস্তুত তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। উনিশ শতকের সূচনা থেকে কলিকাতাকেন্দ্রিক এক শিক্ষিত বাবু শ্রেণী গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধিকার চেতনা ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং সভাসমিতিতে এই শিক্ষিত বাবু শ্রেণীর ইংরেজবিরোধী মনোভাব ক্রমশ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এরূপ অবস্থায় বৃটিশ শাসকবর্গ স্বাভাবিকভাবেই শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, বাবুশ্রেণীর মধ্যে যাতে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে সেজন্যই ইংরেজ সরকার সুকৌশলে

---

৭ মামুন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৮ ঐ : পৃ. ৭৪ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গকে কলিকাতকেন্দ্রিক বাবু শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে। উল্লেখ্য যে, কলিকাতার বাবুরা ছিলেন হিন্দু, অপরপক্ষে পূর্ববঙ্গীয়দের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। ইংরেজ শাসকগণ মনে করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি যদি নষ্ট করে দেওয়া যায় তাহলে বঙ্গদেশ তথা ভারতকে পদানত করে রাখা সহজসাধ্য হবে। ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির কাজে **ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি**-কে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি। তাঁর **বিভাজন ও শাসন নীতির** কারণে বহুকালের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে যার পরিণতিতে প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘঠিত হয় একাধিক জায়গায়। পূর্ববঙ্গেও সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হয় ১৯০৪-এর নবেম্বরে ঢাকার দাঙ্গায়।

বঙ্গভঙ্গের রাজনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর ফলে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। এক সময় মুসলমান স্বদেশী নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে বাঙালীর জাতীয় ঐক্য অটুট রাখতে তৎপর ছিলেন, কিন্তু মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।[৯] একই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাঙলার **ভদ্রলোক** শ্রেণী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। তারা কখনো নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুশ্রেণী নিজের একাধিপত্য বজায় রাখতে সদা তৎপর ছিল। তারা কখনো নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা মুলসমানদের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা স্বীকার করে নি। আপরদিকে "উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা খুব সহজেই বিশাল মুসলমান কৃষক শ্রেণীকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ও স্বদেশীর বিপরীতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[১০]

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর করার মূলে বৃটিশ সরকারের একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল একথা সত্য, এবং এ-ও সত্য যে প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সকল নেতাই এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ ও ন্যায্য অধিকারের কথা চিন্তা করে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতাদের অনেকে এর সপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়াতে স্যার সলিমুল্লাহ ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত কে. সি. এস. আই. খেতাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘ ভারতের রাজনীতিক আকাশকে গ্রাস করে। এই আন্দোলনের দুটি ধারা

---

৯ আসহাবুর রহমান : (মামুন সম্পাদিত বঙ্গবঙ্গ) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১ ; একই প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকে এমাজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ দ্রঃ

১০ আসহাবুর রহমান : প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৭

www.pathagar.com

লক্ষ্যণীয় ঃ এক দিকে এর সূত্রে স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট, বিলাতী দ্রব্যসামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে, অপর দিকে মারাঠী নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের উদাত্ত আহ্বানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান ঘটে। লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মহেন্দ্র নন্দী প্রমুখ নেতাও তাঁকে অনুসরণ করেন। আবার এ-ও দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে শুধু হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছিল তা নয়, অনেকটা সমান্তরাল ধারায় মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিও সংগঠিত এবং সুসংহত হয়। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা তারই ইংগিত বহন করে।

রাজনীতিচিন্তা

নবাব সলিমুল্লাহ বিভিন্ন সম্মেলন ও সভাসমিতিতে যে বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে তিনি তিনটি প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমস্যাগুলি এই ঃ

এক ভারতীয় নেতৃবর্গ যথাযথভাবে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন না ;

দুই ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে ; এবং

তিন ইংলণ্ডের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় মুসলমানদের করুণ অবস্থা যথার্থভাবে উপলব্ধি করছে না।

এই সমস্যাগুলির প্রেক্ষিতে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকতর রাজনীতিচর্চার অধিকার, মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবির সরকারি স্বীকৃতি এবং মুসলমানদের করুণ অবস্থার প্রতি ইংরেজ সরকারের সুদৃষ্টি দাবি করেন। ১৯১২ সনের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের পঞ্চম অধিবেশনে তিনি যে বক্তব্য রাখেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি স্বীয় মতাদর্শের পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁর ভাষণের সারকথা ঃ[১১]

> ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে মুসলিম সম্প্রদায় কঠিনতম সঙ্কটের মোকাবেলা করছে। মুসলমানদের অধিকার ও স্বাধীনতাই শুধু হরণ করা হয় নি, একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে তাদের অস্তিত্বও বিপর্যস্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার

---

১১ Speech delivered at the Fifth Session of the All-India Muslim League held in Calcutta on 3rd and 4th March, 1912 by the Honourable Nawab Sir Khajah Salimulla Bahadur G. C. S. I. of Dacca

www.pathagar.com

জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন অর্থাৎ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ গঠনের মূলে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, যেমন আগা খান, নবাব ভিকারুলমুলক প্রমুখ, তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রশংসার পাত্র। এঁরা এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায় এতদিন ইংরেজ সরকারের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করে এসেছেন, কিন্তু দিল্লীর দরবারে ব্রিটিশ সম্রাট এক ঘোষণাবলে বঙ্গভঙ্গ রদ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার করলেন তার ফলে প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে বিষাদের ছায়া নেমেছে। একথা সত্য যে, দেশ ভেঙে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। তবে বঙ্গভঙ্গের কথা স্বতন্ত্র। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ এক নতুন জাতীয় জীবনের আশায় উদ্দীপিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশে বা সরকারের ইঙ্গিতে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে নি ; নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনসাধারণ সরকারের কাছাকাছি আসতে পারবে, সরকারের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের ফল পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় ভোগ করতে সক্ষম হবে এই আশায় তারা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েছিল। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গের ফলে এ-অঞ্চলের মুলসমানগণ প্রথমবার উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে ইংরেজ সরকারের প্রজা হিসাবে তারাও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী। শুধু তাই নয়, মুসলিম সম্প্রদায় এতদিন যেভাবে ভৃত্যের ন্যায় প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল বঙ্গভঙ্গের ফলে সেই দুরবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করে সরকার প্রকৃতপক্ষে এ-অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়কে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ যে আন্দোলনকারীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে, ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বর্জন করেছে এবং জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে সরকার তাদেরই দাবি মেনে নিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদের হুকুম জারি করে দিল। বাঙালী জমিদার, মহাজন ও আইনজীবীর অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও মুসলমান জনসাধারণ কখনো আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নি, অথচ দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে ইংরেজ সরকার প্রকৃতপক্ষে সরকারবিরোধী দেশদ্রোহী শক্তির নিকট নতিস্বীকার করেছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় দুটির মধ্যে তিক্ততার কারণ বঙ্গভঙ্গ নয় ; যেহেতু মুসলমানগণ আন্দোলনকারীদের রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপে যোগ দেয় নি সে কারণেই এই তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানগণ অবশ্যই সরকারের বঙ্গভঙ্গ রদ সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতিবাদে আন্দোলনে যেতে পারত, কিন্তু তা করতে গেলে সরকার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে মনে করেই তারা সে পথে যায় নি। সুতরাং "We hope we have succeeded in setting an example of genuine loyalty and willing obedience to the words of our sovereign."

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল

খাজা সলিমুল্লাহ ইংরেজ শাসনের কল্যাণকর দিকটিও তুলে ধরেন। বিশেষত ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকে তিনি ভারতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ মনে করেন। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গবাসীদের অনগ্রসরতার দিকেই তিনি সব সময় সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পূর্ববঙ্গে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি সরকারের নিকট অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান। তিনি জনসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করে এসেছেন। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেই উচ্চশিক্ষার মন্দির। এ শুধু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়, জ্ঞান ও সংস্কৃতির আলোক বিস্তারের কেন্দ্রও বটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে একদিকে যেমন শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটেছে, অপরদিকে পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আগ্রহ এবং এদেশে পাশ্চাত্য শাসনপদ্ধতির আদলে প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে শিক্ষার যেসব সুফল দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে বর্তমানে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ন্যায্যভাবে উচ্চ সরকারি পদে চাকুরিলাভের উচ্চাশা পোষণ করছে; তারা বিধানসভার সম্প্রসারণ ও জনগণের সুযোগ দাবি করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যারা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল তিনি তাদের কপট নেতা বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে এরূপ মহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা জ্ঞানসাধনাকালে মহান মুসলিম সাধকদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সফলকাম হবে। বড়ো কথা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাজেই উভয় সভ্যতার মিলিত প্রভাবে এদেশের তরুণ সমাজ আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে উঠবে।

স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি

নবাব সলিমুল্লাহ এদেশের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সামাধান খুঁজেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। তাঁর ধারণা, উভয় সম্প্রদায় অন্তত আংশিকভাবেও যদি নিজ নিজ আদর্শ ত্যাগ করে একই কাতারে মিলিত হয়, তাহলে দোআঁশলা ধরনের জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করতে পারে বটে, কিন্তু এত উচ্চমূল্যে জাতীয়তাবাদ নামক বস্তুটি খরিদ করা উচিত নয়। কাজেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ স্বতন্ত্র নির্বাচন। যাঁরা বলেন যে ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে নির্বাচনপদ্ধতির অস্তিত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোথাও নেই এবং এ পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও সংঘাত নতুনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ ভারতের অবস্থা

www.pathagar.com

অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা। "ভারতকে বিচার করতে হবে তার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে, শুধু কল্পিত তত্ত্ব দিয়ে বা ভিন্নতর অবস্থার ভুয়া দৃষ্টান্ত দিয়ে একে দেখলে চলবে না।"[১২] এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাষ্ট্রসচিব ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ সনে হাউস অব লর্ডস-এ যে তথ্য প্রকাশ করেন তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য সাইপ্রাসে এবং জার্মানদের জন্য বোহেমিয়ায় প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এ দেশেও স্বতন্ত্র তালিকার ভিত্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার অবশ্যই কার্যকর করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ এড়াতে হলে লোকাল বোর্ড, জেলাবোর্ড, পৌরসভা ও আইন-সভায় মুসলমানদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দিতে হবে। এই অধিকার যতদিন স্বীকৃতি না পাবে ততদিন মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। তিনি বলেন, আইনজীবীর পেশা সহ অন্য সকল পেশায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান ; এমনকি গ্রামেগঞ্জেও কেবল তারাই জমিদার-মহাজন। হিন্দু জমিদার, মহাজন ও আইনজীবীরা তাদের বিত্ত ও প্রভাবের জোরে মুসলমান ভোটারদের ভোট আদায় করে নেয়। অপরপক্ষে মুসলমান প্রার্থীরা মুসলমানদের ভোট লাভের আশায় অনেক সময় বাধ্য হয়ে ধর্মের ডাক দিয়ে মুসলিম জনমনে আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে বটে, তবু নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে শোচনীয়ভাবে। কাজেই স্বতন্ত্র নির্বাচনই এ সমস্যার একমাত্র বাস্তব সমাধান। এ ছাড়া, মুসলিম স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে হলে সকল প্রদেশের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, আইনসভায় তাদের জন্য মোট আসনের অর্ধেক আসন সংরক্ষিত রাখা আবশ্যক।

নিয়মতন্ত্রের সপক্ষে

খাজা সলিমুল্লাহ আন্দোলন, বিপ্লব বা বিদ্রোহের পথে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন, স্যার সৈয়দ আহমদ যখন মুসলিম ভারতের জন্য শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি বর্জনের কথা বলেছিলেন তারপর পঞ্চাশোর্ধ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের পরিসরে গোটা বিশ্বের আয়ু ও জ্ঞান দুই-ই বেড়েছে, তার সাথে নানা রকমের পরিবর্তনও ঘটেছে। বর্তমান অবস্থায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তেমন নেই ; তবে রাজনীতিকে শুধু অভাব-অভিযোগের প্রেক্ষিতে শাসকদের নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবি-দাওয়া উত্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয়। দাবি-দাওয়া পেশ করার সময় অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। বর্তমানে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেরূপ আইনভঙ্গের প্রবণতা, সরকারবিরোধিতা, ঘোর রাজদ্রোহিতা এবং অপরের

---

১২ Speech : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

www.pathagar.com

অধিকারের প্রতি অবহেলার মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আবশ্যক। যাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের খাঁটি দেশপ্রেমিক হতে হবে, বাখরগঞ্জের অনারেবল হাজী মোহাম্মদ ইসমাইল খানের মতো আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কিন্তু যারা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের বীজ ছড়িয়ে বেড়ায় তারা এদেশের নিকৃষ্টতম দুশমন।

স্যার সলিমুল্লাহ শুধু আন্দোলনবাদী রাজনীতি বর্জনের পরামর্শ দেন নি, সেসঙ্গে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, আনুগত্য ও ভালবাসা প্রদর্শনের উপরও জোর দিয়েছেন। এদেশের যুবসমাজকে তিনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন ঃ

> ইংরেজের অনুগত হও এবং মহৎ ইংরেজ জাতির প্রতি ভক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মনোভাব চর্চা কর, কেননা তোমাদের দেশ ও কওম শান্তি ও সুশৃংখল শাসনব্যবস্থার আশীর্বাদ ইংরেজের নিকট থেকে লাভ করেছে।[১৩]

উপসংহার

খাজা সলিমুল্লাহ্‌র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে কথাটি প্রথমে উল্লেখ করা যায় তা হলো তাঁর মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতি ও অগ্রগতিচিন্তা। মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও গৌরবময় ঐতিহ্য তাঁকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছে। এ কারণে তিনি যেখানেই ইসলামের নব উজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখেচেন তাতে উৎসাহিত হয়েছেন। এমন কি কলকাতা থেকে যখন দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয় তখনো তিনি উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে যেহেতু এককালে এই উপমহাদেশের ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চার মূল কেন্দ্র ছিল দিল্লি এবং ". . . the mighty flag of the Mussalman Emperors floated triumphantly over the walls of Delhi. . ." সে কারণে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটবে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিধর্মী ইংরেজ রাজশক্তির আধিপত্য যেখানে বিদ্যমান সেখানে ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুনের পুনরুজ্জীবন আদৌ সম্ভব কিনা। মনে রাখা আবশ্যক যে ইংরেজ শাসকগণ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন প্রশাসনের সুবিধার্থে, ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য নয়।

নবাব সলিমুল্লাহ্‌র অপর বৈশিষ্ট্য এই যে সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আবদুল লতিফ ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো তিনিও সহযোগিতাবাদী রাজনীতির পথ অনুসরণ করেন।

---

১৩ Speech : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯, অনূদিত

www.pathagar.com

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তৎকালীন ভারতের রাজা-মহারাজারা ছিলেন ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট ; এঁরা তাঁদের কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষার তাগিদে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। খাজা সলিমুল্লাহও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বঙ্গভঙ্গ যখন রহিত করা হয় শুধু তখনই তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং খেতাব বর্জন করেছিলেন, কিন্তু তার বেশী অগ্রসর হন নি। তিনি আন্দোলনের পথে যান নি। তাছাড়া, স্বরাজ বা স্বাধীনতার কথাও তিনি উচ্চারণ করেন নি। বরং রাজানুগত্যের উপরই তিনি সবসময় জোর দিয়েছেন। আবার, তিনি যখন বলেন যে মুসলিম সমাজ সকল প্রতিকূল অবস্থায় রাজানুগত্য প্রদর্শন করে এসেছে, কখনো তারা আন্দালনের পথে নামে নি, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার করলে তার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করা শক্ত। বরং দেখা গেছে যে এই উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমান নেতাগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওয়াহাবি আন্দোলন, ফরায়জি আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, সিপাহী বিপ্লব, খেলাফত আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ এবং বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ এর প্রমাণ।

রাজভক্ত হওয়া সত্ত্বেও খাজ সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে আপোষ করেন নি। এদেশের দুর্দশাপীড়িত মুসলমানদের স্বার্থে তিনি বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবল আন্দোলনের চাপে সরকার যখন বঙ্গভঙ্গ রদ করে তাতে তিনি শুধু ক্ষুব্ধ হন নি, প্রবল প্রতিবাদও জ্ঞাপন করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে ১৯১১ সনে অমুসলিম নেতাদের চাপে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হয়েছিল, আবার এই অমুসলিম নেতাদের চাপেই ১৯৪৭ সনে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। ওই বছরের ১৪ আগস্ট ভারতবিভাগ কার্যকর করা হয়। জন্ম হলো দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের — একটির নাম ভারত, অপরটি পাকিস্তান। পূর্ববঙ্গের নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান। খাজা সলিমুল্লাহ্‌র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্বশাসিত স্থানীয় সংস্থা ও আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেন। উপরন্তু, তিনি প্রত্যেক প্রাদেশিক আইনসভায় মুলসমানদের জন্য মোট আসনের পঞ্চাশ ভাগ সংরক্ষিত রাখার জন্য দাবি করেন যার ফলে ইংরেজ সরকার ১৯৩২ সনে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ঘোষণা করে। যেসব প্রদেশে অমুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই প্রদেশসমূহের আইনসভায় মুসলমানদের জন্য পঞ্চাশ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখার দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ ধরনের দাবির অসারতার কথা বাদ দিলেও পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

অহিংস রাজনীতি

১৫

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(১৮৬৯-১৯৪৮)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যাঁকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজী বলে সম্বোধন করেন, তাঁর জন্ম ১৮৬৯ সনের ২ অক্টোবর — কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের পোরবন্দর রাজ্যে। তাঁর পিতা করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী ছিলেন পোরবন্দর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পিতামাতা উভয়ে ছিলেন আচারনিষ্ঠ হিন্দু, কিন্তু তাঁর মা পুতলীবাঈ ছিলেন প্রণামী বা প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের অনুগামী। এই সম্প্রদায় সর্বধর্মের সমন্বয় বা মিশ্রণে বিশ্বাসী ছিল বলে তাদের মন্দিরে সকল ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। এমন কি পোরবন্দরে প্রাণনাথী মন্দিরের দেয়ালে কোরআনের আয়াত উৎকীর্ণ ছিল। মনে হয় পিতা অপেক্ষা মাতার ধর্মাদর্শই গান্ধীজীকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কৈশোরোত্তর জীবনাচরণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাল্যকালে গান্ধী প্রথমে রাজকোটের তালুক বিদ্যালয়ে এবং পরে কাথিয়াবাড় উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। সতেরো বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি কিছুকাল ভবনগরের সমলদাস কলেজে অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি ইংলন্ড যেতে আগ্রহী হন এবং নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এবং ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত, লাটিন, ইংরেজি, ফরাসী ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর মৃদুভাষী লাজুক প্রকৃতির এই তরুণ ব্যারিস্টার প্রথম দিকে আইনজীবী হিসাবে আদৌ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। একটি মামলার সূত্রে তাঁকে ১৮৯৩ সনে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই তাঁর জীবনের মোড়-পরিবর্তন ঘটে। ঘটনাচক্রে তিনি আইনজীবীর পেশার পরিবর্তে রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার হরণ ছাড়াও

www.pathagar.com

শ্বেতাঙ্গ সরকার যেভাবে বর্ণবৈষম্য নীতির ভিত্তিতে তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল তা গান্ধীর বিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। তিনি নিজেও একাধিক বার শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ অবস্থায় গান্ধীর পক্ষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয় নি। তিনি নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের পাশে পরম বন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একুশ বছর সংগ্রাম করেছেন শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্ণবাদী ও স্বতন্ত্র অবস্থান নীতির (apartheid) বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতিরোধ সংগ্রামই সত্যাগ্রহ আন্দোলন নামে পরিচিত। এই বর্ণবাদবিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রে গান্ধী সর্বপ্রথম বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট সমাদৃত হয়েছিলেন।

১৯১৪ সনে যখন গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন ভারতীয়রাও তাদের বরেণ্য নেতা হিসাবে তাঁকে স্বাগত জানায়। তখন ভারতেও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব — গোপালকৃষ্ণ গোখলে লোকান্তরিত হয়েছেন এবং বালগঙ্গাধর তিলক লন্ডনে। তাছাড়া নানা প্রকার রাজনৈতিক জটিলতা ও সমস্যা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছিল। বিশেষত কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের উপদলীয় কোন্দল, মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাধিকার দাবি, বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিবাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। ভারতীয় রাজনীতির এই আবহে গান্ধী নেতৃত্ব ধারণ করেন।

গান্ধীচিন্তার উৎস

মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে ভগবদ্‌গীতা এবং John Ruskin-এর *Unto the Last* বইটি। ভগবদ্‌গীতা থেকে আসক্তি বর্জন ও বস্তুগত সম্পদ ত্যাগের যে শিক্ষা লাভ করেন তার প্রভাব তাঁর চেতনায় আরো গভীরভাবে শিকড়বিস্তার করে যখন তিনি রাসকিনের বইটি পাঠ করেন। রাসকিন লিখেছেন যে সম্পদ ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার মাত্র, বরং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যারা জীবন ধারণ করে তাদের জীবনই সার্থক। বস্তুত উভয়ের (ভগবদ্‌গীতা ও আনটু দি লাস্ট) প্রভাবে গান্ধী ধনসম্পদ ও আসক্তির মোহ ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীরূপে জীবনযাপন শুরু করেন। তারপর থেকে তিনি আর কখনো ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করেন নি। গান্ধীর জীবনচিন্তায় নানা ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাল্যকালে পিতার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনেছেন, যৌবনে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সীদের ধর্মশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করেছেন ; এমন কি লন্ডনে অবস্থানকালেও নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ করেছেন। এ সময়ে তিনি হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তাঁর এই উপলব্ধি আসে যে স্রষ্টাই পরম সত্য এবং সত্যই (Truth) মানবমুক্তির

www.pathagar.com

একমাত্র পথ। সুতরাং সত্যই মানবজাতির একমাত্র লক্ষ্য ও আরাধ্য হওয়া উচিত। এই উপলব্ধি থেকেই সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছিল। অর্থাৎ পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম আদর্শ। তবে তিনি বিশেষ কোন ধর্মের পথ অবলম্বন করবেন তা নিয়ে তাঁর সংশয় ছিল। তাঁর নিজের কথায় তাঁর সংশয় ধরা পড়ে। তিনি বলেন ঃ "আমি জানি না আমি কোথায় আছি, কি আমার ধর্মবিশ্বাস।" পরে অবশ্য তলস্তয়ের প্রভাবে তিনি অনেকটা সংশয়মুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে তলস্তয়ের রচনা পাঠের ফলে তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী হতে পেরেছেন।

ধর্ম ও রাজনীতি

মহাত্মা গান্ধী ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করেন নি। তাঁর মতে, ধর্ম যেহেতু মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত সে কারণে রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। রাজনীতি থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করা হলে রাজনীতিতে প্রাণ থাকবে না, এরূপ প্রাণহীন রাজনীতিকে কবর দেওয়াই শ্রেয়।[১] গান্ধী রাজনীতিকে দেখেছেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর বিশ্বাস, ধর্ম মানুষের ক্রিয়াকর্মের নৈতিক ভিত্তি, কাজেই জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া হলে সে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, রাজনীতির মূল ভিত্তি যেহেতু অহিংসা সে কারণে রাজনীতির মূল উৎসও ধর্ম। তিনি বলেন ঃ "Politics bereft of religion are a death-trap, because they kill the soul." সহজেই বুঝা যায় যে গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়তবাদী রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি সেই ধর্মে বিশ্বাসী যা কুসংস্কারমুক্ত এবং বিশ্বজনীন। গান্ধীর ধর্মবিশ্বাস ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল সন্দেহ নেই। ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি আজীবন সমাজসংস্কার, অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ এবং নারীস্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব

গান্ধীর মতাদর্শ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ *The Story of My Experiment with Truth, Satyagraha in South Africa* এবং *Hind Swaraj*। এছাড়া তাঁর হরিজন,

---

১ Dr. K. C. Choudhury : ***Role of Religion in Indian Politics*** (1900-1925) (Delhi, 1978) ; p. 232-233

www.pathagar.com

ইয়ং ইন্ডিয়া ও **নবজীবন** প্রভৃতি পত্রিকায় সত্যাগ্রহ বিষয়ে তিনি বহু নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

গান্ধীর জীবন শুধু ঘটনাবহুল ছিল তা নয়, বহু রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি সরাসরি নেতৃত্বও দিয়েছেন। তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন, বিহারের চম্পারনে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, লবণকর-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক এবং ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা রাখেন তা নিঃসন্দেহে অনন্য। গান্ধী প্রকৃতপক্ষে উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কবল থেকে বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করেন। অথবা বলা যায়, বিক্ষোভ বা বেদনাবোধ তাঁকে রাজনীতির পথে নামিয়েছে। তাঁর বিক্ষোভের উৎস ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের উগ্র বর্ণবাদী নীতি, ভারতে ইংরেজ নীলকরদের জোরজবরদস্তি ও উৎপীড়ন, ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক রাওলাট আইন এবং পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গান্ধীর সক্রিয় রাজনীতি প্রথমে শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকারের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের লাঞ্ছনা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর প্রতিবাদে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। তার পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর যখন ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী শোনেন তাতে তাঁর বিবেক আহত হয়। তাঁর বিক্ষোভ তীব্রতর হলো যখন ইংরেজ সরকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ দমনের অভিপ্রায়ে রাওলাট আইন (২১ মার্চ, ১৯১৯) পাশ করে। এই নিবর্তনমূলক আইনের বিরুদ্ধে গান্ধী উপমহাদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন। ৬ এপ্রিল ১৯১৯ সারা ভারতে হরতাল পালিত হয়। রাওলাট বিলের প্রতিবাদে তিনি বলেন ঃ

> আমি বিবেকসম্মতভাবেই এই মত পোষণ করি যে এই বিলের ধারাগুলি ন্যায়নীতির পরিপন্থী, স্বাধিকার ও ন্যায়বিচারভিত্তিক নীতিমালার পক্ষে অনিষ্টকর এবং মৌল মানবাধিকারের জন্য ধ্বংসাত্মক . . . আমাদের দৃঢ় শপথ এই যে বিলটি যদি আইনে পরিণত করা হয় তাহলে যে পর্যন্ত এই আইন প্রত্যাহার করা না হবে ততদিন আমরা একে সংযতভাবে গ্রহণ করব না. . . এই সংগ্রামে আমরা সত্যাশ্রয়ী থাকব এবং জীবন, ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর হামলা থেকে বিরত থাকব।[২]

---

২ P. N. Chopra (ed.) : ***India's Major Non-Violent Movements, 1919-1334;*** (Vision Books. India, 1979), p. 54, অনূদিত

www.pathagar.com

এই হরতালের মাত্র সাত দিন পর অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে প্রায় ছয় হাজার শিখ নর-নারী-শিশু অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত হয়। যেহেতু সরকার পূর্বেই জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল সে কারণে অমৃতসরের গ্যারিসন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেও সরকারবিরোধী জনসভা মনে করে গুলীবর্ষণের হুকুম দেন। প্রায় ছয় শতাধিক নরনারী নিহত হয় এবং দেড় হাজারের বেশী গুরুতরভাবে আহত হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বাভাবিকভাবেই সারা ভারতের বিবেককে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অমৃতসরের সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের উপর সরকারের কড়া নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় এই হত্যাকাণ্ডের খবর গান্ধীজীর কাছে পৌঁছায় প্রায় দেড় মাস পর। এই হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়েই গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন নি। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিণতিতে সারা উপমহাদেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে এই আশংকায় তিনি আন্দোলন তুলে নেন এবং খাদি আন্দোলনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।[৩]

এরপর গান্ধীর লবণকর বিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এই আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ইংরেজ সরকার যখন লবণের উপর কর আরোপ করে তাতে গান্ধী গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এর ১১ মার্চ সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় তিনি লবণকর সংক্রান্ত সরকারি আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন এবং পরদিন ভোরবেলা সবরমতি আশ্রম থেকে প্রায় আড়াইশত মাইল দূরে অবস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্তী ডান্ডি শহরের উদ্দেশ্যে মিছিল সহকারে যাত্রা শুরু করেন। এই মিছিল গান্ধীর **সল্ট মার্চ** নামে বিখ্যাত। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল ডান্ডিতে পৌঁছে লবণ-আইন ভঙ্গ করবেন। বস্তুত ইংরেজ রাজশক্তির অপশাসনের প্রতিবাদে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে গান্ধী এই **সল্ট মার্চকে** একটি প্রতীকী আন্দোলন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে তিনি যখন এক মুঠো নিষিদ্ধ লবণের চাকা সমুদ্রতীর থেকে উঠিয়ে সমবেত জনতার সামনে তুলে ধরেন তখন জনমনে স্বদেশচেতনার এক প্রবল তরঙ্গ খেলে যায়। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই তরঙ্গ বিপুল বেগে ছড়িয়ে পড়ে সারা উপমহাদেশে। ভারত জুড়ে দেশী লবণ ব্যবহারের এবং বিদেশী পণ্যসামগ্রী পোড়ানোর ধুম লেগে যায়। ইংরেজ সরকার এই জাতীয়তাবাদী উত্থানকে স্তব্ধ

---

৩ Robert Payne : ***The Life and Death of Mahatma Gandhi,*** (London, 1909) p. 337-345

www.pathagar.com

করে দেবার উদ্দেশ্যে গান্ধীসহ হাজার হাজার ভারতীয়কে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারে যাত্রার প্রাক্কালে গান্ধী বলেন ঃ

> আমার গ্রেফতারের ব্যাপারে আমার অনুসারী ও দেশবাসীদের বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ এ আন্দোলন পরিচালনা করছেন স্বয়ং বিধাতা, আমি নই। বর্তমানে ভারতের আত্মমর্যাদার, বস্তুত সবকিছুরই প্রতীক সত্যাগ্রহীর হাতে ধরা এক মুঠো লবণ। যে মুঠোয় এই লবণ ধরা আছে সে মুঠো ভেঙে দেয়া হলেও কেউ যেন স্বেচ্ছায় লবণ মুঠোছাড়া না করে।[৪]

গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এরূপ আইন অমান্য আন্দোলনের পথে স্বরাজ আসবে। লবণ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ। সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফার খানের লালকোর্তা বাহিনীর বিদ্রোহ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর বহ্নুৎসব ইত্যাদি গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনেরই পরিণতি।

অহিংস অসহযোগবাদী রাজনীতি

অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ পথ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে গান্ধী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি মনে করেন যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। ১৯২০ সালের ১০ মার্চ তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল প্রধানত তিনটি ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিচার, খেলাফত আন্দোলনকারীদের দাবি বাস্তবায়ন এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে অহিংস আন্দোলনের অপর নাম সত্যাগ্রহ। গান্ধী সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করেন এই বিশ্বাসে যে অহিংসার অস্ত্র দিয়েই হিংসা দমন করা যায়। কেবল তাই নয়, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের শ্রেষ্ঠ পথও অহিংসার পথ। তিনি বিশ্বাস করেন যে সহিংস সন্ত্রাসমূলক পন্থায় শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাঁর কথায়, "Violent means will give violent Swaraj" যে স্বাধীনতা হিংসার পথে আসে তা বিশ্বের জন্যও বিপজ্জনক। ফ্রান্সের স্বাধীনতাও এসেছিল হিংসার পথে। এই দেশটি এখনো হিংসার ক্ষতিপূরণ দিয়ে চলেছে অত্যন্ত চড়া মূল্যে। গান্ধী অহিংসাকে পরম ধর্ম জ্ঞান করেছেন ঃ অহিংসার অর্থ ভালবাসা ও কল্যাণচিন্তা। হিংস্রতা ও বর্বরতার মোকাবেলা করা উচিত কল্যাণচিন্তা দ্বারা, তবে কাপুরুষতা ও হিংসা এই দু'য়ের মধ্যে যদি একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে তাহলে তিনি হিংসাকে বেছে নেওয়া শ্রেয় মনে করেন। তাঁর ধারণা, কালের পরিবর্তন ঘটে,

---

৪ Payne : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়, কিন্তু অহিংসার ভিত্তিমূলে যা কিছু গড়ে ওঠে তার ক্ষয় নেই। এক অর্থে অহিংসা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও বটে। স্বাধিকার অর্জনের উত্তম পদ্ধতি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা passive resistance নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তার পক্ষেই সম্ভব যে দুঃখ-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করার শক্তি রাখে। গান্ধী বলেন, "সন্তানটি বেঁচে থাকবে এই আশায় মা কষ্ট সহ্য করেন।" অর্থাৎ, দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে সার্থকতা অর্জনের যে শাশ্বত বিধান রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করা না হলে দাসত্বের কবল থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাবে না। খাঁটি সত্যাগ্রহীর পক্ষেই এই কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

একজন সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট ঃ সত্যাগ্রহীকে রাগদ্বেষমুক্ত রাজনৈতিক প্রতিবাদী হতে হবে। তিনি প্রতিপক্ষের রোষ সহ্য করে যাবেন, কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্তী হবেন না। সরকার যখন তাঁকে গ্রেফতার করতে আসবে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করবেন। সত্যাগ্রহী কখনো ইংরেজ জাতির পতাকাকে সালাম করবে না, তবে পাতাকাকে লাঞ্ছিতও করবে না।[৫] তিনি বলেন, "আমি চাই ভারতবাসীদের অন্তরে এই প্রত্যয় জাগ্রত হোক যে ভারতের একটি আত্মা আছে যা ধ্বংস করা যাবে না। এই আত্মা যে-কোন রকম দৈহিক দুর্বলতা জয় করতে এবং গোটা বিশ্বের সম্মিলিত দৈহিক শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম।"[৬] গান্ধী মনে করেন, যুগ যুগ ধরে ভারতের কাছে প্রতিরোধের যেসব পথ সুপরিচিত অর্থাৎ অনশন, কাজকারবার বন্ধ এবং ভজনালয়ে মিলিত হয়ে প্রার্থনা ইত্যাদি পথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। তাঁর মতে অসহযোগ আন্দোলনের অপর নাম ধর্মযুদ্ধ, যা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য দান করতে পারে এবং রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক শক্তিমণ্ডিত করতে পারে। তাঁর কথায়, "Non-violence implies voluntary submission to the penalty for non-cooperation with evil."[৭] গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ঃ প্রথমত, বেকার জনসাধারণের মধ্যে চরকা বিতরণ করা যাতে তারা বিদেশী সূতীবস্ত্র বর্জন করে দেশী সূতীবস্ত্র তৈরি করে ব্যবহার করতে পারে ; দ্বিতীয়ত, আদালত, সরকারি স্কুল-কলেজ, আইনসভা, সরকারপ্রদত্ত খেতাব ও সরকারি পোশাক ইত্যাদি বর্জন করা। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সারা উপমহাদেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অন্যভাবে বলা যায়, গান্ধী ভারতের সুপ্ত চিত্তশক্তিকে নতুনভাবে জাগ্রত করেছিলেন।

---

৫ Payne : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৯

৬ K. C. Choudhury : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

৭ Appadorai : *Documents on Political Thought in Modern India*, Vol. II ; (India, 1978) p. 380

www.pathagar.com

মানবস্বাধীনতাবাদ

মহাত্মা গান্ধী মানবস্বাধীনতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেন। মানুষের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরিস্টটলের ন্যায় তিনিও মানুষকে দেখেছেন সামাজিক প্রাণী হিসাবে। তবে তিনি এরিস্টটলের ন্যায় মানুষের উপরে রাষ্ট্রের স্থান নির্দেশ করেন নি। তিনি ব্যক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ যখন সুশিক্ষিত হয় তখন সে সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তির প্রয়োজনের সুসমঞ্জস সম্পর্ক তৈরি করে। অনিয়ন্ত্রিত বা বল্গাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তিনি বন্যপশুর স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করেন। গোটা সমাজের স্বার্থে যারা স্বেচ্ছায় সামাজিক বাধানিষেধ মান্য করে চলে তারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই সমৃদ্ধতর করে তুলতে সাহায্য করে। তবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির ইচ্ছা সমাজের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ; এবং সেখানে সমাজের ইচ্ছা রাষ্ট্রশক্তির উৎস। ব্যক্তি যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয় তাহলে রাষ্ট্র বলে কিছু থাকে না। তখন সমাজে বিরাজ করে নৈরাজ্য।

গান্ধী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রবক্তা হয়েও বর্ণভেদ প্রথাকে গণতান্ত্রিক সমাজের পরিপন্থী মনে করেন নি। তাঁর যুক্তি, প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন অপূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা সে কখনো কাটিয়ে উঠতে পারে না। এই অপূর্ণতার প্রেক্ষিতেই বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন ঘটেছে। যে ব্যক্তি তার প্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী যে কাজের জন্য উপযুক্ত সে সেই কাজে লিপ্ত থাকবে এটাই বর্ণভেদ প্রথার উদ্দেশ্য। এই প্রথা উচ্চ ও নিচের প্রভেদ স্বীকার করে না, বরং এই নিশ্চয়তা দেয় যে প্রত্যেকে তার শ্রমের ফসল ভোগ করবে, কিন্তু একে অপরের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না। গান্ধী বলেন, "আমার বিশ্বাস, আদর্শ সমাজব্যবস্থা কেবল তখনি বিকাশ লাভ করবে যখন এই প্রথার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব এবং তাকে কার্যকর করতে পারব।[৮]

গণতন্ত্রচিন্তা

গান্ধীর গণতন্ত্রচিন্তায় তাঁর উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জন লক-এর ন্যায় জনসাধারণের সম্মতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করেন, চরম স্বৈরতান্ত্রিক সরকারও জনগণের সমর্থন ব্যতিরেকে অধিক কাল টিকে থাকতে পারে না। স্বৈরাচারী শাসক ক্ষমতার জোরে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে বটে, কিন্তু শাসিত শ্রেণীর অন্তর থেকে যখনি স্বৈরাচারী শাসকের ভয় অন্তর্হিত হয় তখন শাসকের ক্ষমতাও

---

৮ Appadorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৮১

www.pathagar.com

নিঃশেষিত হয়ে যায়।[৯] এরূপ শাসক যতই মহৎ হোক, তার অঙ্গুলিসঙ্কেতে কখনো জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

গান্ধীর মতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে বুঝায় জাতীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। জাতীয় জীবনে যদি কখনো এমন উৎকর্ষ ঘটে যার ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত হবে তখন প্রতিনিধির আবশ্যক হবে না। এরূপ সমাজে প্রত্যেকেই নিজের শাসক। সে নিজেকে তখন এমনভাবে শাসন করবে যাতে প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট হবে না। আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকে না সে কারণে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু মানবসমাজে এরূপ আদর্শ ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় না বলেই সরকারের প্রয়োজন হয়। তবে সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ সরকার যা ন্যূনতম শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে।

প্রকৃতপক্ষে গান্ধী রাষ্ট্রকে দেখেছেন হিংস্রতার সংগঠিত প্রতীকরূপে। ব্যক্তির আত্মা থাকে, রাষ্ট্রের তা থাকে না। এ কারণে রাষ্ট্রচরিত্রের হিংসাত্মক বৈশিষ্ট্য কখনো মুছে যায় না। এই হিংস্রতার মোক্ষম দাওয়াই গণতন্ত্র। তিনি বলেন, "Democracy, disciplined and enlightened, is the first thing in the world." তাঁর মতে গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যাতে দুর্বলতম এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তি উভয়েই সমান সুযোগ ও সমঅধিকার ভোগ করে। এরূপ সুসভ্য শাসনব্যবস্থা সন্ত্রাস বা হিংসার ভিত্তিমূলে গড়ে ওঠে না। গণতান্ত্রিক মানসিকতা এমন কোন যান্ত্রিক ব্যাপার নয় যে কিছু রীতিনীতি বর্জন করলেই তার বিকাশ ঘটবে। এর জন্য আবশ্যক অন্তরের পরিবর্তন। অন্তরে হিংসার লেশমাত্র বিদ্যমান থাকলে গণতন্ত্র আসবে না। একে প্রতিষ্ঠা করতে হবে হিংসার ভিত্তিমূলে। গান্ধীর মতে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে অন্তর থেকে হিংসার উচ্ছেদ, অর্থাৎ সত্যাগ্রহ — যার নিদর্শন চরকা, গ্রামীণ কুটিরশিল্পের প্রসার, অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

মহাত্মা গান্ধী য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের উপর আস্থা রাখতে পারেন নি, কারণ এই গণতন্ত্র ধনতন্ত্রের অবাধ সম্প্রসারণের সহায়ক, যার ফলে শোষিত শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই গণতন্ত্রে ফ্যাসিবাদ বা নাজিবাদের বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। উপরন্তু এই গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বুনিয়াদ দৃঢ়তর করে। গান্ধী অবশ্য সাময়িকভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন ; তাঁর আসল লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল গ্রাম-স্বরাজের দিকে। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে যা হবে গ্রাম-স্বরাজভিত্তিক। এই গ্রাম-স্বরাজের অপর নাম **সর্বোদয় সমাজ**, যা মানবকল্যাণের

---

৯ *Young India*, June 30, 1920

www.pathagar.com

কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবে। গান্ধী তাঁর গণতন্ত্রচিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "আমার জীবনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান নেই।" এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যেহেতু প্রত্যেক দেশ বা জাতিরই স্বরাজ পরিচালনার সহজাত যোগ্যতা রয়েছে সে কারণে একটি দেশ কখনো অপর দেশ শাসনের সহজাত যোগ্যতা দাবি করতে পারে না। এ থেকে বুঝা যায়, গান্ধী ইংলন্ডের ঔপনিবেশিক শাসনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ

গান্ধী ছিলেন সত্য ও অহিংসার সাধক যে কারণে যেকোন রকমের সহিংস বিপ্লবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঘৃণার সঙ্গে। তাঁর দৃষ্টিতে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবও সহিংস বিপ্লব। তাঁর মতে বলশেভিকবাদ আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার ফসল। এই বস্তুবাদী সভ্যতার অন্ধ বস্তুপূজার সূত্রে এমন এক চিন্তাধারার জন্ম হয়েছে যা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে বস্তুগত উন্নতির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে। তিনি বলেন, বস্তুর উপর আত্মার আধিপত্যকে যদি আমরা অস্বীকার করি এবং স্বাধীনতা ও প্রেমের আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে পাশবশক্তিকে প্রাধান্য দেই, তাহলে অচিরেই আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিতে বলশেভিকবাদের অশুভ পাঁয়তারা শুরু হবে। বলশেভিকবাদের প্রধান লক্ষ্য বস্তুগত উন্নতি, কিন্তু "আমি চাই আমার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতা"। বলশেভিক রাষ্ট্র শোষণক্রিয়াকে বহুলাংশে নির্মূল করেছে সত্য, কিন্তু সেসঙ্গে ব্যক্তিসত্তাকে ধ্বংস করে মানবজাতির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করেছে।[১০] গান্ধী অবশ্য বলশেভিকবাদ ও সমাজতন্ত্রকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর মতে বলশেভিকবাদ অপেক্ষা সমাজতন্ত্র কাম্য, কারণ সমাজতন্ত্রে অন্তত মানবসাম্যের মূল্য স্বীকার করা হয়। গান্ধী বলেন যে মানবসমাজে কেউ উঁচু বা কেউ নিচু নয়, সকলে সমান। মানবদেহে মাথাটা দেহের উপরিভাগে থাকে বলেই সে উঁচু এবং পায়ের পাতা সর্বনিম্নে থাকে বলে সে নিচু একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং সত্য এই যে উভয়ে এক দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে উভয়েই সমান। তেমনি, সকল মানুষ যেহেতু একই সমাজদেহের অংশ সে কারণে সকল মানুষ সমান।

আর্থনীতিক চিন্তা ঃ অছিবাদ বা জিম্মাদারীতত্ত্ব

গান্ধীর আর্থনীতিক চিন্তার মূল ভিত্তি প্রেম ও অহিংসা। তাঁর মতে, একচ্ছত্র মালিকানা ও প্রেম পাশাপাশি চলতে পারে না। তিনি বলেন, "তত্ত্বগতভাবে যেখানে নিখাদ প্রেম বিরাজ

১০ Louis Fischer (ed.) : *The Essential Gandhi ;* (London, 1962), p. 304

www.pathagar.com

করবে সেখানে অ-মালিকানা থাকতে হবে। আমরা শুধু আমাদের দেহের প্রভু . . . তবে যারা সম্পদের মালিক তারা সম্পদের জিম্মাদার (Trustee) মাত্র ; আমি বলি, তারা যেন দরিদ্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সম্পদের ব্যবহার করেন।"[১১] গান্ধীর মতে ব্যক্তিমালিকানা অপেক্ষা রাষ্ট্রের মালিকানা উত্তম, কিন্তু তাতে বিপদ এই যে রাষ্ট্র হিংসার প্রতীক। রাষ্ট্র যদি সহিংস পন্থায় পুঁজিবাদ নির্মূল করে তাহলে রাষ্ট্রশক্তি নিজেই হিংসার জালে জড়িয়ে পড়বে। এরূপ রাষ্ট্রে অহিংসার আদর্শ বিস্তার লাভ করে না।

গান্ধীর আর্থনীতিক চিন্তা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে তিনি অছিবাদ বা জিম্মাদারীতত্ত্বের (Trusteeship) ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা পরিচালনায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন যে সমাজে অছিবাদী তত্ত্বাবধাননীতি প্রবর্তন করা হলে বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটবে। এই নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থায় মালিক শ্রেণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের সংস্কার নিজেরাই করতে পারবে। নতুন ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃতি পাবে না ; তবে সমাজ ব্যক্তির জন্য সেই পরিমাণ সম্পত্তি নির্ধারিত করে দেবে যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণের সহায়ক হবে। গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জিম্মাধারী ব্যবস্থায় ব্যক্তি কখনো আত্মস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে এবং সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে সম্পদ জমিয়ে রাখতে বা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য যে পরিমাণ শ্রমমূল্য পাওয়া দরকার তা তাকে দেওয়া হবে। আবার, তার উপার্জনের সর্বোচ্চ মাত্রাও বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সম্পদের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মাত্রার মধ্যে পার্থক্য যদি যুক্তিসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত হয় তাহলে কালক্রমে দেখা যাবে যে এই পার্থক্য ক্রমশ দূরীভূত হয়েছে।

গান্ধীর পরিকল্পিত আর্থনীতিক ব্যবস্থায় সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ, ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থ বা লোভ চরিতার্থ করার জন্য উৎপাদব্যবস্থার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে না। তা বলে গান্ধী রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আর্থব্যবস্থার প্রবক্তা ছিলেন একথা বলা যায় না। তিনি রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন অপেক্ষা জিম্মাদারীব্যবস্থার সম্প্রসারণ চেয়েছিলেন ; কারণ তাঁর ধারণা, ব্যক্তিমালিকানাপ্রসূত হিংসার চেয়ে রাষ্ট্রশক্তির হিংসা অনেক বেশী মারাত্মক ও ক্ষতিকর। রাষ্ট্রিক মালিকানার মাত্রা যত কম হয় সমাজের জন্য ততই মঙ্গল। গান্ধী য়ুরোপীয় শিল্প-পুঁজিবাদের সর্বনাশা প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে গ্রামভিত্তিক কুটিরশিল্পের প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। কুটিরশিল্পের বিস্তারকল্পে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে তিনি বিশ লক্ষ চরকা বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

---

১১ Appadorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

www.pathagar.com

নারীমুক্তি

গান্ধী নারীস্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যে নারী ও পুরুষ উভয়ে একই জীবনযাপন করে, অভিন্ন চিন্তা করে এবং একে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে চলতে পারে না — অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক। যেভাবেই হোক, বহুকাল থেকে পুরুষ নারীর উপর প্রভুত্ব করে এসেছে ; এ কারণে নারীমনে হীনতাবোধ সঞ্চারিত হয়েছে। আদতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। যাঁরা সত্যাশ্রয়ী তাঁরা নারীর সমঅধিকার স্বীকার করেন। তবে উভয়ের মধ্যে মৌলিক অভিন্নতা থাকলেও এক জায়গায় তাঁদের পার্থক্য দেখা যায়। তা হচ্ছে নারীর মাতৃত্ব-গুণ। মা হিসাবে নারীর যে গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে পুরুষের সেটা নেই। নারী প্রধানত গৃহকর্ত্রী এবং পুরুষ রুটির যোগানদার। পুরুষ খাদ্য যোগায়, নারী তা সংরক্ষণ ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে। তাছাড়া নারী যে প্রক্রিয়ায় শিশুদের লালনপালন করে পুরুষ সেরকম পারে না। এই প্রক্রিয়াটি নারীর আয়ত্তে বলেই মানবজাতির বংশবিস্তার ঘটেছে, নইলে মানবজাতি কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।[১২]

গৃহরক্ষার জন্য যদি নারীর হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হয় সেটা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য মর্যাদাহানিকর। তা করা হলে মানবজাতি আবার বর্বরতার পর্যায়ে নেমে যাবে। গান্ধীর মতবাদ ব্যাখ্যা করলে বুঝা যায় যে তিনি শুধু আবহমান ভারতের ঐতিহ্যধারাটিই নয়, সেসঙ্গে গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের চিন্তাধারাও অনুসরণ করেছেন। 'নীরবতা নারীর ভূষণ' — এরিস্টটলের এই উক্তিটি অনেকটা যেন ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে গান্ধীচিন্তায়।

গান্ধীচিন্তার মূল্যায়ন

গান্ধীচিন্তার মূল্যায়ন করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে তিনি অহিংসার অস্ত্র দিয়ে যেভাবে হিংসার মোকাবেলা করতে চেয়েছিলেন তা আদৌ সফল হয়েছিল কিনা। তিনি নিজে অহিংসার সাধনা করলেও 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী' তাঁর অহিংসনীতির উপর বারংবার প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। শেষে তিনি নিজেও প্রাণ দিয়েছেন এক হিংস্র প্রকৃতির উগ্রপন্থী হিন্দুর হাতে (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮)। তাছাড়া তাঁর অহিংস আন্দোলনও বারংবার সহিংস রূপ ধারণ করেছে। তিনি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন নীরবে, নিষ্ক্রিয় পন্থায় এবং অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছেন অহিংস পন্থায়, কিন্তু বারংবারই পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে

১২ Appadorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

www.pathagar.com

গেছে যে কারণে তিনি বহুবার মৌনব্রত ভঙ্গ করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অনুসারীরাও অনেক সময় সহিংস পন্থা অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগদান করেছে, কিন্তু সে আন্দোলনের পরিণতি ঘটেছে রক্তপাত ও বহ্ন্যুৎসবের মধ্য দিয়ে। গান্ধী হিংসা, রক্তপাত ও সন্ত্রাস এড়াতে চেয়েছেন, কিন্তু আন্দোলনে নেমে তা ঠেকাতে পারেন নি। গান্ধী মূলত ছিলেন সংগ্রামী নেতা, কাজেই অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হতে হয়েছে। অহিংসা ও সংগ্রামের পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব নয় বলেই অনেক সময় তিনি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন যখনি চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে তখনি তিনি অকস্মাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য তিনি তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছেন। অনেকে তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের কঠোর সমালোচনা, এমন কি নিন্দাও করেছেন। প্রসঙ্গত খেলাফত আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। গান্ধী প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে ওঠে, যার ফলে ইংরেজ রাজশক্তির বুনিয়াদ কেঁপে উঠেছিল, তখন তিনি হঠাৎ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন। কোন কোন সমালোচক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে খেলাফত আন্দোলন উপমহাদেশের মুসলিম জাতির মধ্যে যে প্রবল রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, গান্ধী তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াক এটা তাঁর কাম্য ছিল না বলেই তিনি খেলাফত আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়া চৌরিচরার ঘটনার পর গান্ধী যখন অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেন, তাতেও চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ বোস সহ বহু অমুসলিম নেতা বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। উভয় ঘটনায় গান্ধীর নীতি ও কৌশলের মধ্যে যে অসঙ্গতি দেখা গিয়েছিল সেজন্য অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন যে গান্ধী অহিংসাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ; সুতরাং যেখানেই তিনি হিংসার ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন সেখান থেকে নির্দ্বিধায় পশ্চাদপসরণ করেছেন।

গান্ধীর অন্য বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষ্টিক ঐতিহ্যের ধারাটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন। উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ মাত্রেই ধর্মনিষ্ঠ এই সাধারণ সত্যটি তিনি সহজেই অনুধাবন করেন। কাজেই তিনি ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক কৃষ্টির কথা চিন্তা করেন নি। রেনেসাঁর যুগ থেকে য়ুরোপে যে ধর্মনিরপেক্ষ, লোকায়ত রাজনীতির বিপুল প্রভাব বিস্তৃত হয় গান্ধী তাকে দেখেছেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। তিনি নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও য়ুরোপের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন নি, বরং ভারতের রাজনীতিকে ভারতীয় কৃষ্টিক ঐতিহ্যের রঙে রঞ্জিত করেছেন। গান্ধীর রাজনৈতিক সাফল্যের অন্যতম কারণ এটাই। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা প্রধানত ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত বলে তিনি সহজেই জনমনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গান্ধী সমাজকাঠামোর যে রূপরেখা নির্মাণ করেন তাতেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। য়ুরোপের শিল্প-পুঁজিবাদ যেরূপ দ্রুতভাবে অন্যান্য দেশে প্রভাব বিস্তার করে তাতে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটলে শুধু ভারতের আবহমান ঐতিহ্যই ধ্বংস হবে না, ভারতের চিত্তশক্তিরও বিনাশ ঘটবে। পুঁজিবাদকে প্রতিহত করার জন্যই তিনি গ্রাম-স্বরাজের পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি মনে করেছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বীয় গৃহে বসে নিজের পরিধেয় বস্ত্র তৈরি করে এবং ক্ষেতে ফসল উৎপাদন করে তাহলে সকলের আর্থিক দুরবস্থাও ঘুচে যাবে। অর্থাৎ, শিল্পপুঁজিবাদ রোধকল্পে তিনি কুটিরশিল্পের প্রসারের উপর জোর দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, গ্রাম-স্বরাজ পরিকল্পনার মাধ্যমে গান্ধী শুধু পুঁজিবাদকে ঠেকাতে চান নি, সেসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদও ঠেকাতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁর আর্থনীতিক পরিকল্পনা আদৌ সার্থক হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, দেখা গেছে যে কুটির-শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে গান্ধী হাজার হাজার চরকা বিতরণের ব্যবস্থা করলেও সে সময়ে ভারতের মাটিতে বিশাল শিল্পকারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিল্প-পুঁজিবাদের প্রসারের সূত্রে নগরায়নের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। একদিকে প্রাণচঞ্চল গ্রামগুলি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে, অপরদিকে শহরাঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে ছিন্নমূল গ্রামবাসীদের অসংখ্য বস্তি।

গান্ধীর আন্দোলনের চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক। তিনি অন্যায় ও অবিচারকে চ্যালেঞ্জ করেছেন রাজনৈতিক পন্থায়। তিনি শুধু ইংরেজ রাজশক্তিকেই তাঁর বিপক্ষ মনে করেছেন — পুঁজিপতি শ্রেণীকে নয়। সম্ভবত একারণেও তাঁর জীবনকালে শিল্প-পুঁজিবাদের অবাধ বিস্তার ঘটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গান্ধী মার্কস্‌বাদেরও বিরূপ সমালোচনা করেন। মার্কস্‌বাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে একথা তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে উভয় মতবাদের প্রধান দুর্বলতা এই যে উভয়ে ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোন মূল্য দেয় না, মূল্য দেয় সংগঠনকে। যে ব্যবস্থায় ব্যক্তির পরিবর্তে সংগঠন মুখ্য হয়ে ওঠে সেখানে মানুষের চিত্তশক্তি শুকিয়ে যায়। মার্কস্‌বাদের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি কতখানি উপলব্ধি করেছিলেন বলা শক্ত, তবে একথা সত্য যে তাঁর সময় থেকে উপমহাদেশে মার্কসীয় সমাজবাদের প্রভাববৃদ্ধি ঘটেছিল।

www.pathagar.com

ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটিও তিনি বিচারবিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এই জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সুরাহা হবে না। কিন্তু এই সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে তিনি আদৌ সফলকাম হয়েছিলেন কিনা তা-ও বিতর্কের বিষয়। গোড়া থেকেই তাঁর এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ধারণের যে প্রবণতা দেখা যায় তার ফলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হয়ে ওঠে। এই নেতৃবর্গ একদিকে যেমন দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান নি, অপরদিকে মুসলমানদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার প্রতিও উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। গান্ধীর রাজনীতির দুর্বলতা এখানেই। প্রথম থেকেই যদি তিনি মুসলিম ভারতের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে নিতেন তাহলে উপমহাদেশ জুড়ে ভয়াবহ রক্তপাত হতো কিনা সন্দেহ। চরম পর্যায়ে গান্ধী যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে স্বাধীন অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্ব দিতে চাইলেন তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

গান্ধী-চরিত্রের আর একটি দিক এই যে, প্রত্যয় সৃষ্টির কৌশল তাঁর জানা ছিল। তাঁর স্বদেশপ্রেম, অহিংসনীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন, অনশন, প্রার্থনাসভা এবং ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রত্যয় সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ সম্মোহনী ক্ষমতা যেজন্য তিনি **কারিসমাতিক** নেতা হিসাবে বৃত হয়েছিলেন। আবার কোন কোন লেখক এ রকম মন্তব্যও করেছেন যে, "Gandhi created a new religion of make-believism."[১৩] এছাড়া গান্ধীচিন্তাকে কেউ কেউ পশ্চাদ্‌মুখী বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ শতকের য়ুরোপ সহ অনেক দেশে ধর্মের প্রভাব যখন ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এসেছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও লোকায়ত রাজনীতির সপক্ষে মানুষের দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে তখন গান্ধী ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে এক "প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় আবেগপূর্ণ এবং সামাজিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌মুখী" ধারার দিকে পরিচালিত করেছেন।[১৪]

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে উপমহাদেশের জনমনে তিনি যেরূপ বিপুলভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও চৈতন্য সৃষ্টি করেন তার তুলনা মেলা ভার। গান্ধীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল অহিংসার অস্ত্র দিয়ে দুর্ধর্ষ ঔপনিবেশিক শক্তিকে ঘায়েল করা। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অপেক্ষা অহিংস অসহযোগবাদী প্রতিরোধও কোন অংশে কম কার্যকর নয় এটা গান্ধী জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন। গান্ধীকে প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী নেতা বলা যায় না,

---

১৩ Tara Chand : ***History of Freedom Movement in India,*** Vol. III, p. 221

১৪ Dhananjay Keer : ***Mahatma Gandhi — Political Saint and Unarmed Prophet ;*** (Bombay, 1973) p. 313

www.pathagar.com

কারণ তিনি শুধু ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন নি, তিনি সংগ্রাম করেছেন সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানবতার মুক্তির জন্য। ড. মারটিন লুথার কিং (জুনিয়র) যথার্থই বলেছেন ঃ

> Gandhi was inevitable -- He lived, thought and acted, inspired by the vision of humanity evolving toward a world of peace and harmony. We may ignore him at our risk.

www.pathagar.com

প্রতিরোধবাদী রাজনীতি

১৬

চিত্তরঞ্জন দাস
(১৮৭০-১৯২৫)

উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে ক'জন রাজনৈতিক নেতা গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন চিত্তরঞ্জন দাস তাঁদের অন্যতম। রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও গভীর দেশপ্রেমের জন্য তাঁকে **দেশবন্ধু** আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর জন্ম কলকাতায়, ১৮৭০ সনের ৫ নভেম্বর। তাঁর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাস ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা। ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটি স্কুল থেকে ১৮৮৬ সনে এন্ট্রান্স পাশ করার পর চিত্তরঞ্জন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি ইংলন্ডে যান। সেখানে তিনি দাদাভাই নওরোজির সান্নিধ্যে আসেন। ইংলন্ডের সংসদীয় নির্বাচনে তিনি নওরোজির পক্ষে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করেন। বলা যায়, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তখনই তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল। সম্ভবত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রায়ই ব্যস্ত থাকার কারণে চিত্তরঞ্জন আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। অবশেষে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করে ১৮৯৪ সনে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

তখন উপমহাদেশের রাজনীতির চরিত্র অনেকটা বদলে গেছে। স্বদেশীপূর্ব কালের রক্ষণশীল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবর্তে আন্দোলনবাদী রাজনীতির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তখনকার রাজনীতিতে তিনটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায় ঃ নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী ধারা, স্বাধীনতাকামী সহিংস অতি বামপন্থী ধারা এবং মধ্যপন্থী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনবাদী ধারা। প্রথম ধারার অনুসারী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নবাব সলিমুল্লাহ প্রমুখ নেতা, দ্বিতীয় ধারার সমর্থক শ্রী অরবিন্দ, লালা লাজপত রায় ও আরো কতিপয় নেতা এবং তৃতীয় ধারার নেতৃত্ব দেন চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু ও এ কে. ফজলুল হক। প্রথম দুটি ধারার চরিত্রের দুর্বলতা লক্ষ্য করে চিত্তরঞ্জন মধ্যপন্থী রাজনীতির পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

আইন ব্যবসার প্রাথমিক পর্যায়ে চিত্তরঞ্জন তেমন পসার জমাতে না পারলেও পরবর্তী পর্যায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে বিপুল খ্যাতি ও তৎসহ বিপুল অর্থ-সম্পদ অর্জন

www.pathagar.com

করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সাহিত্যচর্চার দিকে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। 'মালঞ্চ', 'মালা', 'সাগরসঙ্গীত', 'অন্তর্যামী' ও 'কিশোর-কিশোরী' তাঁর এ সময়কার রচনা। এছাড়া তিনি ছিলেন **ফরওয়ার্ড ও লিবার্টি** নামে দুটি পত্রিকার প্রকাশক এবং মাসিক পত্রিকা **নারায়ণ**-এর সম্পাদক। একজন সুসাহিত্যিক হিসাবে তিনি অচিরেই খ্যাতি অর্জন করেন। পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (১৯১৫) তিনি পৌরোহিত্য করেন।

রাজনৈতিক চেতনায় সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব

চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনৈতিক মতাদর্শের পূর্বাভাস পাওয়া যায় ১৯২৩ সনে প্রকাশিত তাঁর *The Way to Swaraj* নামক গ্রন্থে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯১৭ সনে, যে বছর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২৫ সনে। মাত্র নয় বছরের স্বল্পকালীন পরিসরে তিনি যে অবদান রাখেন গুরুত্বের দিক থেকে তা অনন্য। রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকে তিনি ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনকে মেনে নিতে পারেন নি। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতা ও অপশাসনের বিরোধিতা করেছেন প্রবলভাবে। বিশেষত জালিয়ানওয়ালাবাগের (পাঞ্জাব) নিরীহ জনতার উপর ইংরেজ সেনাপতি মাইকেল ডায়ার যেরূপ নির্মমভাবে গুলীবর্ষণ করে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯), যার ফলে ছয় শতাধিক নরনারী নিহত হয় তাতে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। কমিশনের সদস্য হিসাবে তাঁর প্রদত্ত জবানীতে তিনি ইংরেজ শাসকদের অন্যায় অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯২০ সনে মাহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন চিত্তরঞ্জন তাতে সাড়া দিয়ে আদালত বর্জন করেন। সরকারের আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯২১ সনে আহমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ থাকাতে ওই অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন নি। মুক্তিলাভের পর তিনি সক্রিয়ভাবে সরকারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তবে আন্দোলন-পদ্ধতির প্রশ্নে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। উভয়ের মতানৈক্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ১৯১৯-এর মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার মোতাবেক প্রবর্তিত সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে।

শত্রুশিবিরের অভ্যন্তরে শত্রুনিধন-নীতি

একথা সত্য যে মনটেগু-চেমসফোর্ড-এর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। এ কারণে গান্ধীজীও এর অধীনে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন অন্য যুক্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর যুক্তি, সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান আইন পরিষদ। সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদি বানচাল করতে হলে আইন পরিষদেই তা সম্ভব। শত্রুকে ধ্বংস করতে হলে শত্রুশিবিরের অভ্যন্তরে বসে সে কাজটা অপেক্ষাকৃত দ্রুতভাবে সম্পন্ন করা যায়। আইন পরিষদে বসে যেসব কর্মসূচী পালন করবেন সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ইংগিত দেন, যেমন —

এক মৌলিক অধিকারসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা আদায়ের ব্যাপারে সরকারের উপর প্রবল চাপ প্রয়োগ ;

দুই সরকারের বাজেট-প্রস্তাব সহ সকল প্রকার বিল-এর বিরোধিতা ;

তিন সরকারের প্রত্যেক প্রস্তাবের উপর মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ ;

চার সরকারের স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার কাজে পরিষদকে ব্যবহার ; এবং

পাঁচ আমলাতন্ত্রের কঠিন প্রাচীর ধূলিস্যাৎকরণ।

তদুপরি জাতীয় ভিত্তিতে সরকারের নিকট বিভিন্ন দাবিদাওয়া পেশ করা হবে। তবে সরকার যদি তা অগ্রাহ্য করে সেক্ষেত্রে জনসাধারণকে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। অসহযোগিতার প্রধান পন্থা হিসাবে জনসাধারণকে কোন প্রকার সরকারি কর বা খাজনা প্রদানে বিরত থাকতে বলা হবে।

সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার প্রশ্নে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীগণ (এম. এ. আনসারী, সি. রাজাগোপালাচারী এবং কে. আর. আয়েঙ্গার) অনমনীয় ছিলেন বলে তাঁদের 'নির্বাচনবিরোধী' (No Changer) বলা হতো। অপরপক্ষে চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ ও ভিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতা নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন বলে তাঁদের বলা হতো 'নির্বাচনপন্থী' (Pro-Changer)। কংগ্রেসে 'নির্বাচনপন্থী' ও 'নির্বাচনবিরোধী' উপদল দুটির মতবিরোধ দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে যার ফলে ১৯২৩ সনে মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি নামে একটি নির্বাচনী দল গঠিত হয়। এই দলটি গঠনকালে চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করেন যে এর মূল লক্ষ্য স্বরাজ, তবে স্বরাজ অর্জন করতে হলে আগে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তিনি মনে করেন, সংস্কার সাধন করতে হবে প্রতিরোধের পথে ; গড়তে হলে আগে ভাঙতে হবে। তিনি বলেন,

> যখন আমি ধ্বংসের কথা বলি তার অর্থ আমি গড়তে চাই। তোমরা (ইংরেজ সরকার) যদি অসহযোগিতার পথে অগ্রসর হও তাহলে আমাদের পক্ষে সহযোগিতা করার প্রশ্ন

www.pathagar.com

ওঠে না। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব কি? আমাদের অধিকার যখন পদদলিত হয় তখনো কি আমরা সহযোগিতা করে যাবো? জনগণের সহযোগিতা যদি সরকারের সত্যই কাম্য হয় তাহলে জনগণের ইচ্ছার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আমাদের অধিকার যতদিন লাঞ্ছিত হবে এবং বিগত ১৬০ বছর সরকার যেভাবে আমাদের অর্থসম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এই প্রক্রিয়া যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত নই।[১]

রাজনৈতিক চিন্তা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে আন্দোলন-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে এও সত্য যে স্বরাজ অর্জনের জন্য আন্দোলনই শ্রেষ্ঠ পথ একথা তিনি স্বীকার করলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির গুরুত্বও অস্বীকার করেন নি। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর ন্যায় তিনিও অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী। তিনি বলেন ঃ

> দমনমূলক আইন, শাসনবিভাগের নির্দেশ বা বিধান প্রতিরোধের মাধ্যমে বন্ধ করা যায় না। প্রশাসনে যতদিন বিবেচনাশক্তির অভাব থাকবে ততদিন বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনও অব্যাহত থাকবে। যখনি দমনমূলক আইন জারি হয়, বিনা বিচারে মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তখনি জনমানসে অসন্তোষ দানা বাঁধে। অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে বিদ্রোহমূলক অপরাধ হ্রাস পেতে পারে না।[২]

চিত্তরঞ্জন ইংরেজপ্রবর্তিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইন সভার অভ্যন্তরে থেকে সরকারবিরোধী চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন সত্য, তা বলে তিনি এদেশে ইংলন্ডীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সমর্থন করেন নি। তিনি বলেন,

> আমাদের দাবি স্বাধীনতা, কারণ আমরাই আমাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের এবং স্বীয় মতাদর্শ অনুযায়ী ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারী। আমরা চাই না পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তা কোন প্রকারে আমাদের ভাগ্যোন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াক।[৩]

চিত্তরঞ্জনের জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁকে স্বরাজ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। জাতীয়তাবাদকে তিনি দেখেছেন বিশ্বশান্তির সোপান হিসাবে। তাঁর মতে জাতিবাদ ও

---

১ *The Bangal Legislative Council Proceedings*, Vol. XIV, No. 1, 1924, p. 178, অনূদিত

২ BLCP, ঐ, পৃ. ১৭৬, অনূদিত

৩ Lalbahadur : *Indian Freedom Movement and Thought* ; (New Delhi, 1983), p. 382, অনূদিত

www.pathagar.com

বিশ্বশান্তির মধ্যে কোন সংঘাত থাকতে পারে না। ব্যক্তিসত্তার নির্বাধ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন জাতিবাদের বিকাশ প্রয়োজন, তেমনি বিশ্বশান্তির জন্যও প্রয়োজন জাতিবাদের পূর্ণ বিকাশ। জাতিবাদের সংজ্ঞা তিনি এভাবে দিয়েছেন ঃ এ হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জাতি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে এবং আত্মপরিচয় জানতে পারে। এ প্রক্রিয়া তখনি সার্থক হতে পারে যখন একটি জাতি অপরাপর জাতির সঙ্গে একটি মহৎ আদর্শের অংশীদার হিসাবে একযোগে আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির জন্য কাজ করবে।[৪] বস্তুত একটি জাতির সার্থকতা নির্ভর করে তার স্বাধীনতার উপর। পরাধীনতা বা দাসত্ব আত্মোপলব্ধির অন্তরায়।

শাসনপদ্ধতি

একটি স্বাধীন জাতির জন্য কি প্রকার শাসনপদ্ধতি উপযুক্ত সে সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, যে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল নয় তাকে কোন প্রকারে সুসভ্য সরকার বলা চলে না। তিনি প্রধানত সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার মনে করেন, কারণ প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত সংসদই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তিনি মনটেগু-চেমসফোর্ড-এর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিরোধিতা করেন প্রধানত দুটি কারণে ঃ প্রথমত, এই সংস্কার অমাত্যতন্ত্রের (bureaucracy) আধিপত্য বৃদ্ধি করেছে এবং দ্বিতীয়ত, দ্বৈতশাসনের জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তবে এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারনীতিতে দায়িত্বশীল সরকারের যে স্বীকৃতিটুকু দেওয়া হয় চিত্তরঞ্জন তাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। প্রকৃতপক্ষে অমাত্যশাসন অপেক্ষা আইনের শাসনকে তিনি শ্রেয় মনে করেন। তাঁর মতে, বহুপ্রকার 'তন্ত্র' যেমন বলশেভিকতন্ত্রের ন্যায় নানান ধরনের সামূহিকতাবাদ (Collectivism) যেরূপ মারাত্মক উগ্রতা প্রদর্শন করছে তার ফলে সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে শাসনব্যবস্থায় অতি কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা থাকে তা মানবকল্যাণকর হয় না।[৫] কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্যের পরিবর্তে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। জনসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে তিনি যথাসম্ভব প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রশাসনের বিকেন্দ্রায়ন হলে অমাত্যতন্ত্রের আধিপত্য হ্রাস পাবে এবং তার ফলে জনপ্রতিনিধিগণ অধিকতর দায়িত্বের সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অস্বীকার করেন নি।

---

৪ Appadorai : পূর্বোক্ত, pp. 717-718

৫ Lalbahadur : পূর্বোক্ত, pp. 106

www.pathagar.com

তবে যেখানে রাজনৈতিক দল থাকবে সেখানে লিখিত সংবিধান থাকতে হবে। চিত্তরঞ্জন সম্ভবত মনে করেন যে লিখিত সংবিধানে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি থাকা আবশ্যক। বোঝা যায়, সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকাকে তিনি খাটো করে দেখেন নি, অবশ্য নিজেও স্বীয় রাজনৈতিক লক্ষ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে স্বরাজ্য দলটি ব্যবহার করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা

তৎকালীন রাজনীতিতে যে সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট ছিল তা হলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসমস্যা। চিত্তরঞ্জন উপলব্ধি করেন যে এই জটিল সমস্যার নিরসন না হলে স্বরাজ আন্দোলনের পথে অনিবার্যভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তিনি স্বীকার করেন যে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের অর্থ তাদের প্রতি অবিচার করা। কাজেই সংখ্যানুপাত ভিত্তিতে ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের জন্য আইন পরিষদে আসনসংখ্যা বণ্টন এবং একই ভিত্তিতে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগদানের নীতি গ্রহণের প্রশ্নে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন নি। চিত্তরঞ্জন দাস-এর **সি. আর. দাস ফর্মুলা** বা **বেঙ্গল প্যাক্ট** (১৯২৩) নিঃসন্দেহে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ততর করে। মুসলিম নেতাদের মধ্যে **বেঙ্গল প্যাক্ট** সম্পাদনায় সহযোগিতা করেন আব্দুল করিম, মুজিবর রহমান, আকরম খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। স্যার আব্দুর রহিম, ফজলুল হক এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীও বেঙ্গল প্যাক্টকে স্বাগত জানান। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল ঃ মোট সরকারি চাকুরির পঞ্চান্ন ভাগ চাকুরিতে মুসলমান প্রার্থীকে নিয়োগ করা হবে, তবে যতদিন এই লক্ষ্যযাত্রা অর্জিত না হবে ততদিন মোট চাকুরির আশি ভাগ মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বেঙ্গল প্যাক্ট-এর সমর্থনে চিত্তরঞ্জন আইন পরিষদে বলেন ঃ

> স্বরাজের বুনিয়াদ রচনা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। স্বরাজ লাভের পর আমাদের সরকার হিন্দু সরকার না মুসলমান সরকার এরূপ কোন সংশয় যাতে আমাদের মনে জাগ্রত না হয় সেজন্য আমরা এই চুক্তিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত করেছি . . . আমাদের মধ্যে যদি আত্মসম্মানবোধ থাকে তাহলে আমাদের বলা উচিত যে যতদিন না আমাদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ততদিন আমরা সবকিছু ত্যাগ করব . . . আমরা আমাদের অধিকার অর্জন করতে চাই, তা হলো মৌলিক অধিকার। আমি চাই এজন্য হিন্দু-মুসলিম উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পারস্পরিক অবিশ্বাস নির্মূল করার জন্য সংগ্রাম করে যাবে[৬]।

---

৬ BLCP : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬, অনূদিত

www.pathagar.com

অনস্বীকার্য যে **বেঙ্গল প্যাক্ট** হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করেছিল। চিত্তরঞ্জন এই চুক্তিকে সঙ্গত কারণেই হিন্দু-মুসলিম ফেডারেশনের সাংবিধানিক দলিল বলে আখ্যায়িত করেন। অনস্বীকার্য যে চিত্তরঞ্জন অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব নিয়ে **বেঙ্গল প্যাক্ট** সম্পাদন করেছিলেন, কিন্তু হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গের প্রবল বিরোধিতার কারণে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। লালা লাজপত রায় ও পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য **বেঙ্গল প্যাক্ট** বানচাল করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এমন কি গান্ধীও প্যাক্ট-এর প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। এমনও মন্তব্য করা হয়েছে যে এই প্যাক্ট-এর মাধ্যমে 'মুসলিম সমর্থকদের ঘুষ দেওয়া হয়েছে'। সি. আর. দাস ফর্মুলার ব্যর্থতা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ অনেকটা রুদ্ধ করে দেয়।[৭]

উগ্র ব্যক্তিবাদ বিরোধিতা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি স্বদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে ভালবেসেছেন। বহুদিন ইংলন্ডে অবস্থান করলেও তিনি পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি। তাঁর মতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় নৈতিক, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের বড়ো অভাব যে কারণে পাশ্চাত্য সমাজে অস্থিরতা, যুদ্ধ ও শোষণপ্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের উৎপত্তি ঘটেছে য়ুরোপেই। য়ুরোপের দুর্বলতা এই যে ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের প্রচণ্ড উগ্রতা দমন করতে পারে নি। বস্তুত উগ্র ব্যক্তিবাদ যখন বৃহত্তর জাতিবাদের মুখোশ ধারণ করে তার পরিণতিতে বিশ্ববিধ্বংসী যুদ্ধ বাধে, মানবসভ্যতা সীমাহীন সংকটে পতিত হয় যার ফলে ব্যক্তিবাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়। আবার উগ্র সমাজবাদও কাম্য নয়। পরিশীলিত জীবনের জন্য যেমন বিত্তসম্পদের প্রয়োজন হয়, তেমনি বিত্তসম্পদ অর্জনের জন্যও চাই ব্যক্তিক উদ্যম। ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশের জন্য ব্যক্তিসম্পত্তি অপরিহার্য। অর্থাৎ, ব্যক্তিবাদের মূলে যে ধারণা লক্ষণীয় তা হলো ঃ বিত্তসম্পদের উপর ব্যক্তির মালিকানা এবং তা স্বাধীন ও একান্তভাবে ভোগের অধিকার। চিত্তরঞ্জন স্পষ্টত সমাজবাদ অপেক্ষা সম্পত্তির ব্যক্তিক মালিকানার পক্ষপাতী ছিলেন। এ কারণে এম. এন. রায় ও আর. পি. দত্ত প্রমুখ মার্কস্‌বাদী চিত্তরঞ্জনকে সামন্তবাদী পাঁতিবুর্জোয়া বলে অভিহিত করেন।

সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনীতি স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন অনেক চরমপন্থী নেতার সমর্থন পায় নি। সরকারের সঙ্গে যুক্ত থেকে সরকারে উচ্ছেদ সাধন আদৌ সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। চিত্তরঞ্জনের সমালোচনা করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন, "এই

---

৭ Harunor Rashid : *The Foreshadowing of Bangladesh ;* Dhaka, 1987 ; p. 20-24

www.pathagar.com

প্রতিরোধপন্থীরা (চিত্তরঞ্জন, মতিলাল প্রভৃতি) স্বৈরাচারী সরকারের বিরোধিতা করে সাময়িকভাবে বীরত্ব জাহিরের প্রয়াস পাচ্ছেন বটে, কিন্তু এঁরা দেশবাসীর জন্য রেখে যাচ্ছেন তাঁদের অশুভ কর্মকাণ্ডের ফসল। একটি রাজনৈতিক দল এবং বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে পরিষদ ভাঙার নীতি আদৌ সফল হতে পারে না।" (অনূদিত) তেজবাহাদুর সপ্রুর ন্যায় উদারপন্থী নেতাও চিত্তরঞ্জনকে "Peripatetic patriot with patriotism in locomotion" — অর্থাৎ, চলমান দেশপ্রেমিক যার দেশপ্রেমও চলিষ্ণু বলে উপহাস করেন।

অনস্বীকার্য যে চিত্তরঞ্জন আইন পরিষদের ভেতরে থেকে সরকারবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন, তা বলে তিনি পরিষদবহির্ভূত আন্দোলনের বিরোধিতা করেন নি। চৌরিচরার ঘটনার পর গান্ধীজী যখন অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেন তাতে চিত্তরঞ্জন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে তিনি ও তাঁর স্বরাজ্য দল পরিষদে যোগদান করে সরকার উচ্ছেদের যে নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন তা ফলপ্রসূ হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। বরং তৎকালীন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। তিনি আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে সরকারি নীতির বিরোধিতা করেছেন, সরকারি বিলের তীব্র সমালোচনা করেছেন যেজন্য ইংরেজ সরকার কখনো কখনো জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, চিত্তরঞ্জন দাসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ইংরেজ রাজশক্তির বুনিয়াদ টলাতে পারে নি। তাছাড়া স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন সন্দেহ নেই।

চিত্তরঞ্জনের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর শ্রেণীগত অবস্থানের চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের উঁচু শ্রেণীতে অবস্থানের কারণে তাঁর শ্রেণীমানসিকতা এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যেজন্য সমাজতন্ত্রের শুধু উগ্র রূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিসম্পত্তির সপক্ষে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাতে তাঁর পুঁজিবাদী মনোভাবটি ধরা পড়ে। বিশেষত তাঁর ব্যক্তিবাদী মতাদর্শে জে. এস. মিল-এর উদারবাদী — যা একদিক থেকে পুঁজিবাদীও বটে — ভাবধারার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

তবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তাভজা ছিলেন না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি যথার্থই খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিনি স্বদেশচিন্তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ঐশী গুণের অভিব্যক্তি। তিনি বলেন, "I find in the conception of my country the expression of divinity." সুতরাং স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেও দ্বিধান্বিত হন নি। স্বরাজ অর্জনের জন্য যে পথ তিনি অনুসরণ করেন সে সম্পর্কে অনেকের দ্বিমত ছিল সত্য, কিন্তু একজন খ্যাতিমান আইনজীবীর পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করাই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া সমকালীন রাজনীতির চরিত্রটি তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষত

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে তিনি বিচার করেন উদার ও সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে। আইনসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারি চাকুরিতে সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে মুসলমান প্রার্থীদের নিয়োগের প্রশ্নে তিনি উদার, নিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। **বেঙ্গল প্যাক্ট** সম্পাদনকালে তিনি যে গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তৎকালীন ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী নেতৃত্ব যদি দেশবন্ধুর মতো উদার মনোভাব নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন তাহলে হয়তো উপমহাদেশের রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। তা হয় নি বলেই উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে, তীব্রতর হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

www.pathagar.com

খেলাফত আন্দোলনের রাজনীতি

১৭

মওলানা মোহাম্মদ আলী*
(১৮৭৮–১৯৩১)

ভারতের রামপুর রাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রইস-উল-আহরার মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি ইসলামী ঐতিহ্য-প্রভাবিত পরিবেশে লালিতপালিত হলেও তাঁর ইংরেজি শিক্ষার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তিনি আলীগড় কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন (বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন)। তারপর ইংলন্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনি ছিলেন আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কিছুকাল রামপুর রাজ্যের প্রধান শিক্ষা অফিসার ছিলেন ; তারপর বরোদা সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কিন্তু চাকুরিজীবীর পেশা অপেক্ষা সংগ্রামী রাজনীতিক জীবন তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা *Comrade* ও উর্দু সাপ্তাহিক **হামদর্দ** ছিল তাঁর মতাদর্শের প্রচারমাধ্যম। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *My Life : A Fragment* থেকেও তাঁর জীবনেতিহাস ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যাঁরা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন মওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁদের অন্যতম। ইংরেজ রাজশক্তির রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে তিনি ভারতবাসীদের জন্য পূর্ণ স্বরাজ দাবি করেন।

খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব

মওলানা মোহাম্মদ আলীর রাজনৈতিক অঙ্গনে পদচারণা শুরু হয় খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রনায়কের। তাঁর রাজনৈতিক অবদান আলোচনার পূর্বে খেলাফত আন্দোলনের ঈষৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

---

* প্রবন্ধাবলী-তে প্রকাশিত ; উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭)

www.pathagar.com

মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃত্বের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্যান-ইসলামী ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা ইসলামকে দেখেছেন একটি বিশ্বজনীন আদর্শ ধর্ম হিসেবে। কাজেই বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী শক্তির পুনরুজ্জীবন বা স্থিতিশীলতা তাঁদের কাম্য ছিল। ১৯১৮ সনের জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন যে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় যদি মিত্রশক্তির পক্ষে অস্ত্রধারণ করে তাহলে যুদ্ধে জয়লাভের পর মিত্রশক্তি তুরস্কের স্বাধীনতা ও খেলাফতের উপর কোন হস্তক্ষেপ করবে না। লয়েড জর্জ-এর আশ্বাসে আস্থা রেখে মুসলমানগণ দলে দলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর ব্রিটেন ও মিত্রশক্তি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। সেভার্স-এর সন্ধিচুক্তি ও জাতিসঙ্ঘের নির্দেশবলে মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও গ্রীস) তুরস্কের বিরাট অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। তুরস্কের অন্তর্গত আর্মেনিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ট্রান্সজর্দান, মেসোপটেমিয়া, গালিপলি, অদ্রিয়ানোপল,স্মার্না, টেনেডোস, এমব্রোস দ্বীপপুঞ্জ ও এসিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির উপর মিত্রশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরন্তু দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রভৃতি প্রণালীর উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। তবে ভাগাভাগির সিংহভাগ লাভ করে ব্রিটেন। এছাড়া তুরস্কের উপর বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

মিত্রশক্তি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যেভাবে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব হরণ করে তাতে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এর প্রতিবাদে 'আলী ভ্রাতাদ্বয়' অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং মওলানা শওকত আলী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। ১৯১৯ সনের মধ্যভাগে তাঁরা নিখিল ভারত খেলাফত সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্য নেতৃবর্গ ব্রিটেনের বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেন। কেবল তাই নয়, ইংরেজ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা দানে বিরত থাকার জন্য তাঁরা সকল ভারতবাসীকে আহ্বান করেন। প্রকৃতপক্ষে খেলাফত আন্দোলনের সূত্রেই স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। খেলাফত নেতাগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। তাঁদের, বিশেষত মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনলবর্ষী বক্তৃতা জনমনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়, যার ফলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে। ইতঃপূর্বে আর কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতীয় জনগণ এরূপ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

খেলাফত অন্দোলনই ভারতীয় জনসাধারণের জন্য রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। এতদিন যে রাজনীতি উঁচুমহলে সীমাবদ্ধ ছিল তা জনসাধারণের আয়ত্তে চলে আসে। ১৯১৯ সনের ১৭ অক্টোবর খেলাফত দিবস পালন করা হয়। সেদিন যেরূপ ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তাতে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাও খেলাফত আন্দোলনের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে এই আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ সুগম হবে। তাছাড়া কুখ্যাত রাওলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড জনমানসে যে গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করেছিল তার ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াও আগে থেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কাজে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

অপর দিকে ইংরেজ সরকার খেলাফত আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার দমননীতির আশ্রয় নেয়। দণ্ডবিধি আইনের ১০৪ ও ১০৮ ধারা জারির মাধ্যমে সরকার রাজদ্রোহমূলক সভাসমিতি বন্ধ করে দেয় এবং একই সঙ্গে আলী ভ্রাতাদ্বয়কে কারারুদ্ধ করে। সে সময় নানকানা সাহেবের গুরুদুয়ারায় গমনরত তীর্থযাত্রীদের উপর সরকারি বাহিনীর গুলীবর্ষণের ফলে প্রায় দুইশত তীর্থযাত্রী মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। হরতাল, ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ, ব্রিটিশবিরোধী প্রচারণা, প্রতিবাদসভা ইত্যাদি তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ১৯২১ সনের নভেম্বর মাসে যে দিন ইংলন্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে আগমন করেন সেদিনও জনসাধারণ তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে হরতাল ও কালো পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। খেলাফত আন্দোলন অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি ; কারণ ১৯২৩ সনের ১৭ নভেম্বর তুরস্কের সংগ্রামী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের আঙ্গোরা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে এবং তুরস্কের খলিফা ষষ্ঠ সুলতান মাহমুদকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করে নিজেই শাসনক্ষমতা ধারণ করেন। তুরস্কের খলিফাতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের খেলাফত আন্দোলনেও ভাটা পড়ে যায়। তবে এই আন্দোলনের গতি থেমে গেলেও ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে সুসংহত করার ব্যাপারে খেলাফত আন্দোলনের বিপুল প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর জাতিবাদ

যে রাজনৈতিক পশ্চাদভূমিতে মওলানা মোহাম্মদ আলীর রাজনীতিক চিন্তা দানা বাঁধে তার ঈষৎ পরিচয় দেওয়া গেল। ইসলামী ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা উভয়ই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে

www.pathagar.com

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি য়ুরোপীয় জাতিবাদের বিকাশধারা যেমন লক্ষ্য করেন, অপরদিকে ইসলামের আদর্শকেও স্বীয় চিন্তাধারার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর উক্তি থেকেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

> যেখানে আল্লাহ্ নির্দেশ করেন তথায় আমি আগে একজন মুসলমান, পরেও মুসলমান, শেষেও মুসলমান এবং মুসলমান বৈ আর কিছু নই . . . কিন্তু যেখানে ভারতের প্রশ্ন জড়িত, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, ভারতের কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে আমি আগে একজন ভারতীয়, পরেও ভারতীয়, শেষেও ভারতীয় এবং ভারতীয় বৈ আর কিছু নই।[১]

মওলানা মোহাম্মদ আলীর চিন্তা ও চেতনার মূল উৎস ইসলাম ধর্ম, এ কারণে ধর্মনিরপেক্ষ, লোকায়ত রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। এ কথা তাঁর উক্তি থেকেও ধরা পড়ে। তিনি বলেন ঃ

> রাজনীতিকে ধর্মের আওতামুক্ত করার চিন্তাটা ভুল। ধর্ম বলতে গোঁড়া মতবাদ বুঝায় না বা আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্বও কিছু নয়। আমি মনে করি এর অর্থ জীবন বিশ্লেষণ। আমার কৃষ্টি আছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি আছে — এর সামগ্রিক সংশ্লেষণই ইসলাম[২]

ইসলাম ধর্মে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল বলে অনেক সময় রাষ্ট্রিক জাতিবাদের পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক জাতিবাদকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের সকল মুসলমানকে তিনি দেখেছেন একটি ধর্মীয় জাতি হিসাবে। এই প্যান-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তিনি আধুনিক জাতিবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

> আমরা জাতীয়তাবাদী নই, বরং অতি জাতীয়তাবাদী (supernationalist) এবং একজন মুসলমান হিসাবে আমি বলছি যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং শয়তান তৈরি করেছে জাতি। জাতি বিভক্ত করে, আমাদের ধর্ম ঐক্যবদ্ধ করে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে বিরাট ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতা দেখা গেছে কোন ধর্মযুদ্ধে এরূপ দেখা যায় নি, এবং সে যুদ্ধটা ছিল তোমাদের (ইংরেজ জাতি) জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ, আমাদের জেহাদ নয়।[৩]

---

১ *Round Table Conference Proceedings*, 1930-31, p. 96, অনূদিত

২ *RTCP*. ঐ p. 96, অনূদিত

৩ *RTCP*. ঐ p. 96

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম সমস্যার আলোকে শাসনতন্ত্রচিন্তা

মওলানা মোহাম্মদ আলী তৎকালীন ভারতের ভবিষ্যৎ সরকারপদ্ধতির যে রূপরেখা তৈরি করেন তাতে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার জটিলতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁর ধারণা, দোকানদারের জাত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এই সমস্যা তৈরি করেছে। প্রকৃতপক্ষে "হিন্দু ও মুসলমান যে কারণে পরস্পর ঝগড়া করছে তা হলো তারা ইংরেজের আধিপত্য আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে রাজী নয়।"[৪] বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার যাতে সংবিধানে সুরক্ষিত থাকে সেদিকেও মওলানা মোহাম্মদ আলী সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। 'মেজরিটি রুল' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ভারতের জন্য আদর্শ শাসনব্যবস্থা একথা তিনি বারংবার স্বীকার করেছেন, তবে শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নেও তিনি অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। তাঁর মতে ভারতে যেহেতু মেজরিটি রুল-এর ঐতিহ্য বলতে কিছু নেই সে কারণে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে ভারতের শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অধিকার যথাযথভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করবে। ভারতের লোকসংখ্যার ৬৬ ভাগ হিন্দু এবং ২৫ ভাগ মুসলমান। বাকী ৯ ভাগের মধ্যে রয়েছে খ্রীস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী ইত্যাদি। আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় যেহেতু বৃহত্তম সে কারণে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নটি তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন ঃ

> A Separate electorate gives to the Mussalman client in the case he is fighting the counsel that he selects himself and can trust.[৫] (অর্থাৎ, স্বতন্ত্র নির্বাচনই মুসলমান মক্কেলের জন্য তার মামলা পরিচালনার কাজে স্বাধীনভাবে এমন কৌসুলি নির্বাচনের সুযোগ এনে দেবে যার উপর সে আস্থা রাখতে পারে।)

অবশ্য প্রায় এক যুগ পরে স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রশ্নে মওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তাঁর ধারণা জন্মে যে স্বতন্ত্র নির্বাচনের পথে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সামাধান হবে না এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থেও এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে তিনি মিশ্র আঞ্চলিক নির্বাচনব্যবস্থার অনুকূলে রায় দেন। এই নির্বাচনপদ্ধতি কিরূপ

---

৪ *RTCP*. ঐ p.95

৫ *RTCP*. ঐ p. 163

www.pathagar.com

হবে তিনি তারও আভাস দিয়েছেন ঃ নির্দিষ্ট আসনগুলি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটির জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে যদি সে —

এক তার নিজ সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের ৪০ ভাগ ভোট পায়, (অর্থাৎ প্রার্থী মুলসমান হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের ৪০ ভাগ ভোট তার পেতে হবে ; হিন্দু প্রার্থীর বেলাতেও একই নিয়ম)।

দুই যে এলাকায় ঐ প্রার্থীর নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ বা তার চেয়ে কম সে এলাকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট প্রদত্ত ভোটের অন্যূন ৫ ভাগ ভোট পায় ; এবং

তিন যে এলাকায় ঐ প্রার্থীর নিজ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের বেশী অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মোট প্রদত্ত ভোটের অন্যূন ১০ ভাগ ভোট পায়।[৬]

মওলানা মোহাম্মদ আলী মনে করেন যে এই নির্বাচনব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার অবসান হবে এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটবে। ভারতের ভবিষ্যৎ সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর গভীর রাজনীতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। য়ুরোপের, বিশেষত ইংলন্ডের গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল ; সম্ভবত এ কারণে তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থাও ইংলন্ডীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া বহুধা বিভক্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের জন্য এককেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র প্রযোজ্য নয় একথাও তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উপরন্তু আগামী দিনের স্বাধীন ভারতকে তিনি ইউনাইটেড স্টেটস্ অব ইন্ডিয়া নামে অভিহিত করেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি

মওলানা মোহাম্মদ আলী ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন প্রকার আপোস করেন নি। তাঁর মতে, পরাধীনতা মানুষকে শুধু দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে না, তার মনুষ্যত্বও বিনষ্ট করে। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণের কথাও চিন্তা করেন নি। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেন ঃ

> I have not come to ask for Dominion Status. . . The one thing to which I am committed is complete independence.[৭]

---

৬ *RTCP.* ঐ p. 166-167

৭ *RTCP.* ঐ p. 93

www.pathagar.com

মওলানা মোহাম্মদ আলী পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, সাথে সাথে তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে গোটা মুসলিম ভারত তাঁর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। উল্লেখ্য যে যে-যুগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষী সহযোগিতাবাদী রাজনীতির পথ অবলম্বন করেন তখন মওলানা মোহাম্মদ আলী পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক নিয়ে রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ ; কাজেই ইংরেজশাসিত ভারতে শাসনপদ্ধতির চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। তিনি মনে করেছিলেন, ভারতীয় নেতৃবর্গ ও জনসাধারণই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। স্বতন্ত্র নির্বাচন অথবা সংখ্যানুপাত ভিত্তিতে আইন পরিষদে আসন লাভের প্রশ্নে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তা ভারতীয় জনগণই সমাধান করতে পারবে, এজন্য ইংরেজের দ্বারস্থ হওয়া তিনি সম্মানজনক মনে করেন নি। ১৯২৮ সনে কংগ্রেস যখন নেহরু রিপোর্টের ভিত্তিতে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবি করে মওলানা মোহাম্মদ আলী তা সমর্থন করেন নি। তিনি দাবি করেন পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "খল্‌ক খোদা কি, মুলক ব্রিটিশ কা, হুকুম মহাসভা বাহাদুর কা"। তিনি ১৯২৮ সনেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আলী 'স্বাধীনতা হীনতায়' বাঁচতে চান নি বলেই ইংলন্ডে অবস্থানকালে বলেছিলেন যে পরাধীন ভারতে তিনি আর ফিরে যাবেন না। তিনি কথা রেখেছিলেন। ১৯৩১ সনে ইংলন্ডের মাটিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অবদানের মূল্যবিচার

মওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যে অবদান রেখেছেন তার গুরুত্ব কোনক্রমে খাটো করে দেখা চলে না। সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধবাদী ধারাটি কিছুকালের জন্য স্তিমিত ছিল মওলানা মোহাম্মদ আলী তাতে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করেন। তাঁর অপর বিশেষত্ব এই যে তিনি খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতীয়কে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবেই তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ সর্বভারতীয় পটভূমিকায় প্রসারিত হয়েছিল।

তবে তিনি যে খেলাফতের আদর্শ সম্মুখে রেখে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন তা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে কতখানি গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাহলে তিনি কি খলিফাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন? অন্তত তাঁর রচনাবলী ও বক্তৃতা-বিবৃতি তার প্রমাণ বহন

www.pathagar.com

করে না। ভারতে খেলাফত পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন একথা মেনে নেওয়া কঠিন ; বরং বলা যায়, ইসলামী আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই পৃথিবীর সকল ইসলামী শক্তির স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। এ কারণে যখনি বিশ্বের কোন অঞ্চলে ইসলামী শক্তির উপর অমুসলিম শক্তি আঘাত হেনেছে তিনি তখনি বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই বিক্ষোভ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার প্রধান উৎস।

অতঃপর তাঁর জাতিবাদের কথা ধরা যাক। ইসলাম ধর্মে তাঁর অগাধ বিশ্বাসহেতু স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সমাজের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছেন। সুতরাং বিশ্বের মুসলমানদের তিনি একই ধর্মীয় জাতিভুক্ত মনে করেছেন। যেখানে মুসলিম বিশ্বের প্রশ্ন জড়িত সেখানে রাষ্ট্রিক জাতিবাদ তাঁর চিন্তাধারায় ঠাঁই পায় নি। কিন্তু ভারতের প্রশ্ন যখন এসেছে তখন আবার সর্বভারতীয় জাতিবাদের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। এর কারণ তাঁর স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও দেশাত্মবোধ। তাঁর প্যান-ইসলামী অতিজাতিবাদ ও স্ব-রাষ্ট্রিক জাতিবাদ তাঁর চিন্তাধারায় কোন অসঙ্গতি সৃষ্টি করে নি। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় ইসলাম, স্বদেশ ও স্বাধীনতা সমান গুরুত্ব পেয়েছে যে কারণে তিনি রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন সত্য, কিন্তু তা বলে তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক নেতা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সমাজ যেভাবে সর্বক্ষেত্রে অবহেলার শিকারে পরিণত হয়েছিল একজন খাঁটি মুসলমান হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সে অবস্থাটা মেনে নিতে পারেন নি। এ কারণে তিনি যখনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন সেসঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এবং এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহে তিনি যে প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করেছিলেন তারই পরিণতিতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। এদিক থেকে মওলানা মোহাম্মদ আলীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়।

www.pathagar.com

দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি

১৮

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্
(১৮৭৬-১৯৪৮)

উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ করাচীর এক খোজা সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারে ১৮৭৬ সনের ২৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জিন্নাহ্ পুন্‌জা ছিলেন চর্মব্যবসায়ী। আর্থিক দিক থেকে পুন্‌জা-পরিবার যথেষ্ট সচ্ছল ছিল বলে জিন্নাহ্ ছাত্রজীবনে নির্বিঘ্নে বিদ্যার্জনে ব্রতী হতে পেরেছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন বোম্বাইতে, পরে সিন্ধু মাদ্রাসা হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। তারপর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মিশন হাই স্কুল থেকে মাত্র ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এর অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ১৮৯২ সনে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলন্ডে গমন করেন। লন্ডনে চার বছর অবস্থানকালে তিনি প্রথমে স্নাতক ও পরে বার-এট-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময়ে ইংরেজদের বেশভূষা ও চালচলন তাঁকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে ; সম্ভবত এ কারণে তিনি আজীবন ইংরাজিয়ানা বর্জন করেন নি।

ইংরেজ জাতির চালচলন ছাড়াও তাদের রাজনৈতিক ভাবধারাও তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত লর্ড মর্লে ও গ্লাডস্টোনের উদারপন্থী মতবাদ, ইংলন্ডের সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনের সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি তাঁর চিন্তা ও চেতনায় বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। সাহেবিয়ানা ছিল তাঁর বাহ্যিক আবরণ, কিন্তু আদতে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং অসাধারণ রাজনীতিক কৌশলজ্ঞানের অধিকারী। তাঁর চরিত্রের এই দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনালগ্ন থেকে। জিন্নাহ্ ১৮৯৬ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। একজন ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি যখন জীবনারম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। প্রথম পর্যায়ে আইনজীবী হিসাবে তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু এই অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নি। কয়েক বছরের মধ্যেই বিশিষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এক সময়ে (১৯০০ সন)তিনি বোম্বাই-এর তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে নিয়োগলাভ করেছিলেন। কিন্তু আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে কয়েক মাস পর সরকারি চাকুরি ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯০৬ সনে। অবশ্য তারও আগে লন্ডনে অধ্যয়নকালে ইংলন্ড ও ভারতের রাজনীতির প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আইরিশ হোমরুল বিলের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যেসব বিতর্ক হতো, অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করতেন। রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ১৮৯২ সন থেকে, যখন ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ করে ভাইসরয়কে আইনসভা ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলোকে সম্প্রসারণের ক্ষমতা দান করে, যার ফলে ভারতীয় নাগরিকগণ সর্বপ্রথম আইন পরিষদে তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পেল।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমে উত্তপ্ত হতে থাকে। তখন রাজনৈতিক মঞ্চের প্রধান কুশীলব দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ফিরোজশাহ মেহতা, দিনশ ওয়াচা, তেলাঙ্গ, বদরুদ্দিন তায়েবজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, সৈয়দ আহমদ খান, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতা। এঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অভিন্ন ছিল একথা বলা যায় না, বরং সামগ্রিকভাবে বিচার করলে তাঁদের মতাদর্শের তিনটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়।[১] একটি ধারার প্রবক্তাগণ (দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ) ছিলেন প্রধানত উদারপন্থী এবং শান্তিপূর্ণ পন্থায় অর্থাৎ আলোচনা ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে বিশ্বাসী। দ্বিতীয় ধারার অনুসারীগণ (বিপিন পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় প্রমুখ) হিন্দুধর্মের সংস্কার ও প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের অনেকেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে উগ্রপন্থী হিন্দুদের সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলন। উল্লেখ্য যে শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। তৃতীয় ধারার সমর্থকগণ (স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ) মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বার্থে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়াস চালান। তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়কে ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে আহ্বান করেন বটে, তা বলে এদেশে পাশ্চাত্য শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন সমর্থন করেন নি। তাঁদের যুক্তি, এদেশে পাশ্চাত্য সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে।

---

১ Matlubul Hasan Saiyid : *Mohammad Ali Jinnah, A Political Study* ; (Lahore, 1963), p. 10

www.pathagar.com

স্বাভাবিক কারণে এই ত্রি-ধারার প্রবক্তাগণ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারেন নি যার ফলে তৎকালীন রাজনীতির ধারাও বিভিন্নমুখী খাতে আবর্তিত হতে থাকে। এই রাজনৈতিক আবহে জিন্নাহ্ রাজনৈতিক মঞ্চে আসেন। তিনি গোড়া থেকে এই ত্রি-ধারার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। যেহেতু তিনি আবেগপ্রবণ ছিলেন না সে কারণে কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সবকিছু ধীরস্থিরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন।

১৯১৭ সনে যখন এ্যানি বেসান্ত হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন জিন্নাহ্ প্রথম দিকে তার প্রতি শীতল মনোভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু স্বশাসন আন্দোলনের সূত্রে যখন এ্যানি বেসান্ত কারারুদ্ধ হলেন তখন তাঁর মুক্তির জন্য জিন্নাহ্ এগিয়ে আসেন। ন্যায়বিচার ও স্বাধিকারের অমোঘ বিধান নির্মমভাবে পদদলিত হচ্ছে দেখে তিনি সরকারের অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তার অব্যবহিত পরেই জিন্নাহ্ বোম্বাই হোমরুল লীগের সভাপতি হন। সে বছর বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশনের এক সভায় তিনি নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলন, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের সভাসমিতি করার অধিকারের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। উপরন্তু তিনি স্বৈরাচারী সরকার ও জনগণকে দাবিয়ে রাখার সরকারি ষড়যন্ত্রেরও তীব্র নিন্দা করেন। আবার যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তিনি তখন এই আন্দোলনের অর্থ নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করেন। তাঁর ধারণা হলো, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মোহাচ্ছন্নতা ভারতের রাজনৈতিক প্রবাহের স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কাজেই অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণকর মনে করেন নি।[২] তবে আন্দোলন বা বিপ্লবের পথ বর্জনীয় এ কথা তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। বরং ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে সকল শক্তি দিয়ে হলেও তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার খেলাফত আন্দোলনের আবেগগত দিকটিও তাঁর কাছে অশুভ মনে হয়েছে।

রাজনৈতিক ভূমিকা

রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে জিন্নাহ্ ছিলেন দাদাভাই নওরোজীর একান্ত সচিব। নওরোজীর নিকট থেকেই তিনি প্রথম জীবনের রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে জিন্নাহর দুই প্রকার ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় ঃ বিশ-এর দশকে তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নিরলস প্রবক্তা ; কিন্তু ত্রিশ ও চল্লিশ-এর দশকে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ সংগঠক এবং ইসলামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। বিশ-এর দশকে তিনি পরম আন্তরিকতার সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনার জন্য

২ Saiyid : পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

www.pathagar.com

অক্লান্ত প্রয়াস চালান। ১৯১৬ সনে বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণেও তাঁর মনোভাব ধরা পড়ে। তিনি বলেছিলেন ঃ

> বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত ও মুর্খের বুলির হট্টগোলের মধ্যেও ভারতের প্রশ্নে কোন স্থির স্বভাবের মানুষ এই মহান সুস্পষ্ট স্বতসিদ্ধ সত্যটি বিস্মৃত হতে পারেন না যে ভারত সর্বতোভাবেই ভারতবাসীদের। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সত্যিকার সমঝোতা ও সুসমঞ্জস সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেই ভারতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।[৩]

১৯১৯ সনে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া বিল সম্পর্কে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যেও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

> এমন দিন যদি কখনো আসে যেদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না, তার চেয়ে আমার আনন্দের দিন আর হতে পারে না।[৪]

এরপর ১৯২৫–এর সর্বদলীয় সম্মেলনেও তিনি বলেছিলেন ঃ

> মুসলমানদের দাবি সম্পর্কে কোন কথা বলতে আমি আসি নি। আমরা এসেছি আপনাদের সহকর্মী হিসাবে আপনাদের পাশে বসতে। আসুন আমরা হিন্দু বা মুসলিম হিসাবে নয়, ভারতীয় হিসাবে একযোগে কাজ করি।[৫]

জিন্নাহ্‌র মনোভাবের প্রশংসা করে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তাঁকে "The best ambassador of Hindu Muslim unity" বলে সম্বোধন করেছিলেন। মহিয়সী নেত্রী সরোজিনী নাইডু জিন্নাহ্‌র উদ্দেশে একটি প্রশস্তিসূচক পদ্য রচনা করেছিলেন। জিন্নাহ প্রথম থেকেই হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোস-আলোচনার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের মাধ্যমে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে যার ফলে জিন্নাহ্‌র ঐক্যপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। তবু তিনি আশা ত্যাগ করেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করা হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূরীভূত হবে। ১৯২৫–এর ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগের আলীগড় সম্মেলনে তিনি যে প্রস্তাব রাখেন তাতেও তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি প্রস্তাব করেন ঃ

> এক দেশের সকল আইনপরিষদ এবং অন্যান্য নির্বাচনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি পর্যাপ্তভাবে ও কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় ;

---

৩ Saiyid : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮, অনূদিত

৪ Khalid Bin sayeed : *The Personality of Jinnah and his Political Strategy : The Partition of India,* (ed. C. H. Philips & Mary Doren Wainwright) London, 1970, অনূদিত

৫ ঐ, পৃ. ২৭৬, অনূদিত

www.pathagar.com

তবে এ-ও লক্ষ্য রাখতে হবে যে এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যেন সংখ্যালঘু বা তার সমান সম্প্রদায়ে পরিণত না হয় ;

দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি গ্রহণ করা হোক ; তবে যে-কোন সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুক্তনির্বাচন পদ্ধতিতে ফিরে যাবার অধিকার থাকবে ;

তিন ধর্ম, বিশ্বাস, ধর্মাচরণ ও প্রচারকার্যের স্বাধীনতাসহ সমিতি গঠন ও শিক্ষালাভের অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে ;

চার কোন বিল/প্রস্তাব বা তার অংশবিশেষ আইন পরিষদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের অনুমোদন ব্যাতিরেকে আইনে পরিণত করা যাবে না।

১৯২৮ সনে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি যে রিপোর্ট (নেহরু রিপোর্ট) প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় যে জিন্নাহর প্রস্তাবসমূহ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। নেহরু রিপোর্টের উপর জিন্নাহ্ যে বক্তব্য রাখেন তাতেও তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে[৬] ঃ

এক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত উভয় সম্প্রদায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা।

দুই ভিন্ন একটি জাতির নিকট থেকে গণতান্ত্রিক সংবিধান বা প্রতিনিধিশাসন তখনি আদায় করা সম্ভব যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে।

তিন সংখ্যাগুরু শ্রেণীর মধ্যে সাধারণত স্বেচ্ছাচারিতার দিকে ঝোঁক থাকে যে কারণে সংখ্যালঘু শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই এই আশঙ্কা পোষণ করে যে তাদের অধিকার সুরক্ষার আইনগত ব্যবস্থা না থাকলে তারা নির্যাতিত হবে। এ আশঙ্কা ভারতে সবচেয়ে বেশি প্রবল, কারণ এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম ও স্বতন্ত্র কৃষ্টি।

চার এদেশের সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসন করতে হলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সংখ্যালঘু শ্রেণীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব কিরূপ হবে তা মুসলিম সম্প্রদায় স্থির করবে।

---

৬ Saiyid : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

www.pathagar.com

পাঁচ ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে এবং অবশিষ্ট বা রেসিডুয়ারী বিষয়গুলির দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

জিন্নাহ্‌র উপর্যুক্ত প্রস্তাবগুলি তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জিন্নাহর প্রস্তাবগুলি তেজবাহাদুর সপ্রুর ন্যায় কতিপয় উদারপন্থী নেতা সমর্থন করেন বটে, কিন্তু প্রবল বিরোধিতা আসে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের নিকট থেকে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চরিত্রটি তাঁর চোখে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। হিন্দুমহাসভা অবশ্য গোড়া থেকেই মুসলমানদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে এসেছিল। মহাসভার অন্যতম নেতা ভাই প্রেমানন্দ সরাসরিভাবে মুসলিম, খ্রীস্টান সম্প্রাদায়ের প্রতি তাঁর বিদ্বেষভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ "হিন্দুস্থান শুধুমাত্র হিন্দুদের মাতৃভূমি। এদেশে অবস্থানকারী মুসলমান, খ্রীস্টান ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী আমাদের অতিথি মাত্র। তাঁরা যতদিন ইচ্ছা এদেশে আমাদের অতিথি হিসাবে বাস করতে পারেন।"[৭] এই উগ্রপন্থী অমুসলিম নেতারা জিন্নাহ্‌কে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করা দূরের কথা, এমনকি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এই পরিস্থিতিতে জিন্নাহ্ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর সহকর্মীকে বলেন ঃ

জামশেদ, এখন থেকে আমাদের পথ ভিন্ন।[৮]

জিন্নাহর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কৌশলজ্ঞান

অনস্বীকার্য যে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণেই জিন্নাহ্ বাধ্য হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি সুসংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। বিশেষত কংগ্রেসের সঙ্গে কোন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব দেখে তিনি নিজের পথ বেছে নেন। মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার কাজে তিনি অসাধারণ কৌশলজ্ঞানের পরিচয় দেন। অধ্যাপক কে. বি. সায়ীদ তাঁকে 'Superb tactician' বলে আখ্যায়িত করেন। এ সময় থেকে জিন্নাহ্ একজন সুদক্ষ সেনানায়কের ন্যায় তাঁর কর্মসূচী ও রণকৌশল স্থির করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, লক্ষ্য অর্জনের জন্য একই সঙ্গে সুচিন্তিত পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। অনন্যসাধারণ নেতৃত্বগুণের অধিকারী এই জননেতা অচিরেই মুসলিম ভারতের **কায়েদে আযম** উপাধিতে ভূষিত হন।

তবে এ কথাও সত্য যে তৎকালীন মুসলিম রাজনীতিতে জিন্নাহ তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের সুযোগও পেয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, জিন্নাহ নিজেও পূর্ণ ক্ষমতা

---

৭ A. B. Rajput : *Muslim League -- Yesterday & Today* ; (Lahore, 1948), p. 54, অনূদিত

৮ Hector Bolitho: *Jinnah Creator of Pakistan* : (London, 1954), p. 95

www.pathagar.com

স্বহস্তে ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। অধ্যাপক কে. বি. সায়ীদ এর একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি হ্যারল্ড লাসওয়েল-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম হচ্ছে ঃ ক্ষমতা ধারণের প্রবণতা জাগ্রত হয় বঞ্চনাজনিত ক্ষতি পুষিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা থেকে। ব্যক্তি যখন নিজকে হেয় জ্ঞান করে তখন সে ক্ষমতার সাহায্যে ওই মনোভাব দমনের প্রয়াস পায় এবং এই প্রক্রিয়ায় সে শুধু নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটায় না, একই সাথে নিজের পরিবেশও পরিবর্তনের চেষ্টা করে।[৯] সন্দেহ নেই যে জিন্নাহ্ তাঁর পত্নীবিয়োগজনিত কারণে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কিন্তু তা বলে এই একাকিত্ববোধ থেকে তাঁর মধ্যে রাজনীতিক্ষেত্রে একচ্ছত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা জাগ্রত হয়েছিল একথা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অপর দিকে তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও হেয়জ্ঞান জাগ্রত হয় জিন্নাহ্ তার সাথে একাত্মতা বোধ করেন। হয়তো সত্য এই যে, এই বোধ থেকে তিনি দুর্জয় শক্তি অর্জনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। যাই হোক, ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আশা সুদূরপরাহত দেখে হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলেন ঃ

> আমি এক সময় কংগ্রেসের কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছি, সে সময় আমার মধ্যে কোন অহংকার ছিল না — কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ভারতকে সাহায্য করা বা হিন্দুদের মানসিকতার পরিবর্তন করা অথবা মুসলমানগণকে তাদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা আমার সাধ্যাতীত। .....ভারতকে আমি ভালবাসিনি তা নয়, কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি অসহায়।[১০]

জিন্নাহ্র নিকট এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম ভারতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে সহজে স্বীকৃতি দেবে না। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকেও গান্ধী কংগ্রেসের মনোভাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ

> এই সভায় উপস্থিত অন্যান্য দলগুলি গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে মাত্র। একমাত্র কংগ্রেসই গোটা ভারতের এবং সকল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে।[১১]

---

৯ Sayeed : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

১০ Jamiluddin Ahmed (ed.) : *Speeches and Writings of Mr. Jinnah*, Vol.I, (Lahore, 1960), pp. 38-39, অনূদিত

১১ *Round Table Conference Proceedings* (Second Session), (Government of India, Calcutta, 1931), p. 266

www.pathagar.com

কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা গেল যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের কোন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করল। কেবল তাই নয়, তারা বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনেও মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করে।

কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে জিন্নাহ্ মুসলিম লীগকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তির মোকাবেলা করতে হবে শক্তি দিয়ে, কারণ শক্তিমান সাধারণত দুর্বলের সঙ্গে আপোস-মীমাংসায় রাজী থাকে না।

১৯৩৭-৩৮ সনে মুসলিম লীগ অধিবেশনে জিন্নাহ্ স্বীয় মনোভাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ঃ

> রাজনীতির অর্থ ন্যায়বিচার, নায্য ব্যবহার ও কল্যাণচিন্তা নয়, রাজনীতির অর্থ শক্তি। এটা বুঝতে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না যে, কোন সুরক্ষাব্যবস্থা (safeguards) ও মীমাংসা অর্থবহ হবে না যদি তার পশ্চাতে শক্তির জোর না থাকে।[১২]

তিরিশ-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে জিন্নাহ্ শক্তি অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি প্রধানত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি মুসলিম লীগকে মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসাবে নতুনভাবে সংগঠিত করেন ; দ্বিতীয়ত, ভারতের মুসলমান সম্প্রাদয়কে একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। মুসলিম সমাজের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে তিনি যে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা বিরল। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) কারিসমাতিক নেতার যেসব গুণগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন জিন্নাহ্চরিত্রেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতে সম্মোহনী গুণবিশিষ্ট (Charismatic) নেতা সেই ব্যক্তি যিনি মহৎ ধারণা সৃষ্টি করেন, তদনুযায়ী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরি করেন এবং জনতাকে তাঁর লক্ষ্যসিদ্ধির কাজে অগ্রসর হতে বাধ্য করেন। তৎকালীন ভারতীয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানসিক আবহাওয়াও ছিল জিন্নাহর অনুকূলে। 'গণরাজনীতি' বলতে যা বুঝায় তার সূচনা হয়েছিল বিশ শতকের গোড়া থেকে ; তবে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশ-এর দশকে। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ যখন মুসলমান জনগোষ্ঠীকে লীগ-এর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানায় তাতে সকল মুসলমান স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিল। এর কারণ শিক্ষা, সরকারি চাকুরি, আইন-আদালত ও

---

১২ Sayeed : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২, অনূদিত

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল সুযোগবঞ্চিত। সুতরাং তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগ যখন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানায় তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রত্যাশার স্তর অনেক উর্ধ্বে উঠে যায়। মুসলিম লীগকে তারা গ্রহণ করে নিজেদের ত্রাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে। তৎকালে মুসলিম জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ায় মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, কারণ তারাও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ থেকে মুক্ত ছিল না। জিন্নাহ্ নিঃসন্দেহ ছিলেন যে ইংরেজ সরকার তাঁকে সমর্থন করবে না, কারণ ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীতে বহু পাঞ্জাবী মুসলমান কর্মরত ছিল। পাঞ্জাবে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেলে সেনাবাহিনীতে তিনি প্রভাব খাটাবেন এরূপ আশঙ্কা ইংরেজ সরকারের মনে দেখা দিয়েছিল। কাজেই ইংরেজ সরকার প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে সাহায্য করতে থাকে। দুটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিন্নাহ্‌কে এককভাবে লড়াই করতে হয়েছিল ঃ একটি ইংরেজ সরকার, অপরটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। বিশেষত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি বলে ভারতীয় রাজনীতি সমস্যার আবর্তে পাক খেয়েছে। উভয় পক্ষ স্ব-স্ব অবস্থানে অনমনীয় থাকার কারণে ভারতের স্বাধীনতার পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সনে জিন্নাহ্ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসন দাবি করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তাতে কর্ণপাত করে নি। ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সনে তিনি পুনরায় কংগ্রেসের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন, কিন্তু কংগ্রেস তা অগ্রাহ্য করে। এছাড়া ১৯৪৬ সনেও তিনি অখণ্ড ভারতের জন্য যে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করেন কংগ্রেস তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেসের জন্য এর ফল হয়েছে মারাত্মক। কংগ্রেস যতই জিন্নাহ্‌কে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করেছে তার (কংগ্রেসের) পায়ের তলা থেকে মাটি ততই সরে গেছে। ফলে জিন্নাহ্‌র শক্তিবৃদ্ধিও ঘটেছে অত্যন্ত প্রবলভাবে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তিনি প্রধানত কংগ্রেসকে দায়ী করেন। মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে (১৯৩৮) তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন ঃ

> The congress has now, you must be aware, killed every hope of Hindu-Muslim settlement in the right royal fashion of Fascism.[১৩]
>
> (অর্থাৎ, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিষ্পত্তির সকল আশাই মোক্ষম রাজকীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় হত্যা করেছে।)

১৯৩৭-৩৮ সনে ভারতের সংবিধান সম্পর্কে মুসলিম লীগ যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে

---

১৩ Saiyid : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

www.pathagar.com

ভারতে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠন করা হোক এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধানে মুসলমান সম্প্রদায়সহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ পুরোপুরিভাবে ও কার্যকরভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। এ সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। জিন্নাহ্ কঠোর ভাষায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, এজন্য তিনি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে দায়ী করেন। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসনামলে মুসলমান সম্প্রদায় যে 'জুলুম, উৎপীড়ন ও অবিচার' সহ্য করেছে তার অবসান ঘটাতে জিন্নাহ্ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 'নাজাত দিবস' (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯) পালনের জন্য আহ্বান করেন। উপমহাদেশের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে জিন্নাহ্র আহ্বানে সাড়া দেয়। ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হয় তা চরমাকার ধারণ করে ত্রিশ-এর দশকের শেষ পাদে। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে জিন্নাহ্ মুসলিম লীগকে উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করেন এবং সেসঙ্গে একথাও ঘোষণা করেন যে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় একটি স্বতন্ত্র জাতি। জিন্নাহ্ এক সময় কংগ্রেসের কৃপা লাভ করেছিলেন এবং নিজেকে মনে করেছিলেন অসহায়। কিন্তু ত্রিশ-এর দশকের শেষভাগে তিনি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলিম লীগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষ পর্যন্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাধীন আবাসভূমির যে দাবি উঠেছিল তাকে প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহ্র রাজনীতির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস

১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে জিন্নাহ্ পাকিস্তান দাবি করেছিলেন সত্য, তবুও অখণ্ড ভারত মহাদেশের কাঠামোতে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সমবায়ে ফেডারেল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা ত্যাগ করেন নি। সম্ভবত এ কারণে ১৯৪৬-এর **কেবিনেট মিশন প্ল্যান** তিনি মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৪৬-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে একটি মন্ত্রী মিশন ভারতে প্রেরণ করে। এই কেবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন ভারতবিষয়ক মন্ত্রী লর্ড প্যাথিক লরেন্স, বোর্ড অব ট্রেড-এর সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স এবং এডমিরালটির ফার্স্ট লর্ড এ.ভি. আলেকজান্ডার। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকের পর কেবিনেট মিশন কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার গঠন এবং প্রদেশসমূহকে 'এ', 'বি' ও 'সি' এই তিনটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মেনে নেয়। হিন্দুপ্রধান

www.pathagar.com

প্রদেশগুলিকে 'এ' গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং 'বি' ও 'সি' গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যথাক্রমে মুসলিমপ্রধান প্রদেশসমূহকে এবং বাংলা ও আসামকে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত কেবিনেট মিশন প্ল্যানকে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বাগত জানায়। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা ক্রমে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সম্ভাবনাও অচিরে দূরীভূত হলো। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে (১০ জুলাই, ১৯৪৬) সহসা ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করবে এবং প্রয়োজনবোধে কেবিনেট মিশন প্ল্যানের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করবে।[১৪] কংগ্রেস সভাপতির উক্তি স্বাভাবিকভাবেই জিন্নাহ্‌কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাঁর মনে হলো, নেহরুর উক্তি চুক্তিভঙ্গের শামিল। স্বাধীনতা লাভের পরও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একই রকম আচরণ করতে পারে এরূপ আশঙ্কা তাঁর মনে ঘনীভূত হতে থাকে। তিনি বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে (২৭ জুলাই, ১৯৪৬) তাঁর আশঙ্কা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণের পর মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা নাকচ করে দেয় এবং পাকিস্তান দাবির বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে এবং শোচনীয় হয়ে উঠল যখন ইংরেজ সরকার জিন্নাহ্‌কে অগ্রাহ্য করে পণ্ডিত জওহরলালকে কেন্দ্রীয় অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানায়। জিন্নাহ্ ইংরেজ সরকারের এই পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপের নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, একই সঙ্গে ১৬ আগস্টকে (১৯৪৬) **ডাইরেক্ট এ্যাকশন** ডে বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস বা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। অবশ্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অসংখ্য প্রাণহানির মধ্য দিয়ে। এই ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ভারতবিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, যায় পরিণতিতে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

দ্বিজাতিতত্ত্ব

১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ জিন্নাহ্ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে দুটি স্বতন্ত্র জাতি বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা[১৫] ঃ "ইসলাম ও হিন্দুধর্মের

---

১৪ Maulana Abul Kalam Azad : *India Wins Freedom*, (Calcutta, 1957), p. 155

১৫ Jamiluddin Ahmed (ed.) : *Some Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah*, 5th ed. Vol. I (Lahore, 1951), pp. 173-74

www.pathagar.com

মধ্যে কোথাও মিল নেই, উভয়ের সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিন্ন জাতিসত্তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। আমরা এক জাতি এই ভুল ধারণা আমাদের অধিকাংশ সমস্যার মূল কারণ। হিন্দু ও মুসলমানদের জীবনদর্শন, তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও সাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। একে অপরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না, তারা একত্রে আহার করে না। কেবল তাই নয়, তাদের সভ্যতা পরস্পরবিরোধী ধারণা ও মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও স্বতন্ত্র। তারা ইতিহাসের যেসব সূত্র থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তা-ও ভিন্ন। তাদের মহাকাব্য ও কাহিনী আলাদা। অনেক সময় দেখা যায়, এক সম্প্রদায়ের চোখে যে ব্যক্তি মহান, অপরের চোখে সে দুশমন। তেমনিভাবে একের জয়পরাজয়কে অপরে তার বিপরীত মনে করে। জনসংখ্যার দিক থেকে একটি জাতি সংখ্যাগুরু এবং অপরটি সংখ্যালঘু — এরকম দুটি জাতিকে, যদি এক রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে যেভাবে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হবে তার ফলে এরূপ রাষ্ট্রের সরকারকাঠামো অনিবার্যভাবে ধসে পড়বে।"

জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) পাকিস্তান প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন। এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের সমবায়ে স্বায়ত্তশাসিত **রাষ্ট্রসমূহ** প্রতিষ্ঠার দাবিই ছিল প্রধান।

জিন্নাহ্‌র অনমনীয় নীতিগত অবস্থান

লাহোর অধিবেশনের (১৯৪০ সন) পরবর্তীকালে জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলিম মিলনের আদর্শ ত্যাগ করে রাজনীতিক্ষেত্রে যে নতুন অবস্থান গ্রহণ করেন তা থেকে তিনি আর সরে দাঁড়ান নি। এক সময় তিনি কংগ্রেসের নিকট কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য শুধু এক-তৃতীয়াংশ আসন বা সদস্যপদ দাবি করেছিলেন, কিন্তু সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তারপর সতেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই নাতিদীর্ঘ সময়ের পরিসরে জিন্নাহ্ তাঁর অবস্থান এত শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ১৯৪৫-এর সিমলা সম্মেলনে স্বয়ং ভাইসরয় যখন তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে প্যারিটির ভিত্তিতে সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধি গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন জিন্নাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নন এমন কোন মুসলমান উক্ত কাউন্সিলের সদস্য হতে পারেন না বলে তিনি দাবি করেন। এক সময় মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কংগ্রেস আপত্তি করেছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ঘটানাচক্রেই হোক বা জিন্নাহ্‌র অসাধারণ নেতৃত্বের জন্যই হোক, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। এমন কি স্বয়ং গান্ধী যখন জিন্নাহ্‌কে স্বাধীন অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব দানের

www.pathagar.com

প্রস্তাব করেন জিন্নাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন। জিন্নাহ্ বুঝেছিলেন যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপরীত মেরুমুখী ধারাকে আর এক খাতে প্রবাহিত করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সন থেকেই ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যের চাবিকাঠি জিন্নাহ্র মুঠোয় ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছিল ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। এক অর্থে বলা যায়, জিন্নাহ্ তাঁর নীতি ও দাবিতে অটল ছিলেন বলে ভারত বিভক্ত হয়েছিল।

জিন্নাহ্র রাষ্ট্র-পরিকল্পনা

জিন্নাহ্ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ তাদের ন্যায্য অধিকার পালনে সক্ষম হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে শুধু আদর্শ সংসদীয় গণতন্ত্রেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি ছিলেন নিয়মতন্ত্র ও আইনের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের আধিপত্যকে তিনি সুনজরে দেখেন নি। বিশেষত তিনি জনবিচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাষণ থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন ঃ "জনসাধারণকে বুঝতে দিন যে আপনারা তাদের সেবক ও বন্ধু। আপনারা কর্মজীবনে আত্মমর্যাদা, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার ও সদাচারের সর্বোচ্চ মান সমুন্নত রাখুন।"

জিন্নাহ্ শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভব করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জনসাধারণ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলে রাষ্ট্রের অগ্রগতি ঘটতে পারে না। তিনি সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে উৎসাহী ছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারের সাথে তিনি শিল্পোন্নতির গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। সমাজবাদ তাঁকে তেমন আকৃষ্ট করে নি, কাজেই শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথাও তিনি চিন্তা করেন নি। বরং বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিক উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে তিনি শুধু অস্ত্র-উৎপাদন, জলবিদ্যুৎ, রেলওয়ে ওয়াগন নির্মাণ, টেলিফোন, ডাক ও তারব্যবস্থা এবং বেতার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি উৎপাদন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

উপসংহার

প্রশ্ন উঠতে পারে যে জিন্নাহ্ ব্যক্তিগতভাবে ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না — অন্তত তাঁর দৈনন্দিন জীবনাচরণ তেমন সাক্ষ্য বহন করে না, তথাপি তিনি কেন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এর উত্তরে বলা যায় যে, অবিভক্ত

www.pathagar.com

ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগবঞ্চিত ছিল বলে জিন্নাহ্ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর পথে অন্তরায় ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার। জিন্নাহ্ উপলব্ধি করেন যে উভয়ের মোকাবেলা করতে হলে এমন এক রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক যার সাহায্যে অতি সহজেই তিনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হবেন। কাজেই দ্বিজাতিতত্ত্বকে তিনি রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেন। এই কৌশলটি তিনি এমন নিপুণভাবে ব্যবহার করেন যার ফলে উপমহাদেশের আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠী নির্দ্বিধায় তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। উল্লেখ্য যে জিন্নাহ্ ধর্মকে অবলম্বন করে রাজনীতি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়তবাদী ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তিনি যখন ঘোষণা করেন যে, "এখন থেকে রাজনৈতিক অর্থে মুসলমান মুসলমান থাকবে না এবং হিন্দু হিন্দু থাকবে না।"

ভারতবিভাগ বা পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে জিন্নাহ্ একা ছিলেন না। তাঁকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের নেতৃবর্গও সহায়তা করেছেন। প্রবীণ কংগ্রেসনেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষ্যও একথার প্রমাণ বহন করে। তাঁর রাজনৈতিক রচনা *India Wins Freedom*-এর ত্রিশটি পৃষ্ঠা সংবলিত একটি অংশ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সুস্পষ্ট। তৎকালীন কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন ; কাজেই তখনকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে যে-কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো ঃ ভারতবিভাগের জন্য শুধু জিন্নাহ্কে দায়ী করলে ভুল হবে, এজন্য দায়ী বল্লভভাই প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গও। তাঁর মতে পাকিস্তানের সপক্ষে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মনোভাবও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেসী সদস্যগণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। মওলানা আজাদের গ্রন্থ থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অনুবাদিত উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো ঃ

> লর্ড মাউন্টব্যাটেন দৃশ্যে আবির্ভূত হবার বহু পূর্বেই সরদার প্যাটেল পঞ্চাশ ভাগই পাকিস্তানের সপক্ষে ছিলেন।[১৬]
>
> কথা বলা অসঙ্গত হবেনা যে বল্লভভাই প্যাটেলই ছিলেন ভারতবিভাগের মূল স্থপতি।[১৭]

---

১৬ Abul Kalam Azad : *India Wins Freedom*, (Complete version), Madras, 1988, পৃ. ১৯৭, অনূদিত

১৭ ঐ, পৃ. ১৯৮, অনূদিত

www.pathagar.com

> প্যাটেল এখন জিন্নাহ্‌র চেয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের বড়ো সমর্থক।[১৮]
>
> জিন্নাহ্ হয়তো পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, কিন্তু ওই পাতাকার প্রকৃত বাহক ছিলেন সরদার প্যাটেল।[১৯]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এ থেকে তখনকার কতিপয় কংগ্রেস নেতার আসল ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। মওলানা আজাদ সখেদে বলেন, আমি মারাত্মক ভুল করেছিলাম আমার পরে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে জওহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাব করে। এ ভুল না করলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হতো।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো, জন্ম হলো স্বাধীন পাকিস্তানের। কিন্তু এই তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের দুটি অংশকে এক রাষ্ট্রের অধীনে বেঁধে রাখতে পারে নি। এর প্রধান কারণ, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনকারী এলিট বাঙালীদের তুলনায় নিজদেরকে শ্রেষ্ঠতর জাতি মনে করত এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ব্যাপারে বাঙালীদের অংশগ্রহণের অধিকার অগ্রাহ্য করে আসছিল। তাছাড়া অনেকে মনে করেন, জিন্নাহ্ অনেকটা একনায়কের ন্যায় পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও একনায়কসুলভ মনোভাব পরিহার করেন নি। সম্ভবত এ কারণে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর হিসাবে মারাত্মক ভুল হয়েছিল এখানেই। এরই সূত্রে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল।

জিন্নাহ্‌র সকল পদক্ষেপকে প্রকৃত অর্থে নিয়মতান্ত্রিক বলা যায় না সত্য, এমন কি তিনি কখনো কখনো একনায়কী মনোভাবও প্রদর্শন করেছেন, এ সত্ত্বেও নিয়মতন্ত্রের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল এ-কথা বলা চলে না। বিভিন্ন অধিবেশনে-সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি থেকেই বুঝা যায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কিরূপ আস্থাশীল ছিলেন। তাঁকে এক সময় 'ভারতের সাইমন' বলা হতো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি মাত্র এক বছর রোগাক্রান্ত অবস্থায় জীবিত ছিলেন। এই স্বল্প সময়ে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনার সময় তিনি পান নি। সম্ভবত এ কারণেই পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই সামরিক আমলাতান্ত্রিক শাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পায় নি। তবু এ-কথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে পাকিস্তানবাসীদের কাছে কায়েদে আজম জিন্নাহ্ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

---

১৮ ঐ, পৃ. ২০১, অনূদিত

১৯ ঐ, পৃ. ২০১, অনূদিত

www.pathagar.com

স্বাধীনতার রাজনীতি

১৯

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
(১৮৯০--১৯৬৪)

স্বনামধন্য আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর একমাত্র সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৮৯০ সনের ১৪ নবেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। বংশগত সূত্রে নেহরু পরিবারটি ছিল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। জওহরলাল ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন। বাল্যকালে ইংরেজ গবর্নেস এবং কৈশোরে ইংরেজ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেছেন। পুত্রের মেধা এবং অদম্য জ্ঞানপিপাসার পরিচয় পেয়ে পিতা মতিলাল তাঁকে প্রথমে ইংলন্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুল হ্যারো-তে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর জওহরলাল ইনার টেম্পলে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯১২ সনে বার-এট-ল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুকাল লাহোর হাইকোর্টে প্রাকটিস করেন। কিন্তু আইনজীবীর পেশা অপেক্ষা রাজনৈতিক জীবন তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। পিতা মতিলাল নেহরুর রাজনীতিক কর্মকাণ্ডও তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মতিলাল নেহরু শুধু উত্তর ভারতের প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন না, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসাবেও গোটা উপমহাদেশে সুপরিচিত ছিলেন।

রাজনীতিক প্রবাহে জওহরলাল

১৯১৯ সনে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল করার লক্ষ্যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন গঠন করে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড যেসব শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট তা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। এ সময় মতিলাল নেহরুও মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতার সূত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে একযোগে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ভারতের শাসনব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে যখন সাইমন

www.pathagar.com

কমিশন (১৯২৮) ভারতে আসে তখন মতিলাল নেহরু এবং অন্যান্য নেতা — স্যার আলী ইমাম, শোয়েব কোরেশী, তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকর, মঙ্গল সিং, এন. এম. যোশী প্রমুখ — উক্ত কমিশনের কাছে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠন করা হয় মতিলাল নেহরু ছিলেন তার সভাপতি এবং জওহরলাল নেহরু সম্পাদক। পিতা-পুত্র উভয়কে নেহরু রিপোর্টের (১৯২৮) প্রধান রচয়িতা বলা যায়। রিপোর্টে যেসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা হলো ঃ অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, সংসদীয় সরকার, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনের বিষয়সমূহ বণ্টন, ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের সীমানা পুনর্বিন্যাস এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি। নেহরু রিপোর্ট-এর প্রস্তাবসমূহ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে মতিলাল ও জওহরলাল উভয়ে প্রাচ্য গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মতিলাল নেহরু দু'বার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি স্বরাজ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেজন্য তাঁকে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। ১৯৩১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় যাঁরা অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী সর্বাগ্রগণ্য। এছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, তেজবাহাদুর সপ্রু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনীষীর চিন্তাধারাও তাঁকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। অনস্বীকার্য যে অনেক ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীর মত ও পথ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি আজীবন গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ অটুট রেখেছিলেন। জওহরলাল শুধু রাজনীতিবিদ ছিলেন না, মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনেও তিনি গভীর জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীই তার প্রমাণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো ঃ *India and the World, The Unity of India, Autobiography, Glimpses of World History, Discovery of India, Soviet Russia, Independence and After* ইত্যাদি।

জওহারলাল নেহরুর রাজনীতিক মতাদর্শ মূলত গড়ে ওঠে প্রাচ্য দর্শন ও ইংলন্ডের উদার গণতান্ত্রিক ভাবধারার পটভূমিতে। তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন ঃ

> Personally I owe too much to England in my mental make-up ever to feel wholly alien to her.[১]

---

১ Jawaharlal Nehru : *Autobiography*, p. 419

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে জওহরলাল **হোমরুল লীগ**-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯১৮ সনে তিনি এলাহাবাদে **হোমরুল লীগ**-এর সম্পাদক হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের স্বরাজ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাঁর বিবেককে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। ভারতে যতদিন বিদেশী শাসন বিদ্যমান থাকবে ততদিন কোন ভারতবাসীর পক্ষে সসম্মানে বেঁচে থাকা দায় — এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০ সন) যোগদান করেন। ১৯২৯ সনে তিনি প্রথমে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। তিনি মোট চার বার কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৪৬ ও ১৯৫১-৫৪) হয়েছিলেন। তিরিশ-এর দশকের অধিকাংশ সময় তাঁকে আইন অমান্য আন্দোলনের দায়ে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কারাবন্দী অবস্থায় তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মে যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে না, শুধু কার্যকর শক্তি ও প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ দ্বারা তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। এই মনোভাব তিনি আত্মজীবনীতেও ব্যক্ত করেন।[২] ১৯৪২-৪৫ সনেও তিনি কারাবাসে ছিলেন। বন্দীদশায় তিনি মার্কসীয় দর্শনের উপর প্রচুর পড়াশুনা করেন। মার্কস-এর রচনাবলী থেকে তিনি সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। সে সময় তিনি এই আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেন যে কোন দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। ১৯৪৬ সনে তিনি ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে যোগদান করেন। পরবর্তী বছর (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭) ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে জওহরলাল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ভারত সরকারের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন সত্য, কিন্তু এই সময়ের পরিসরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিনা বলা কঠিন। বরং দেখা গেছে যে তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা

জওহরলাল নেহরু তৎকালীন ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তবে এই সমস্যাটি তিনি দেখেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। তাঁর মতে, হিন্দু ও মুসলিম কৃষ্টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং এটা দেখা যায় উভয়ের কৃষ্টি এবং আধুনিক সভ্যতার মধ্যে। তবে হিন্দু বা মুসলিম কৃষ্টি যতই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক কৃষ্টির বিরোধিতা করুক না কেন তা শেষ পর্যন্ত শোচনীয় পরিণতি লাভ করতে

২ ঐ, পৃ. ৫৫৪

www.pathagar.com

বাধ্য।[৩] ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন লোকায়তবাদী, সাধারণ অর্থে নাস্তিক। এ কারণে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন নি। তিনি যখন পিতার সঙ্গে একযোগে নেহরু রিপোর্ট প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত তখনো তিনি হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। এ কারণে উক্ত রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি ছিল মোটামুটিভাবে সর্বজনীন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নেহরু রিপোর্টে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলিম লীগের দাবির স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। তার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে জওহারলাল মনে করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্য দায়ী প্রধানত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম নেতাগণ ; তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে আইনসভার আসনসংখ্যা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির প্রশ্নে একে অপরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এদের কোন যোগাযোগ নেই।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র

পণ্ডিত নেহরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী। তিনি বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থ অপেক্ষা সাধারণ মানুষের স্বার্থ বা কন্যাণচিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তা বলে তিনি ব্যক্তিকে সমাজ বা রাষ্ট্রের উপরে স্থান দেন নি। এরিস্টটলের ন্যায় তিনিও মানুষকে দেখেছেন সমাজবাসী জীব হিসেবে। সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তির যেমন কিছু কিছু অধিকার আছে, তেমনি আবার সমাজের প্রতি ব্যক্তিরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের কোন মূল্য থাকে না। প্রসঙ্গত তিনি রাষ্ট্রের আদিরূপ ও বিবর্তনধারা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, আদি পর্যায়ে রাষ্ট্রচরিত্র ছিল অত্যন্ত সরল ; তখন রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ ছিল রাষ্ট্রান্তর্গত ব্যক্তিকে বৈদেশিক শত্রু বা অন্য কোন গোত্রের হামলা থেকে রক্ষা করা। এই অবস্থা থেকে জন্ম হয়েছে পুলিশ-রাষ্ট্রের। এই রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে, নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করেছে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য করারোপের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেছে। আধুনিক কালে ব্যক্তির কল্যাণার্থে রাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বেশি কাজ করবে এটাই কাম্য। কাজেই আধুনিক রাষ্ট্রের সামাজিক দায়িত্ব এবং সমাজকল্যাণমূলক বা ব্যক্তিকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধিও ব্যাপকতর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে "রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে যদি সঠিকভাবে সমন্বয় বিধান করা যায় এবং উভয়কে সুসংগঠিত করা যায় তাহলে কোন প্রকার সংঘাত দেখা দেবে না।"[৪] এরূপ অবস্থায়, তার কথায়, — "the right and the obligations march together."

---

৩ B. R. Nanda : *The Nehrus : Motilal and Jawaharlal* ; (London, 1965) p. 150

৪. Appadorai : *Documents on Political Thought in Modern India* ; (Bombay, 1976) p. 48

www.pathagar.com

পণ্ডিত নেহরু রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, রাষ্ট্র ব্যক্তিকে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কবল থেকে রক্ষা করবে ; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নাগরিকদের উন্নতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি মনে করেন, আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের পরিধি যেহেতু পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সে কারণে বর্তমানে সরকারের অধিক মাত্রায় ক্ষমতা কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কালের প্রধান সমস্যা এটাই। তিনি বলেন ঃ

> আমাদের পক্ষে এখন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের — তা রাষ্ট্রের হোক বা বিরাট সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়নের হোক অথবা কোন গোষ্ঠীর হোক — নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সর্বপ্রকার কেন্দ্রিকরণ ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করে। আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই সত্য, কিন্তু একই সঙ্গে আধুনিক সমাজের কেন্দ্রায়ণ প্রবণতার কবল থেকে মুক্ত হতে পারছি না।[৫]

বর্তমানে মানবকুলের জীবনধারা যেরূপ প্রচণ্ড গতিতে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে পণ্ডিত নেহরু সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে এই পরিবর্তন আরো ব্যাপকতর হবে যদি না তার আগে আণবিক যুদ্ধ মানবসভ্যতা ধ্বংস করে দেয়। বর্তমান কালে মানুষ তার বোধশক্তির সাহায্যে যেরূপ দ্রুত প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করছে এবং প্রাকৃতিক জগতের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে তার চেয়ে লক্ষ্যযোগ্য আর কিছু নেই। মানুষ এখন আর বাহ্যিক অবস্থার অসহায় শিকার নয়। তবে নেহরুর ক্ষোভ এই যে মানুষ বাহ্যিক অবস্থাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছে বটে, কিন্তু অপর দিকে তার নৈতিক মনোবল ও আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। বর্তমানে এক-এক দেশে গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস করার জন্য মারাত্মক ধরনের মারণাস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে — এখানেই আধুনিক সভ্যতার বিরাট অসঙ্গতি। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে কল্পনাতীতভাবে, কিন্তু সেসঙ্গে এমন সব জটিল সমস্যার জন্ম হয়েছে তা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছি না — সমাধান নির্দেশ করাতো দূরের কথা।[৬] এক দিকে বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু অপরদিকে মানবসত্তার আত্মিক শক্তি ক্রমান্বয়ে নিঃশেষিত হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ

> প্রাচীন কালে মানবজীবন ছিল সহজ, সরল ; তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠতর। আধুনিক কালে মানবজীবন ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে, মানুষ নিরন্তর ছুটে বেড়াচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, একটু চিন্তাভাবনার বা এমন কি প্রশ্ন করার সময়ও তার

---

৫ ঐ, পৃ. ৪৯, অনূদিত

৬. Appadorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

www.pathagar.com

নেই। এজন্য দায়ী আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শক্তি ও শ্রম বিপুল পরিমাণে উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে এবং একে ব্যবহার করা হচ্ছে অন্যায় পথে। বর্তমানের পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষ যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে তার জীবনধারার সুসঙ্গতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তা হলেই সমস্যা দেখা দেবে।[৭]

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে প্রাচীন সভ্যতার অনেক গুণ ছিল, কিন্তু সব দিক থেকে তা পরিণত ছিল না। প্রাচীন সভ্যতার পতনের পর প্রাচ্য সভ্যতার জন্ম। "প্রাচ্য সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছে, গৌরবও অর্জন করেছে ; কিন্তু সে সভ্যতাকে পরিণত সভ্যতা বলা চলে না। তার মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই ত্রুটি ছিল।"[৮] তাঁর মতে মানবসভ্যতার বিবর্তনধারার বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। ধর্ম মানবমনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করেছে সত্য, কিন্তু আবার কুসংস্কার ও সামাজিক কুপ্রথারও জন্ম দিয়েছে যার ফলে ধর্মের প্রকৃত আদর্শ অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত হয়েছে।

সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র

পণ্ডিত নেহরু মনে করেন যে ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে মানুষ ধর্মের পথ ছেড়ে সাম্যবাদের আশ্রয় নিয়েছে। অনেকেই সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করেছে ; কারণ সাম্যবাদও এক ধরনের বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সাম্যবাদও আংশিকভবে ব্যর্থ হয়েছে এর কঠোরতার জন্য এবং মানবপ্রকৃতির কতগুলো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে এর অনীহার কারণে। পণ্ডিত নেহরু সাম্যবাদের কতগুলি অবগুণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি সাম্যবাদী পদ্ধতিকে সরাসরিভাবে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও সভ্যতাবিরুদ্ধ বলে উল্লেখ করেন ; কারণ সাম্যবাদ প্রথমত, ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে ; দ্বিতীয়ত, মানবজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকটি উপেক্ষা করে ; তৃতীয়ত, সন্ত্রাসী পন্থাকে প্রাধান্য দেয়। মোদ্দা কথা, সাম্যবাদ গণতান্ত্রিক পন্থায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভবে অগ্রাহ্য করে। এমন কি সাম্যবাদের ভাষা সন্ত্রাসের ভাষা, এর চিন্তাও সন্ত্রাসী। চতুর্থত, এর প্রধান নীতি হচ্ছে বলপ্রয়োগ, ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নকরণ।

পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করেন যে "কিছু সংখ্যক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মানবকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে সত্য, তবে এসব রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির সুরাহা হয় নি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি বলতে কিছু নেই। এ কথা ঠিক যে পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র যুক্ত হওয়ার ফলে পুঁজিবাদের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি অনেকটা

৭. ঐ, পৃ. ৫২, অনূদিত
৮. ঐ, পৃ. ৫২

www.pathagar.com

হ্রাস পেয়েছে। এ কারণে বর্তমান কালের পুঁজিবাদী-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে দু-এক যুগ আগেকার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের তেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া শিল্পোন্নত সমাজে ঊর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটেছে এবং তার সুফল মোটামুটিভাবে সকল শ্রেণী ভোগ করছে। এ কথা অবশ্য অনুন্নত দেশের বেলায় প্রযোজ্য নয়। পুঁজিবাদী শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা না হলে ধনী আরো ধনী হবে এবং গরীব হবে আরো গরীব। বর্তমানে অবশ্য পুঁজিবাদী শক্তি মাত্রেই স্বকীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ন রেখেও কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।"[৯]

চিন্তাধারার দিক থেকে পণ্ডিত নেহরু ছিলেন প্রধানত সমাজবাদী। সম্ভবত কার্ল মার্কস্-এর সমাজবাদী মতবাদ তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমাজবাদকে তিনি শুধু জীবনপদ্ধতিরূপে দেখেন নি, তিনি একে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বৈজ্ঞানিক সমাধান হিসাবেও দেখেছেন। তাঁর ধারণা, যদি কোন অনগ্রসর ও অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে ওই দেশ সহসা উন্নত হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। প্রকৃতপক্ষে ওই দেশের সমাজতন্ত্র হবে 'অনুন্নত ও দারিদ্র্যপীড়িত সমাজতন্ত্র'। পণ্ডিত নেহরুর মতে সাম্যবাদের অনেক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য মানুষের সমাজবাদী ধারণাকে বিকৃত করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের অর্থ অনিবার্য সন্ত্রাস নয় ; এর অর্থ সমাজের সাধারণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিগত জীবনের উপর উৎপাদন-শক্তির নিয়ন্ত্রণ। উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সাথে সাথে মানবগোষ্ঠীর জীবন ও চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ সম্পূর্ণরূপে পরস্পর-বিরোধী। "সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিসমূহকে প্রতিহত করে, এবং সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে সমাজের স্থিতাবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়।"

পণ্ডিত নেহরুর সমাজবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে ইংলন্ডের ফেবিয়ান সমাজবাদের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র এমন কোন যাদুবলে কায়েম করা যায় না যার প্রভাবে দেশ থেকে দারিদ্র্য সহসা ঘুচে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পদশালী হয়ে উঠবে। দেশের উন্নতির একমাত্র পথ কঠিন পরিশ্রম, উৎপাদনব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন। যে দেশ অনুন্নত সেখানে পুঁজিবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন লাভ হবে না ; একমাত্র সমাজবাদী ধারা অনুযায়ী সুপরিকল্পিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলেই দেশ দৃঢ়ভাবে উন্নতি লাভ করবে। তবে উন্নতি লাভ করতে সময় লাগে। সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হলো প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে অযথা সম্পদ নষ্ট হবে। অতএব একদিকে যেমন ভূমিসংস্কারের

৯. Appadorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

www.pathagar.com

প্রয়োজন আছে, অপরদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু স্বনির্ভর গ্রামের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন যে স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থা ও বিকেন্দ্রিকরণ এক কথা নয়। "বিকেন্দ্রিকরণ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, তবে এর ফলে যদি প্রাচীন কালের উৎপাদনপদ্ধতিতে ফিরে যেতে হয় তাহলে তার অর্থ হবে, আমরা আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতি যা বহু পশ্চিমী রাষ্ট্রের বিপুল বস্তুগত উন্নতির সহায়ক হয়েছে তা ব্যবহার করব না।"[১০] অতএব তাঁর মতে গরীবী হটাতে হলে আধুনিক শক্তির উৎসসমূহকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

গণতন্ত্রচিন্তা

গণতন্ত্র সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর ধারণা সনাতন ভাবধারা থেকে অনকেটা ভিন্ন। তাঁর মতে গণতন্ত্র বলতে শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র বুঝায় না। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি করে ভোট থাকে মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অভুক্ত তার কাছে একটা ভোটের কোন মূল্য নেই। সুতরাং রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে যথেষ্ট বলা চলে না। বরং ক্রমান্বয়ে ও ক্রমবর্ধমান মাত্রায় একে ব্যবহার করতে হবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে। জীবনের যা কিছু উত্তম তা অরো বেশি সংখ্যক জনগণের আয়ত্তে অনতে হবে এবং তাদের মধ্যে যে বিরাট অসাম্য বিরাজ করছে তা দূর করতে হবে। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি এর প্রতি আস্থাশীল প্রধানত এই কারণে যে গণতন্ত্রই লক্ষ্য অর্জনের ন্যায়সম্মত মাধ্যম। অন্যান্য শাসনব্যবস্থা ব্যক্তির উপর যে চাপ সৃষ্টি করে গণতন্ত্র তা অপসারিত করে। গণতন্ত্র শৃঙ্খলাকে আত্মশৃঙ্খলায় রূপান্তরিত করে। গণতন্ত্রের অর্থ শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমস্যা সমাধানের প্রয়াস। আমাদের সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের চরিত্র, চিন্তা ও লক্ষ্যসমূহ প্রতিভাসিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের চিন্তাচেতনা ও প্রকৃতির সঙ্গে যত সঙ্গতিপূর্ণ হবে ততই শক্তিশালী ও স্থায়ী হবে। সঙ্গতির অভাব থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলির পতন অনিবার্য।"[১১]

পণ্ডিত নেহরু পরমতসহিষ্ণুতাকে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ মনে করেন। তাঁর মতে কোন মতাদর্শ অন্যের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। এ ধরনের প্রয়াস চালানো হলে অনিবার্যভাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মারাত্মক রকমের ধ্বংসলীলা শুরু হবে। "এ হেন পরিস্থিতিতে কেউ বিজয়ী হয় না, বরং সকলেরই পরাজয় ঘটে।" আসল কথা, সন্ত্রাসী পন্থায় সমস্যার সমাধান করা যায় না। এটা সম্ভব নৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

---

১০ Appodorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

১১ *Jawaharlal Nehru's Speeches*, Vol III, 1953-57 : (Government of India, 1970), pp. 138-144

www.pathagar.com

পণ্ডিত নেহরুর ভাবধারায় ব্যক্তিবাদী আদর্শের সুরটিও স্পষ্ট। সম্ভবত জে. এস. মিল-এর ব্যক্তিবাদ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। ব্যক্তির লাঞ্ছনাকে তিনি দেখেছেন ঘৃণার দৃষ্টিতে। তাঁর মতে ব্যক্তি যখন আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে কেবল তখনি সমাজের অগ্রগতি ঘটবে। ব্যক্তির আত্মবিকাশের সূত্রে গোটা সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবর্তে গোটা সমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি যে নতুন মানবসমাজ গড়ার কথা চিন্তা করেছেন সে সমাজে প্রতিযোগিতা বা আগ্রাসনের কোন স্থান নেই। সে সমাজ গড়ে উঠবে সমাজবাসীদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিমূলে। এ ধরনের সমাজে কর্তব্য পালনের উপর জোর দেওয়া হয়, অধিকারের উপর নয়। তা বলে ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃতি পাবে না তা নয় ; তবে আগে আসবে কর্তব্য পালনের কথা এবং পরে অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। নেহরু মনে করেন যে এরূপ সমাজ গড়তে হলে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যক যার ফলে এক নতুন ধরনের মানবসমাজ গড়ে উঠবে।

বিশ্বশান্তি

বিশ্বরাষ্ট্র বা বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত হবে এই ধারণা পণ্ডিত নেহরুর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে বিশ্বসরকার অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া বিশ্বশান্তির আর কোন পথ নেই। "বিশ্বসরকারের একমাত্র বিকল্প গোটা মানবজাতির আত্মহত্যা।" তিনি বলেন, আমরা বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব নাকি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে লিপ্ত থাকব তার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ভাগ্য। নেহরু আশাবাদী ছিলেন বলে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে কিছুটা বিলম্বে হলেও বিশ্বরাষ্ট্র একদিন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর মতে, বিশ্বরাষ্ট্রের অনুকূলে যেদিন জনমত গড়ে উঠবে তখনই এর বাস্তবায়ন-সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হবে।

পণ্ডিত নেহরু মনে করেন, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে বুঝা যায়, বিশ্বের মানুষ বিশ্বসরকার গঠনের পক্ষপাতী। তবে বিশ্বসরকার গঠনের পথে যে মানসিকতা প্রধান অন্তরায় তা দূর করতে হবে। মোট কথা, বিশ্বসরকার গঠন করতে হলে অন্তর থেকে ভয়ভীতি মুছে ফেলতে হবে এবং বিশ্বের সকল মানুষের অন্তরে সহমর্মিতাবোধ, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক কল্যাণচিন্তা জাগ্রত করতে হবে। বর্তমান দুনিয়ার সংকটজনক অবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু যথেষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

and free to meet all situations as they arise"[১৫] পণ্ডিত নেহরুর উক্তি স্বাভাবিকভাবেই কায়েদে আজম জিন্নাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে যার পরিণতিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। কেবিনেট মিশন প্ল্যান সারা ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল পণ্ডিত নেহরুর একনায়কসুলভ উক্তির ফলে তা সহসা থেমে গেল। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম মিলনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। এর অনিবার্য পরিণতিতে দ্বিখণ্ডিত হলো ভারত উপমহাদেশ।

পণ্ডিত নেহরুর প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি দীর্ঘকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন, কিন্তু কখনো জনসাধারণের শ্রদ্ধা হারান নি। এর প্রধান কারণ, তিনি জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি বা ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির প্রশ্রয় দেন নি। তিনি রাজনৈতিক সন্ত্রাস দমন করেছেন কঠোরভাবে। তাছাড়া, তিনি শুধু গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না, স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের বুনিয়াদও মজবুত করে গড়ে তুলেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি জনমত যাচাই করে নিয়েছেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ব্যাপারে তিনি জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিবর্গকে অংশগ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন বলেই তাঁর সরকারের স্থিতিশীলতা কখনো বিঘ্নিত হয় নি। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আধুনিক ভারতের অর্থাৎ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধান স্থপতি। পণ্ডিত নেহরু ভারত-বিভক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ঐক্যবদ্ধ ভারত ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। *Discovery of India*-য় তিনি লিখেছেন ঃ "The unity of India was no longer merely an intellectual conception for me : it was an emotional experience which overpowered me."

---

১৫ Maulana Azad : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

www.pathagar.com

স্বাধিকারের রাজনীতি

২০

এ. কে. ফজলুল হক*
(১৮৭৩-১৯৬২)

পশ্চাদভূমি

বিগত শতকের শেষভাগে য়ুরোপে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটে। তাছাড়া একদিকে ব্যাপক শিল্পায়ন এবং অপরদিকে য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের উপনিবেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার কারণে তৎকালীন পাশ্চাত্য রাজনীতিক চিন্তাধারা নতুন দিকে মোড় নেয়। সনাতন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ দেখালেন ইংলন্ডের উদারবাদী গোষ্ঠী এবং সমাজবাদীগণ। এই উপমহাদেশ যেহেতু ব্রিটেনের শাসনাধীন ছিল স্বাভাবিকভাবেই এসব নতুন ভাবধারা এদেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করে।

এছাড়া এই উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলায়, উনিশ শতকের গোড়া থেকে গণআন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। সূচনাতে এ আন্দোলনের চরিত্র ছিল প্রধানত ধর্মীয়-সামাজিক। মুসলমান সমাজে ধর্মীয় নেতাগণ শুধু ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যই সক্রিয় ছিলেন না, নির্যাতিত কৃষককুলের ভাগ্যোন্নয়নের দিকেও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ১৭৯৩ সনের **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** সনাতন সমাজব্যবস্থার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানে যার ফলে এক নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধারী নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। তারা অন্যায়ভাবে দরিদ্র চাষীদের উপর করারোপ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, দেনার দায়ে তাদের ভিটেমাটি থেকেও উৎখাত করে দিত। মোট কথা, জমিদারের জুলুম-অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়েছিল বাংলার দরিদ্র কৃষক শ্রেণী।[১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলার জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ ছিল কৃষিনির্ভর এবং তাদের অধিকাংশই মুসলমান কৃষক। অপরদিকে অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু। এ কারণে মুসলমান নেতাদের ধর্মীয় আন্দোলনকে মুসলমান কৃষক শ্রেণী তাদের মুক্তির আন্দোলন মনে করত। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার মাটিতে ধর্মীয় আন্দোলন সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

গবর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস যদিও জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** কায়েম করেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার ফল হলো

---

* *A. K. Fazlul Haque : A Political Profile –An Episode of Bengal Politics.* এই শিরোনামে *Asian Affairs* (vol. II July-December, 1980) পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের নিবন্ধের সংক্ষেপিত বাংলা ভাষ্য

১ Mallick : **প্রাগুক্ত**, পৃ. ৯০-৯৩

www.pathagar.com

বিপরীত। এই 'বন্দোবস্তের' ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উচ্চশ্রেণীর মুসলমান ভূস্বামীগণ এবং দরিদ্র কৃষক শ্রেণী। নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার-নির্যাতন চরমে উঠার ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিগত শতকের গোড়ার দিকে ফরায়জি নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। জেমস্ ওয়াইজ বলেন, "হিন্দু জমিদারগণ এই নতুন আন্দোলনের বিস্তারে শঙ্কিত হয়, কারণ এই আন্দোলন কৃষক শ্রেণীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।"[২]

অবস্থা বেগতিক দেখে হিন্দু জমিদারগণ নীলকর সাহেবদের শরাণাপন্ন হয়। ইংরেজ শাসক, নীলকর সাহেব ও হিন্দু জমিদারগণের মিলিত শক্তির মুখে ফরায়জি আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলেও এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি। এই আন্দোলনের সূত্রে দরিদ্র শ্রেণী যে শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করেছিল তার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, মজলুম জনসাধারণ অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তিতুমীরের সংগ্রাম, ১৮৫৭-এর সিপাহীবিপ্লব প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে জনগণের সংগ্রামী ভূমিকার সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিম নেতৃবর্গের সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার গোড়া থেকেই মুসলমানদের অবিশ্বাস করতে থাকে। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, "আমরা উচ্চ বংশীয় মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে ভর্তির সুযোগ দেইনি, কারণ আমাদের ধারণা হয়েছিল যে আমাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের সেনাবাহিনীর বাইরে রাখা আবশ্যক।"[৩]

শিক্ষা ও সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকার বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনামলে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। তার উপর ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি ভাষা হিসাবে প্রবর্তন করে ঔপনিবেশিক সরকার মুসলমানদের বহু যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর চরম আঘাত হানে। অপর দিকে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজদের শিক্ষানীতি মেনে নিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। অর্থাৎ মুসলিম সমাজ যখন ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে ক্রমেই বিপন্নদশায় পতিত হচ্ছিল তখন হিন্দু সমাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছিল উন্নতির দিকে।

১৯০১ সনের শুমারী লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। ওই শুমারিতে দেখা যায় যে বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে

---

২ M. A. Rahim : *Muslim Society and Politics in Bengal, 1757-1947,* (Dhaka, 1978), p. 77, অনূদিত

৩ W. W. Hunter : *Indian Mussalmans ;* (London, 1971), pp. 163-157, অনূদিত

www.pathagar.com

শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬৩.৯, ৬৪.৮ এবং ৫৬ ; অপরদিকে শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৬.৮ ভাগ। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০.৬৪ ভাগ হয়েও ৮২.২ ভাগ সরকারি চাকুরির সুবিধা ভোগ করত। অথচ সারা বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫১ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মাত্র ১০.৩ ভাগ সরকারি চাকুরির সুযোগ পায়।

এই সামাজিক পটভূমিতে এ. কে. ফজলুল হকের জন্ম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় একশো বছর পর অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ সনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ওয়াজেদ আলী ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। পিতার শিক্ষাধীনে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে উনিশ শতকের সূচনা থেকে ইসলামের গৌরব পুনরুদ্ধার ও নির্যাতিত কৃষক শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যেসব আন্দোলন ও বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ইতিহাস তিনি পিতার মুখে শুনেছিলেন।

ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির পরিচয় দেন। উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে তিনি গণিত, পাদর্থবিদ্যা, রসায়ন, ইংরেজি সাহিত্য এবং সবশেষে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তিনি বিজ্ঞান থেকে লাভ করেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনশাস্ত্র থেকে যুক্তিবাদী মননশক্তি ও নিয়মতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ইংরেজি সাহিত্য থেকে গভীর অনুভূতিশীলতা — হয়তোবা আবেগপ্রবণতাও।

গণঘনিষ্ঠ রাজনীতি

বাল্যজীবন থেকে ফজলুল হক ছিলেন জনগণের কাছের মানুষ। তাঁর সমাজঘনিষ্ঠতার কারণে তিনি জননেতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। একদিকে জমিদারের জুলুম ও ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ তাঁর অন্তরে যেমন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশায় তিনি মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এ কারণে নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কারণে তিনি অনেক সময় আন্দোলনাত্মক রাজনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

রাজনীতিক অঙ্গনে তাঁর পদচারণা শুরু হয় ১৯০৬ সন থেকে। সে বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে তিনি যে সাহসিকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদর্শন করেন তাতে ইংরেজ সরকার সম্ভবত কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। বাংলা ও আসামের তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ফজলুল হককে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তরুণ নেতাকে সুকৌশলে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উচ্চ সরকারি চাকুরিতে থেকে জনসেবার অধিক সুযোগ পাবেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি চাকুরি গ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বছর — ১৯০৬ সন থেকে ১৯১২ — তিনি চাকুরি

www.pathagar.com

করেন। এই স্বল্পকালের পরিসরে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা তাঁর সংবেদনশীল অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন তিনি নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মাত্র পাঁচ টাকা দেনার দায়ে সুদখোর মহাজন কিভাবে দরিদ্র কৃষক পরিবারকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে দরিদ্র জনসাধারণ। চাকুরিরত অবস্থায়ও সমাজের এই দুষ্টক্ষত নির্মূল করার জন্য তিনি কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

১৯১২ সন থেকে ফজলুল হকের রাজনীতিক জীবনধারা নতুন দিকে মোড় নেয়। ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং অমুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর আপোষমূলক মনোভাবের কারণে বাংলার মুসলিম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি সরকারি চাকুরি ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে এ সময়ে এ দেশে পাশ্চাত্য উদারবাদী চিন্তার সঙ্গে সমাজবাদী মতাদর্শ পাশাপাশি বিস্তারলাভ করে। ফজলুল হকের চিন্তা-চেতনায় এই দ্বিমুখী ভাবধারার সমন্বয় ঘটে। একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি দেশব্যাপী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এমন কি ঋণভারে জর্জরিত দরিদ্র কৃষকের মুক্তির জন্য তিনি অনেক সময় সরকারি পদের সুযোগ ব্যবহার করেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে জমিদারী ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে রেখে ফজলুল হক রাজনীতিক জীবন আরম্ভ করেন। মানবস্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় তাঁর অবিচল আস্থা ছিল সত্য, তবে তিনি মনে করেন যে বিদ্যমান শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতিরেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সার্থক হতে পারে না। তিনি জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমিসংস্কারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সে সঙ্গে তিনি শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্বও গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজের একটি বিরাট অংশ অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হবে গণতন্ত্রের বিকাশ।

নতুন রাজনৈতিক ধারা

ফজলুল হকের আদর্শ ও রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে মাঝে মাঝে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় বটে, তবে রাজনীতিতে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি বলেন ঃ "নীতির সঙ্গে পদ্ধতিকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। তোমার নীতি হচ্ছে সূর্যের তাপ বা বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা এবং প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন দিকে ছাতা মেলে ধরাই হলো পদ্ধতি।"[৪] ফজলুল হক রাজনীতিতে

৪ K. A. Kamal : *Politicians and Inside Stories*, (Dhaka, 1970), p. 22, অনূদিত

www.pathagar.com

এক নতুন ধারার সূচনা করেন। গতানুগতিক রাজনীতির চরিত্র ছিল তোষণবাদী ও আনুগত্যমূলক। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে তিনি তোষণবাদী ও আনুগত্যবাদী রাজনীতি বর্জন করে আন্দোলনবাদী বা প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এর অর্থ এ নয় যে গণতান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। বঙ্গভঙ্গ যখন বানচাল করে দেওয়া হয় মুসলিম বাংলা তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মুসলমানগণ তখন বাঁচামরার সমস্যার সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হক স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯১৩ সনে বঙ্গীয় আইনসভার নতুন সদস্য হিসেবে বাজেট অধিবেশনে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাতে তাঁর আন্দোলনবাদী ভূমিকা ধরা পড়ে। তিনি ইংরেজ সরকারের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

> আমার মনে হয়, সরকারের পথ থেকে এখন আমাদের অন্যদিকে সরে যাবার সময় এসেছে। এই প্রেসিডেন্সীর দু'কোটি বিশ লক্ষ মুসলমান সরকারের নিকট থেকে যে বিবেচনা প্রত্যাশা করে তা-ও সরকার অর্থহীন মনে করছে সম্ভবত এই কারণে যে মুসলমানগণ এখনো সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি প্রদর্শন করে নি। .....পরিস্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে মুসলমানগণ ক্রমেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের ধারণা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।[৫]

ইংরেজের শক্তি যখন তুঙ্গে তখন এরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা পরম সাহসের পরিচায়ক বটে। আইনসভার সদস্যদের মধ্যে যাঁরা কায়েমী স্বার্থের বাহক ছিলেন তাঁরা এই বক্তৃতা শুনে মনে মনে প্রমাদ গুণতে লাগলেন, এমনকি বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে অস্বস্তি বোধ করলেন। এদের মধ্যে নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব শামসুল হক ও মোশাররফ হোসেনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ফজলুল হক নিয়মতান্ত্রিক এবং প্রতিরোধবাদী এই উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। দরিদ্রের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তিনি আন্দোলন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, নিয়মতান্ত্রিক বা সংসদীয় প্রক্রিয়ায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের দিকেও তাঁর সমান লক্ষ্য ছিল। কায়েমী স্বার্থচক্রের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরই একক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে জনকল্যাণমূলক বিল আইনে পরিণত হয়। এসব আইনের মধ্যে **বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯২৮, বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন, ১৯২৮, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন ১৯৩৯** এবং **মহাজন আইন, ১৯৪০** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যেকোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য। এ কথা উপলব্ধি করে ফজলুল হক ১৯৩৬ সনে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করেন। দলের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যে ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন তাতেও তাঁর

---

৫ Sirajul Islam : *Fazlul Huq speaks in Council 1913-1916*, (Dhaka, 1976), p. 1, অনূদিত

www.pathagar.com

গণমুখী চিন্তা ও লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দফাগুলি হচ্ছে ঃ ক. বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ ; খ. সুদ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন ; গ. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ; ঘ. ঋণসালিশী বোর্ড গঠন ; ঙ. বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।[৬] তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে এই দফাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈপ্লবিক ছিল সন্দেহ নেই।

রাজনীতিতে দ্বিমুখী ধারা

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে ফজলুল হক কায়েমী স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করেন। উপমহাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তাঁর সংঘাতের মূল কারণ এটাই। তখনকার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস-এর নেতৃবৃন্দের শ্রেণীচরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। জমিদার, ভূস্বামী, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা ছিলেন নেতৃত্বের পুরোভাগে। স্বাভাবিক কারণে ফজলুল হকের বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে তাঁরা সুনজরে দেখেন নি। তবে মুসলিম ভারতে মুসলিম লীগ তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল ঃ প্রথমত, এই দলটি ছিল সর্বভারতীয় এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংহতি রক্ষা এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তখনকার বাংলার কায়েমী স্বার্থচক্র ফজলুল হককে তাদের দলে ভিড়াবার জন্য অনেক চেষ্টা-তদবির চালায়। নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ এবং নবাব মোশাররফ হোসেন **ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি** নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং ফজলুল হককে এই দলের সদস্যভুক্ত করার জন্য বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, নবাবদ্বয় যদি তাঁর ১৪-দফা কর্মসূচী মেনে নিতে রাজী থাকেন তাহলে নতুন দলে যোগদান করতে তাঁর আপত্তি থাকবে না।[৭] প্রকৃতপক্ষে এই আঞ্চলিক দল দুটির সংঘাতের ফলে বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে দ্বিমুখী ধারার সূচনা ঘটে। এই ধারা আরো ব্যাপকতর হয় মুসলিম লীগের হস্তক্ষেপের ফলে।

কায়েমী স্বার্থের প্রতি ফজলুল হকের আপোসহীন মনোভাবের কারণে মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে। মুসলিম লীগ তাঁকে নানাভাবে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু ফজলুল হক শির নত করেন নি। তিনি মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও এম. এ. জিন্নাহ ১৯৪১ সনে তাঁকে অন্যায়ভাবে দলচ্যুত করেন। জিন্নাহর নির্দেশ অমান্য করে তিনি ইংরেজ সরকারের **ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলে** যোগদান করেন এই অজুহাতে জিন্নাহ এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। উভয় নেতার মধ্যে সংঘাতের মূল কারণ হয়তো এই যে, জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত

---

৬ Rahim, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৭ Humaira Momen, *Muslim Politics in Bengal* ; (Dhaka, 1972) p. 47

www.pathagar.com

নির্ণয় প্রক্রিয়ায় বাঙালী নেতৃত্বের ইতিবাচক ভূমিকা থাকুক এটা যেমন অবাঙালী নেতৃত্বের পছন্দ ছিল না, অপর পক্ষে বাংলার রাজনীতিতে অবাঙ্গালী নেতৃত্বের হস্তক্ষেপও ফজলুল হকের মনঃপূত ছিল না।[৮]

গণতন্ত্রের প্রবক্তা

বঙ্গীয় আইনসভায় প্রদত্ত বহু ভাষণে ফজলুল হক সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দান করেন ফজলুল হকের প্রদত্ত সজ্ঞার সঙ্গে তার সংগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ফজলুল হক বলেন ঃ

> - - - In a democracy the government of the people by the people must be the government of all the people by all the people, not the government of the people by only a section of the people.[৯]
>
> .... গণতন্ত্রে জনগণ দ্বারা গঠিত জনগণের সরকারকে হতে হবে সকল মানুষ দ্বারা গঠিত সকল মানুষের সরকার। জনগণের একাংশের সরকার জনগণের সরকার হয় না।

তিনি মনে করেন, কেবল অনাবিল সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারে। যে সমাজে আমলাশ্রেণী তাদের দায়িত্বসীমা লঙ্ঘন করে এবং সরকার মানুষের বাকস্বাধীনতা হরণ করে সেখানে গণতন্ত্র অচল। ১৯১৭ সনে সরকার যখন সংবাদপত্রের উপর 'প্রেস-এ্যাক্ট'-এর ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তখন তিনি উপর্যুক্ত মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯১৬ সনে লাখনৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যুক্ত সভায়ও তিনি আমলাতন্ত্রের কবল থেকে গণতন্ত্রের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। তিনি ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে এ আইনবলে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তাতে "আমলাদের পূর্ণক্ষমতা আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেই : অপর পক্ষে মন্ত্রীদের দায়িত্ব আছে, ক্ষমতা নেই।"[১০] তিনি বিশ্বাস করতেন, যে সমাজে গোত্র-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুযোগ পায় সেটিই গণতান্ত্রিক সমাজ। ফজলুল হক সহিংস বা সন্ত্রাসী রাজনীতিকে নিন্দার্হ মনে করেছেন। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণুতার আর্দশ আজীবন সমুন্নত রেখেছিলেন।

ফজলুল হক পশ্চিমী গণতন্ত্রের ধাঁচে এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে এদেশের গণতন্ত্র গড়ে উঠবে এদেশের মাটিতে। য়ুরোপীয় গণতন্ত্র এদেশে আমদানি করা হলে তা আদৌ সফল হবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। ১৯১৯ সনের শাসনসংস্কার

---

৮ লেখকের নিবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২

৯ ঐ, পৃ. ৩৩৪, অনূদিত

১০ A. K. Fazlul Huq : *Bengal Today*, (Barisal, 1944), p. 11

www.pathagar.com

অনুযায়ী যখন এদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তিনি তার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন ঃ

> You can no more expect the representative institutions to flourish in their proper form in India than you can expect hot house flowers to grow in the icy cold of the North.[১১]

কিন্তু এ সত্ত্বেও ফজলুল হক ইংলন্ডের উদারবাদী চিন্তাবিদদের, বিশেষত জে.এস. মিল-এর চিন্তাধারার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মিল-এর ন্যায় তিনিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের জুলুমকে সমর্থন করেন নি। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩১) ভাষণ দানকালে তিনি মিল-এর গ্রন্থ *Representative Government* থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরেন ঃ

> The majority of electors would always have a majority of representatives and minority of the electors would always have a minority of representatives, but man for man they should be fully represented as the majority. Unless they are there is no equal government.[১২]

নির্বাচকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সকল সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি লাভ করবে এবং সংখ্যালঘু অংশ সকল সময় সংখ্যালঘু প্রতিনিধি লাভ করবে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায় পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব লাভ করা উচিত, তা না হলে সাম্যভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবেনা।

অবিভক্ত ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় ছিল বৃহত্তম সংখ্যালঘু শ্রেণী। মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমন কি তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের সপক্ষে দাবি উত্থাপন করেন। যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থায় হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শাসনব্যবস্থায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন হোক তা-ও তিনি চান নি। তিনি বলেন ঃ

> আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি যে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে আমাদের হিন্দু বন্ধুরা পাউন্ডের মধ্যে সতেরো শিলিংই পাবেন। তাতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে আমাদের শুধু দাবি এই যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা যেন অবশিষ্ট তিন শিলিং-এর ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত না হই।[১৩]

---

১১ G. W. Choudhury : *Constitutional Development in Pakistan* ; (Lahore, 1959), p, 149 উদ্ধৃতি

১২ India Round Table Conference Proceedings ; (12th November 1930-19th January, 1931) p.149

১৩ *IRTCP*, ঐ, পৃ. ৪২, অনূদিত

www.pathagar.com

ফজলুল হক এবং অন্যান্য মুসলিম নেতার জোর দাবির মুখে ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সনে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ঘোষণা করে। অন্যান্য নেতার মধ্যে যারা স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষত আগা খান, মওলানা মোহাম্মদ আলী, এম. এ. জিন্নাহ ও স্যার মোহাম্মদ শফীর নাম উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষা আন্দোলন

বর্তমান শতকের শুরুতে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৯০৫ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মোট ৩০২১ জন পরীক্ষার্থী পাশ করে, তাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৮৮ জন। ১৯১১ সনে মোট ৪৩৪১ জন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল মাত্র ২৪০ জন। ১৯১২ সনে কলেজ পর্যায়ে ১৩৪৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল ১০৪৮ জন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার এত নগণ্য থাকায় সরকারি চাকুরিতে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯১২-১৩ সনে মোট ৩৫০ টি চাকুরির শূন্য পদে মাত্র ৫০ জন মুসলমান প্রার্থী নিয়োগলাভ করে। এর অর্থ, মুসলমানগণ বাংলার জনসংখ্যার ৫১ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে চাকুরির মাত্র ১০.৩ ভাগ জুটেছিল।[১৪]

এ অবস্থায় ফজলুল হক বুঝেছিলেন যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হলে একটি শক্তিশালী সুশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি আইনসভায় কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের অধিক সংখ্যায় ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য তিনি অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেন। তাছাড়া মুসলমানদের জন্য শতকরা আশি ভাগ চাকুরি সংরক্ষিত রাখার জন্য তিনি জোর দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

> আমাদের অখণ্ডনীয় অধিকার হিসাবে আমরা আমাদের প্রাপ্য অংশ দাবি করছি এবং বাড়তি যেটুকু দাবি করছি তা বঙ্গভঙ্গ রদ করে আমাদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে।[১৫]

উল্লেখ্য যে ফজলুল হক আন্তরিকভাবে সি. আর দাস ফর্মুলা বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) সমর্থন করেন, কারণ এ-তে মুসলিম সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবিসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।* মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি কখনো আপোষ করেন নি। তিনি মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব যখনি গ্রহণ করেছেন সাথে সাথে শিক্ষার পোর্টফোলিওটিও নিজে

---

১৪ লেখকের নিবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

১৫ *Bengal Legislative Council Proceedings*, April 4, 1913, pp. 579-577, অনূদিত

* 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পর্কে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

ধারণ করেছেন। তিনি জীবনে যেসব স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৯-১৯২২ সনে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রচণ্ড ঢেউ সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে মহাত্মা গান্ধী বিদেশী দ্রব্য, সরকারি খেতাব, আদালত ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একমাত্র ফজলুল হক গান্ধীর শিক্ষা বর্জন প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলমান ছাত্রসমাজ, কারণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তার ফলেই বাংলায় একটি শক্তিশালী শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

ফজলুল হকের শিক্ষাসংস্কার-প্রয়াস সর্বক্ষেত্রে সার্থক হয়েছিল তা নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাট রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর প্রস্তাবিত **মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের** কথা উল্লেখ করা যায়। ফজলুল হক লক্ষ্য করেছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি বঙ্গীয় আইনসভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রস্তাব উত্থাপন (আগস্ট ২০, ১৯৪০) করেন। এই প্রস্তাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বতন্ত্র **মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড** গঠনের কথা বলা হয়। উক্ত বোর্ড নিম্নোক্ত সদস্যদের সমবায়ে গঠনের প্রস্তাব করা হয়ঃ

ক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন চেয়ারম্যান;

খ ৪৯ জন সদস্য (তন্মধ্যে ১৪ জন সরকার মনোনীত);

গ ১৪ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য;

ঘ ৫ জন তফসিলী ও ২ জন য়ুরোপীয় সদস্য।

ফজলুল হক মনে করেছিলেন যে এ ধরনের একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করা হলে মাদ্রাসাসহ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা বিলকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয় রাজনৈতিক রেষারেষি। প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা আসে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে। তাদের যুক্তি, বিলটি পাশ হলে গোটা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি রাজনৈতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াসকে তারা ব্যর্থ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।[১৬] আইনসভার

---

১৬ *The Indian Annual Register*, Calcutta, 1940, Vol. 11. p. 147

www.pathagar.com

সদস্য সন্তোষ কুমার বসু হুমকি দেন যে বিলটি পাশ হলে সারা প্রদেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবে।[১৭] শরৎ বোস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ নেতা বিলটিকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলে প্রচার করেন।

আসল কথা, বিলটি মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ফজলুল হক উত্থাপন করেছিলেন বলেই কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা তার বিরোধিতা করেছিল। তাছাড়া, বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলিম লীগই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটল যখন এম. এ. জিন্নাহর বিনানুমতিতে ফজলুল হক 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলে' যোগদান করেন। জিন্নাহ একতরফাভাবে ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন যার ফলে ফজলুল হক বঙ্গীয় আইনসভায় মুসলিম লীগের সমর্থন হারান। এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হক বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ সময়ে মুসলিম বাংলায় ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে যুক্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের পর মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের ব্যাপারে তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। এজন্য মুসলিম লীগ মহল থেকে তাঁকে ক্ষমতালোলুপ ও হিন্দুদের বন্ধু বলে নিন্দা করা হয়। অবশেষে তিনি পুনর্বার বিলটি আইনসভায় উত্থাপন করলে (২২ মার্চ, ১৯৪৩) মুসলিম লীগ সদস্যগণ তা বানচাল করে দেন।

অসাধারণ নেতৃত্ব

ফজলুল হকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর একটি চোখ নিবদ্ধ ছিল মুসলিম জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দিকে এবং অপরটি উৎপীড়িত কৃষক-রায়তের দিকে। উভয় কারণে তাঁর চরিত্রে গভীর অনুভূতি ও আবেগপ্রবণতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি মুসলমানদের গৌরবময় অতীতের চিত্র তুলে ধরে একদিকে যেমন সুশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, অপর দিকে দরিদ্রের গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে তার দুঃখমোচনের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রাজশক্তির শাসনামলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিপন্ন দশা লক্ষ্য করে তিনি মর্মপীড়া অনুভব করেছেন বলেই বারংবার বিভিন্ন বক্তৃতায় অতীত ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন ঃ

> আমাদের শিরায় গোলামির রক্ত নেই ; কিছুকাল পূর্বেও ভারতে মুসলমানগণই ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গে এই উপমহাদেশের সাত কোটি মুসলমানেরও তিনটি মহাদেশব্যাপী তেরো শতাব্দীর সার্বভৌমত্ব ও বিজয়-গৌরবের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। .....অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাইদের আমি মনে রাখতে বলি যে মুসলিম ভারত আজ বিক্ষুব্ধ ; তাদের আইনগত অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি যে

---

১৭ BLCP, 1941, Vol. LX No. 4, p. 104

www.pathagar.com

পর্যন্ত না দেওয়া হবে ততদিন তারা শান্ত হবে না।[১৮]

বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে সংকটের আবর্ত সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য নিরলসভাবে প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকেও উপর্যুক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি স্বীয় মনোভাব দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।

ফজলুল হক অসাধারণ নেতৃত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন বলেই ১৯১৮ সনে যুগপৎ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কর্ণধার হতে পেরেছিলেন। উল্লেখ্য যে সে সময়ে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পদে আসীন ছিলেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াও তখন অত্যন্ত উত্তপ্ত। তার প্রধান কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধের শেষে তা ভঙ্গ করে। উপরন্তু ভারতবাসীদের স্বাধিকার দাবি স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে কুখ্যাত দমনমূলক আইন রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করার উদ্যোগ নেয়। স্বাভাবিকভাবেই সারা উপমহাদেশে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন ফজলুল হক। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

> .....পারস্পরিক মতবিরোধের সমাধি রচনা করে এক বাক্যে তাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে এই দমনমূলক বিলের বিরুদ্ধে। আমাদের ভুললে চলবে না যে এ বিল আইনে পরিণত হলে দেশের সব রাজনৈতিক তৎপরতার মৃত্যু অবধারিত, আর তা কেবল আমাদের যুগের জন্যই নয়, আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকেও তার কাফ্ফারা দিতে হবে।[১৯]

একই সময়ের আরো কতিপয় ঘটনা উপমহাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের* নৃশংস হত্যাকাণ্ড অন্যতম। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের প্রতিবাদে ফজলুল হক আগেই সোচ্চার ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা তাঁকে আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই হত্যাকাণ্ডের অন্তের জন্য কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্য ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং এ. কে. ফজলুল হক। সে সময় থেকে ইংরেজ শাসকদের দমননীতি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিবাদে উপমহাদেশব্যাপী শুরু হয় সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, স্বরাজ ও খেলাফত আন্দোলন। এই আন্দোলনসমূহের সঙ্গে ফজলুল হক সরাসরি কতদূর যুক্ত ছিলেন

---

১৮ IRTCP, প্রাগুক্ত, p. 140, অনূদিত

১৯ খোন্দকার আবদুল খালেক, এক শতাব্দী (ঢাকা, অগ্রাহয়ণ, ১৩৭৩) পৃ. ৮৭

* এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

বলা কঠিন, তবে এ কথা সত্য যে তিনি রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকেই ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সাথে একাত্ম ছিলেন। তবে তাঁর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক–রায়তের দিকে। সম্ভবত এ কারণেই কিছুকাল সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করলেও তিনি বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে মূলত সীমাবদ্ধ রাখেন।

বাংলার দরিদ্র কৃষককুলের ভাগ্যোন্নয়নই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ঋণভারে জর্জরিত কৃষক শ্রেণীর মুক্তির জন্য কখনো কখনো তিনি মন্ত্রীপদে বহাল থেকেও সরাসরি আন্দোলনের পথে নেমেছেন। তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই। প্রসঙ্গত মানিকগঞ্জ শহরের অদূরবর্তী গ্রাম ঘিওরের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সেখানকার দরিদ্র মুসলমান চাষী সম্প্রদায় ছিল সাহা সম্প্রদায়ের সুদের কারবারের অসহায় শিকার। দারিদ্র্যের কারণে চাষীরা বাধ্য হয়ে সাহাদের নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। শেষ পর্যন্ত দেখা যেত যে তাদের পক্ষে সুদের টাকা পরিশোধ করাই দায়, আসল পরিশোধ করা দূরের কথা। চাষীদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সাহারা তাদের ভিটেমাটি গ্রাস করত এবং জবরদখলকৃত জমিতে তাদের বিনা মজুরিতে ফসল ফলাতে বাধ্য করত। ঘিওরের নির্যাতিত কৃষকদের মুক্তির জন্য ফজলুল হক এগিয়ে আসেন (১৯২৬) এবং সাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ভীতসন্ত্রস্ত সাহাগণ এই নাজুক পরিস্থিতিতে শুধু সুদের দাবিই ছেড়ে দেয় নি, জবরদখলকৃত বসতবাড়ী ও জমিজমাও বিনা শর্তে চাষীদের হাতে ফিরিয়ে দেয়। ঘিওরের জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন যে রায়তের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। বস্তুত ১৯১৪ সনে কামারের চরের কৃষক–প্রজা সম্মেলনে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে তিনি যে কর্মসূচী ঘোষণা করেন তারই ভিত্তিতে ঘিওরের কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেছিলেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বের অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি (charismatic power) ছিল বলেই তাঁর আহ্বানে গ্রাম বাংলার জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত–ভাবে সাড়া দিয়ে এসেছে। তিনি শুধু সাহসী নেতা ছিলেন না, জনদরদীও ছিলেন, যে কারণে তিনি একদিকে যেমন 'শেরে বাংলা' নামে পরিচিত ছিলেন, অপর দিকে ছিলেন গ্রাম বাংলার প্রিয় 'হক সাহেব'। তাছাড়া ফজলুল হককে যুক্তিসঙ্গতভাবেই গ্রাম বাংলার প্রথম পুর বা শহুরে নেতা বলা যায়। তাঁর পূর্বে কৃষক আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন গ্রামীণ নেতা। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সাথে সাথে গ্রামীণ নেতৃত্বের অবসান ঘটতে থাকে এবং তার পরিবর্তে পুর নেতৃত্বের পালা শুরু হয়। যাঁরা বলেন যে নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজ শাসকদের স্বার্থে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে শহুরে নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁদের যুক্তি যথার্থ প্রমাণিত হয় নি। অন্তত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুর নেতা ফজলুল হক কখনো ইংরেজ–তোষণ নীতির প্রশ্রয় দেননি।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা

স্বাধীনতা আন্দোলনে ফজলুল হকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক বলা যায়। ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সনে ফজলুল হকই আনুষ্ঠানিকভাবে 'লাহোর প্রস্তাব' পেশ করেন। এই প্রস্তাবকে মুসলিম ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতা সনদ' বলা হয়। এর মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় এবং স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান জন্মলাভ করে।

পাকিস্তান আমলের রাজনীতিতেও ফজলুল হকের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক–আমলাতান্ত্রিক এলিট গোড়া থেকেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনে জাতীয় নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্তনির্ণয় প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকার করে নি। তাছাড়া সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারেও কেন্দ্রের মুসলিম লীগ সরকার দীর্ঘসূত্রিতার প্রশ্রয় দিতে থাকে যার ফলে পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। তদুপরি যখন উর্দু ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলে তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল গণবিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভ রূপান্তরিত হয় প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলনে। জাতীয় রাজনীতির এই সংকটকালে ফজলুল হক পুনরায় রাজনৈতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন।

পূর্ব বাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ফজলুল হক যে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা নানা দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি একযোগে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। নেতাদের মধ্যে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। অপরদিকে মুসলিম লীগ মাত্র নয়টি আসনে জয়লাভ করে। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে প্রবর্তন এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে একুশ দফাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এবং ফজলুল হক ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে।

পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফজলুল হক আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও পাকিস্তানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ফজলুল হক ছিলেন ১৯৫৬–এর পাকিস্তান সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা। সংসদীয় গণতন্ত্রের মডেল সামনে রেখে সংবিধান রচনার কাজ তিনি শেষ করেছিলেন। কিন্তু সংবিধান কার্যকর হওয়ার দু'বছরের মধ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়। সামরিক–আমলাতান্ত্রিক এলিটের ক্ষমতালিপ্সা ও

www.pathagar.com

প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ বিধ্বস্ত হয়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ফজলুল হক পরম দুঃখে বলেছিলেন ঃ

> হে খোদা, যে দেশে আমার ভোট নেই সে দেশে বাস করতে চাই না। দয়া করে আমাকে তুলে নাও।[২০]

১৯৬২ সনের ২৭ এপ্রিল তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবনাবসানের সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার

ফজলুল হকের রাজনীতি ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে তিনি অন্তরের আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে রাজনীতিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। দার্শনিক রুসোর সঙ্গে তাঁর মিল এখানেই। রুসোও তাঁর রাজনীতিচিন্তায় আবেগ ও অনুভূতির ধারা নতুনভাবে সঞ্চারিত করেছিলেন। অনস্বীকার্য যে অন্তরের স্পর্শবিহীন বা আবেগবিবর্জিত রাজনীতি সাধারণত হিংসাত্মক ও বিদ্বেষাত্মক হয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ফজলুল হকের রাজনীতি কখনো হিংসাত্মক বা ষড়যন্ত্রমূলক ছিল না।

সবচেয়ে বড়ো কথা, ফজলুল হক ছিলেন জনদরদী হৃদয়বান পুরুষ। তাঁর একটি কোমল অন্তর ছিল, ছিল আবেগ। আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি আত্মবিশ্লেষণও করেছেন। তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে তাঁর গতিময় জীবনে দৈবের দান তিনি অযাচিতভাবে পেয়েছেন এবং ত্রুটি যেখানে হয়েছে তা নিজের বলে মেনে নিয়েছেন নিঃসংকোচে। কিন্তু তবু, তাঁর কথায় ঃ

> ...It has availed me nothing in the eternal struggle which man wages on behalf of himself against himself.[২১]

---

২০ Kamal, প্রাগুক্ত, p. 41

২১ *Pakistan Observer* (Supplement), April 27, 1967, p. 1

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের রাজনীতি

২১

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(১৮৯২--১৯৬৩)

উপমহাদেশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী একটি পরিবারে ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২ সনে কলিকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্ম। তাঁর পিতা জাহিদুর রহিম জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। বাল্যকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর মা এবং মামা স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি কলিকাতার মাদ্রাসায়ে আলীয়া থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কলেজের বি.এস-সি (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১১ সনে তিনি ইংলন্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং যথাসময়ে অনার্সসহ বি. এস-সি. ও বি. সি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি Gray's Inn থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করেন (১৯১৮ সন)। তিনি ১৯১৮ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা যায় বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি, আরবী ও আইনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে তিনি স্বদেশে ফিরেছিলেন।

রাজনৈতিক জীবন

অতি অল্পকালের মধ্যেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একই সঙ্গে তিনি রাজনীতির আহ্বানেও সাড়া দেন। অবশ্য বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহের দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল ছাত্রাবস্থা থেকেই। বঙ্গভঙ্গ যখন রহিত করা হয় তিনি তখন আঠারো বছরের যুবক। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলিম বঙ্গে যে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তিনি তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গোড়া থেকেই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতৃত্ব বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সম্ভাবনাও তার সাথে ক্রমেই ক্ষীণতর হতে থাকে। অপর দিকে, বঙ্গভঙ্গ রদের প্রায় পাঁচ বছর পর এ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে বোম্বাইতে শুরু হয় **হোমরুল মুভমেন্ট**। হোমরুল আন্দোলন মূলত স্বরাজ আন্দোলন। তৎকালীন ভারতীয়দের ক্রমবিকাশমান রাজনৈতিক সচেতনতা

www.pathagar.com

ও তৎপরতা লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। রাওলাট আইনসহ অন্যান্য দমনমূলক আইনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯) থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে ইংরেজ রাজশক্তি ভারতীয়দের রাজনৈতিক তৎপরতা যেকোন প্রকারে দমন করতে বদ্ধপরিকর। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের নিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপর দিকে তার ফলে সারা উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন প্রবলতর হতে থাকে। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এই বিক্ষোভের ফসল। এ ছাড়া ওয়াহাবি আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি যখন মাদ্রাসায়ে আলীয়ার ছাত্র সে সময় ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত মাদ্রাসার ছাত্ররা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সম্ভবত তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনব্যবসার প্রারম্ভ থেকেই রাজনৈতিক মঞ্চে পদচারণা শুরু করেন।

১৯২১ সনে অর্থাৎ ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিন বছর পর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক দিক থেকে সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তখন উপমহাদেশে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধর্মবর্ণ নির্বেশেষে সকল ভারতবাসীর প্রবল প্রতিবাদ — এই উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ইংরেজ রাজশক্তির ভিত স্বাভাবিইকভাবেই কেঁপে উঠেছিল। সে সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যে ব্যক্তিটি তাঁকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ করেন তাঁর নাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর স্বদেশপ্রেম সোহরাওয়ার্দীকে অনুপ্রাণিত করে। উভয়ের মতাদর্শগত ঐক্যের কারণেই উভয়ের পক্ষে একযোগে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার নিরসনকল্পে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই **সি. আর. দাস ফর্মুলা বা বেঙ্গল প্যাক্ট**-এর* প্রতি শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। উক্ত ফর্মুলা উদারপন্থী চিত্তরঞ্জন দাসের মহৎ অবদান হিসাবেই শুধু গুরুত্বলাভ করে নি, এর শর্তগুলো বাস্তবায়িত হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথও প্রশস্ততর হতো।

বেঙ্গল প্যাক্ট অনুযায়ী শতকরা ৫৬ ভাগ সরকারি চাকুরি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমান চাকুরিজীবীর সংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ না হবে ততদিন মুসলমানদের শতকরা ৮০ ভাগ চাকুরিতে নিয়োগাদন করা হবে এই শর্ত মেনে নেওয়া হয়। বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হওয়ার দু'বছর পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেহত্যাগ

---

* এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন দাস শীর্ষক অধ্যায়, পৃ. ১১০-১১১ দ্রঃ

www.pathagar.com

করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অমুসলিম নেতাগণ এই চুক্তি বাতিল করে দেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আবার নতুন করে শুরু হয় ; বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী হিন্দু-মুসলিম মিলনের যে সেতুবন্ধন রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন তা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার দিকে মনোযোগ দান করেন। সৈয়দ আহমদ খান ও নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ নেতা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও অনেকটা অভিন্ন পথে অগ্রসর হন। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থচিন্তা তাঁকে আন্দোলিত করেছিল বলেই তিনি নির্দ্বিধায় খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনিই ছিলেন কলিকাতা খেলাফত কমিটির প্রধান। এরপর ১৯২৮ সনে নেহরু রিপোর্ট-এ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে দেখে তিনি এর তীব্র সমালোচনা করেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল একথা বলা চলে না। বিভিন্ন সময়ে তিনি মন্ত্রীপদে বৃত হয়েছেন, অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিই। উপরন্তু তিনি পাকিস্তানেরও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে হয়েছে। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ভারত বিভক্ত হলো এবং বাংলার পূর্বাঞ্চল রূপান্তরিত হলো পূর্ব পাকিস্তানে। ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সাথে সাথে শুরু হলো সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে তিনি ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে যান নি। এক মানবগোষ্ঠীর হাতে অপর এক মানবগোষ্ঠী যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণ করছে তা দেখে তিনি বিচলিত হন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও দাঙ্গাউপদ্রুত এলাকায় গিয়ে দুর্গত নরনারীর উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মহানুভবতাকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা তাঁকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য দায়ী করে এবং তদুপরি আইনসভায় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী উভয় দলের অভিযোগের জবাবে যে বক্তব্য রাখেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য মুসলিম লীগকে একপেশেভাবে দায়ী করা অনুচিত। কংগ্রেসের মানসিকতা মুসলিম লীগের অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছিল সত্য, তা বলে মুসলিম লীগ বা মুসলিম জনগোষ্ঠী কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চায় নি। মুসলিম লীগের অসন্তোষের কারণ কেবিনেট মিশনের বিশ্বাসঘাতকতা। তাছাড়া ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারেও কংগ্রেস মুসলিম লীগকে কেবল অগ্রাহ্য করে নি, উপরন্তু ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে।[১] সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার পর বঙ্গীয় আইনসভা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

---

১ এ. এস. এম, আবদুর রব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃ. ৫২-৫৫ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

ভারত ভাগ হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পর (১৯৪৯) শহীদ সোহরাওয়ার্দী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের চেষ্টা করলে ক্ষমতাসীন শাসকচক্র পাকিস্তানের প্রতি সোহরাওয়ার্দীর আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে তাঁর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর পূর্বে ৩০ জুন, ১৯৪৮ সনে সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসেছিলেন। তখনো নাজিমউদ্দিন সরকার তাঁকে বহিষ্কার করে। ধারণা করা যায় যে সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নাজিমউদ্দিন সরকার এ ধরনের আপত্তিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।[২] শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনন্যোপায় হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাকিস্তানে আগমনের অল্পকালের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার জোরে তিনি অনায়াসে উঁচুদরের রাজনীতিবিদের মর্যাদা পেয়েছিলেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন

শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে পদার্পণের পর থেকেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি অনুভব করেন যে রাজনৈতিক দলের সমর্থন ব্যতিরেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সার্থক হতে পারে না। ১৯৫০ সনে তিনি **নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ** গঠন করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে তিনি পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্র তাঁর প্রয়াস বারংবার ব্যর্থ করে দেয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন তাতে এ দেশের রাজনীতিতে এক নাবজাগরনের সূচনা ঘটে। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন শাসকচক্র উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে বছর তিনি এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে মাত্র ৯টি আসন ছাড়া বাকী সকল আসনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে।*

১৯৫৪-এর নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পায়। সে বছর পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সহসা গণপরিষদ ভেঙে দেন (২৪ অক্টোবর) যার ফলে পাকিস্তানে গুরুতর রকমের শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি হয়। গোলাম মোহাম্মদের অনুরোধে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত

---

২ সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা (৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৬) পৃ. ১৪

* এ বিষয়ে এ. কে. ফজলুল হক শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ভেবেছিলেন, আইনমন্ত্রী হিসাবে শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে গণতন্ত্রের পথ সুগম করবেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজটি ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে তিনি প্যারিটি ফরমূলার অনুকূলে জোর প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তিনি মনে করেছিলেন যে প্যারিটি ফরমূলা গৃহীত হলে শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসান ঘটবে। উল্লেখ্য যে প্রথম গণপরিষদেই ফরমূলাটি গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে এক কোটি বিশ লক্ষ বেশি ছিল বলে পূর্ব পাকিস্তান সঙ্গত কারণেই প্যারিটি ফরমূলার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই ফরমূলার সপক্ষে ওকালতি করেন। বলা যায়, তাঁরই নিরলস প্রয়াসের ফলে পূর্ব পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত এই ফরমূলা মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্যারিটি ফরমূলা বা সংখ্যাসমতা নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিলাভ করে ১৯৫৫-এর মারী সম্মেলনে। মারী চুক্তির শর্ত মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ রূপে স্বীকার করা হয়। এছাড়া উভয় প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন, প্যারিটির ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব, যুক্তনির্বাচননীতি এবং বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাব মারী সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

মারী সম্মেলনের পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তৎকালে বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্ত্বেও এ. কে. ফজলুল হক ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে একযোগে সংবিধান রচনা করেন। সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতির দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে। কায়েমী স্বার্থচক্র সংবিধানের উপর আঘাত হানে। বিশেষত সামরিক-আমলাতান্ত্রিক এলিটের ষড়যন্ত্রের ফলে সংবিধান মোতাবেক প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার কারণে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েও (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন নি। তিনি গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির কাছে মাথা নত করেন নি বলেই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জার অভিপ্রায় অনুযায়ী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (১১ অক্টোবর, ১৯৫৬)। এ সত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকে নি। তিনি দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ঐকমত্যের

www.pathagar.com

ভিত্তিতে ফিরোজ খান নুন-এর মন্ত্রিসভা যখন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা অকস্মাৎ সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন (৭ অক্টোবর, ১৯৫৬) এবং তৎসহ পার্লামেন্ট এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে সামরিক শাসন জারি করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হলো একনায়কী শাসনব্যবস্থা। সামরিক শাসনের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শাসকচক্র অবৈধভাবে EBDO (Elected Bodies Disqualification Order) বিধিবলে বহু রাজনৈতিক নেতাকে ছয় বছরের জন্য রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসিত করে। এই বিধিবলে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল তাই নয়, সামরিক শাসকচক্র তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ করে (৩০ জানুয়ারি, ১৯৬২)। মুক্তিলাভের পর তিনি পুনরায় পাকিস্তানের উভয় অংশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন চালাতে থাকেন। কিন্তু শাসকচক্র বারংবার তাঁর আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেষ্টা করে। এমনকি গুজরানওয়ালায় তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের পথে তিনি আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। কারাভোগজনিত যন্ত্রণা ও কঠিন হৃদরোগের দরুন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। অবশেষে ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ বৈরুতের এক হোটেলে তিনি রহস্যজনক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। প্রসঙ্গত সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ

> ভাল মানুষের বরাতে যা ঘটে, সুহরাওয়ার্দীর বরাতে তাই ঘটিয়াছিল। তিনি কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন নাই বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে দ্বিধা করেন নাই। বস্তুত অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী থাকিয়াও যে বিভক্ত পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন নাই অথবা মেজরিটি মেম্বর পক্ষে থাকা সত্ত্বেও যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব রাখিতে পারেন নাই, তা ছিল ষড়যন্ত্রেরই ফল।[৩]

সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনীতি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই, উভয়ের রাজনীতির চরিত্রও ছিল অভিন্ন। তা বলে উভয়ের রাজনৈতিক মতাদর্শও সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে। তাছাড়া পাশ্চাত্য

---

৩ আবুল মনসুর আহমদ, বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা, (ঢাকা, ১৯৮২), পৃ. ৬৪

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন নি। অপরপক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিদ্যমান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলুপ্তি চান নি। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদর্শ, নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অপর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ন্যায়নীতি বিবর্জিত ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মেকিয়াভেলী আধুনিক রাজনীতির যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ছলেবলে কৌশলে ক্ষমতা ধারণ করাই আধুনিক রাজনীতি, সোহরাওয়ার্দী তা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। আবুল মনসুর আহমদ বলেন ঃ

> সুহরাওয়ার্দীর রাজনীতিতে ন্যায়নীতি, ধর্মীয় মনোভাব, ঈমানদারি, এথিক্স ও মর‍্যালিটি মিশ্রিত ছিল।[৪]

প্রসঙ্গত শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উক্তিও উল্লেখ করা আবশ্যক। এক জনসভায় ভাষণদানকালে তিনি বলেন ঃ

> আমি এমন রাজনীতিতে বিশ্বাসী যাতে ষড়যন্ত্রের স্থান নেই। জীবনে কোন দিন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করি নাই, ভবিষ্যতেও করিব না। আমি এমন রাজনীতি করিতে চাই যাতে আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী বলিতে পারিবে ঃ সুহরাওয়ার্দী এমন একজন লোক ছিলেন যিনি বিনা ষড়যন্ত্রে ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন, বিনা ষড়যন্ত্রেই জনগণের খেদমৎ করিয়াছিলেন।[৫]

শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই রাজনীতিতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এবং তা করতে গিয়ে তাঁকে বহুবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তিবু তিনি নিরাশ হন নি। তাঁর উক্তি থেকে একথা বুঝা যায়। তিনি বলেন ঃ

> জীবনে শুধু জিতিলেই চলে না, হারিতেও হয়। জান, মহত্ত্বের জিতের চেয়ে হারই বেশী। তবে সব হারই হার নয়, আর সব জিতই জিত নয়।[৬]

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গণতন্ত্রপ্রীতি প্রকৃতপক্ষে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তিনি বহু জনসভায় এবং আইন পরিষদের অধিবেশনে গণতন্ত্রের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর কথায় —

> .....কোন ব্যক্তির খেয়ালের উপর নয়, বরং জনগণের ইচ্ছাই সরকারি নীতির ভিত্তি হতে হবে। গণতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সচেতন, কারণ গণতন্ত্র মানুষেরই তৈরি। এর অনেক অপরিহার্য ত্রুটি আছে, কিন্তু মোটের উপর গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রগতি ও

---

৪ ঐ, পৃ. ৬৩
৫ ঐ, পৃ. ৬৪
৬ পাণ্ডুক্ত, পৃ. ৬৪

www.pathagar.com

বিবর্তনের একমাত্র নিশ্চিত পথ। একে শুধু সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগই দিতে হবে না, বরং একে এই রাজনৈতিক স্বতসিদ্ধরূপে গ্রহণ করতে হবে যে, নির্ভুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।[৭]

প্রচুর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু এই রাষ্ট্রটিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কখনো গড়ে উঠল না দেখে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে একথা তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে পাকিস্তানে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক চক্রের চক্রান্তের ফলে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে নি। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে রাজনীতি ক্ষেত্রে সামরিক-আমলাচক্রের অবৈধ হস্তক্ষেপ যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন গণতন্ত্রের বিকাশ অবরুদ্ধ থাকবে।

মানবস্বাধীনতা প্রসঙ্গে

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মানবস্বাধীনতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সরকারি হস্তক্ষেপ শুধু অবৈধ নয়, নিন্দনীয়ও বটে।

তিনি বলেন ঃ

> The evil of interference by the Government with the liberty of the people unfolds a vista of illegality and oppression . . .[৮]

মানবস্বাধীনতার উপর সরকার অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করলে মানবমনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং রাজনৈতিক অসন্তোষ দূর করতে হলে, তিনি বলেন ঃ

> You should establish a system of government broad-based on the people's will.[৯]

অর্থাৎ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিশ্বাস করতেন যে জনসম্মতিভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে জনগণ সরকারের হাতে লাঞ্ছিত বা নির্যাতিত হয় না।

এছাড়া হিংসাত্মক বা সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রশ্রয় দেওয়াকে তিনি অন্যায় মনে করেছেন। তিনি বলেন, "হিংসার উপর যদি কোন দেশের ভিত্তি হয় তাহলে সে দেশ কখনো উন্নতি করতে পারে না। মহব্বতের উপর, প্রেমের উপর যে দেশের ভিত্তি সেই দেশই উন্নতি করতে পারে। এটাই আল্লাহ্‌র পথ।"[১০]

---

৭. প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬, সাপ্তাহিক রোববার, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি, পৃ. ৩৩

৮. BLCP, Vol, XIV, part I, 1924, p. 78

৯ BLCP, ঐ, পৃ. ৭৯

১০ সাপ্তাহিক রোববার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

www.pathagar.com

স্থিতিশীল সরকার

শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল সরকার অপরিহার্য মনে করেন। তিনি বলেন ঃ

> সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা বহাল রাখতে হলে জনগণের কি চাই আর সরকারের কতোটুকু ক্ষমতা আছে তার মধ্যে সর্বদাই একটা যোগাযোগ থাকতে হবে এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সংযোগ রাখতে হবে। উভয় পক্ষই যদি পরস্পরকে বুঝতে পারে, তাহলেই তাদের মধ্যে আত্মীক-সম্পর্ক গড়ে উঠতে এবং পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব দূর হবে। এভাবেই উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে।[১১]

শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করেন যে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগগত ব্যবধান বা কম্যুনিকেশন গ্যাপ থাকলে সে সরকার স্থিতিশীল হয় না। যে-কোন রাষ্ট্রের জন্য এ কথা সত্য।

সাম্রাজ্যবাদ

রাজনীতিকে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজীবন চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দুর্বল রাষ্ট্রকে তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে সে তার নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাঁবেদার রাষ্ট্রে স্বীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অপর বিশেষত্ব এই যে সে-ই "প্রায় সর্বাগ্রে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরগলায় চিৎকার জুড়ে দেয়।"[১২] প্রসঙ্গত তিনি তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের নাজুক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি বলেন ঃ

> দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের মনোবৃত্তি এমন হয়েছে যে, আমরা যদি আমেরিকা বা বৃটেনের পক্ষে কিছু বলি তবে আমাদেরকে 'সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক' বলা হয়, আর যদি রাশিয়ার পক্ষে আমরা কিছু বলি তবে আমাদেরকে বলা হয় 'স্বাধীন।[১৩]

কিন্তু তিনি একথাও বুঝেছিলেন যে জোটনিরপেক্ষ অবস্থায় দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন। এজন্যই তিনি শক্তিশালী জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকা দুর্বল রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাগদাদ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রজোটে যোগদান করেন। একই লক্ষ্যে তিনি গণচীনের সঙ্গেও

---

১১ Foreign Affairs, April 1957এ প্রকাশিত সোহরাওয়ার্দীর নিবন্ধের আংশিক অনূদিত উদ্ধৃতি। সাপ্তাহিক রোববার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১২ রোববার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৩ ঐ, পৃ. ৫৮

www.pathagar.com

মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। অবশ্য তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক-আমলাচক্র এই মৈত্রীচুক্তি সুনজরে দেখে নি। এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিন্তায় ও কর্মে কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি মুখে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কাজে দেখা যায় যে তিনি প্রয়োজনবোধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ঐক্যজোটে যোগদান করতে দ্বিধা করেন নি। বাগদাদ চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করে তিনি একথার প্রমাণ দিয়েছেন।

সামরিক শাসনের কুফল

শহীদ সোহরাওয়ার্দী নানা কারণে সামরিক শাসনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্রের ষড়যন্ত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারাতে হয়েছিল। পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হওয়াতে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে সে কথা তিনি বিভিন্ন নিবন্ধে প্রকাশ করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সামরিক শাসনের কুফলসমূহ তুলে ধরেন। তাঁর মতে সামরিক শাসন জারি হলে জনগণের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার থাকে না। তাছাড়া, শাসক-চক্র ও জনগণের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রভেদ সৃষ্টি হয়। শাসকচক্র জনগণের সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকে ; কর ও লেভীর হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যেভাবে বাড়তে থাকে তদনুপাতে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায় না। সাথে সাথে অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে ওঠে এবং আমলার দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু শাসকচক্র দেশে ও বিদেশে 'সরকারের মাহাত্ম্য' প্রচারের জন্য প্রচারমাধ্যমগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ; স্বাধীনচেতা সংবাদপত্রসমূহকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে এবং নিয়মিতভাবে বিষোদ্গার করে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে। তাছাড়া তারা অসাধুতার অভিযোগে নানাভাবে নাজেহাল করে বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবী শ্রেণীকে। কেবল তাই নয়, প্রধান শাসকের স্বনিয়োজিত তোষামোদকারী উপদেষ্টাগণ তাকে প্রতিনিয়ত কুপরামর্শ দিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। আইয়ুব খানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আইয়ুব খান যে সংবিধান দিয়েছেন তাতে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা মাত্র এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ প্রধান শাসককে দেওয়া হয়েছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিশ্বাস করতেন যে, যে দেশে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকে সে দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে না।

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

শহীদ সোহরাওয়ার্দী শুধু একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি প্রত্যেক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে। ইউটোপিয়ানিজম-এ তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। এ কারণে

www.pathagar.com

তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর প্রাগমেটিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি রাজনীতিতে ভাবাবেগের প্রশ্রয় দেন নি। অনেক সময় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাগণ তাঁর রাজনৈতিক ফরমূলা অগ্রাহ্য করেছেন বলেই রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, এমনকি রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে পড়েছে। প্রসঙ্গত আবুল মনসুর আহমদের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন ঃ

> দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ফরমূলা বেঙ্গল প্যাক্ট ভারতীয় কংগ্রেস মানে নাই বলিয়াই ভারত ভাগ হইয়াছে। শহীদ সাহেবের পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের ঐক্য ফরমূলা সার্বিক প্যারিটি পাকিস্তানের নেতারা মানেন নাই বলিয়া পাকিস্তানও ভাগ হইতে পারে, এটাই আমার আশঙ্কা।[১৪]

বলা বাহুল্য , আবুল মনসুর আহমদের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হতে মাত্র নয় বছর লেগেছিল। তবে প্যারিটি ফরমূলার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা আপত্তি তুলেছিল এই যুক্তিতে যে এই ফরমূলা গৃহীত হলে লোকসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু প্রদেশে পরিণত হবে। এ আপত্তি ন্যায়সঙ্গত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু গোটা পাকিস্তানের সংহতির কথা চিন্তা করেই শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই ফরমূলার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। এ ছাড়া দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামরিক শাসন যে দেশে একবার প্রতিষ্ঠিত হয় সে দেশে সহজে গণতন্ত্র আসে না। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের দিকে লক্ষ্য করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিশেষে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজীবন নিয়মতন্ত্রের পথ অনুসরণ করেছেন সত্য, কিন্তু আবার কখনো তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের ভুল বুঝাবুঝিও হয়েছে। তবে এ-ও সত্য যে তিনি গণতন্ত্রের প্রতি আন্তরিকভাবেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যে কারণে সামরিক-আমলাচক্রের সঙ্গে তিনি কখনো আপোষ করেন নি। তাঁকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় এ কারণেই।*

---

১৪ মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

* এই অধ্যায়টি ডঃ নুরুননাহার ফয়জননেসা ও লেখকের যৌথ প্রয়াসের ফসল

www.pathagar.com

সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি

২২

সুভাষচন্দ্র বসু
(১৮৯৭-১৯৪৫)

এই উপমহাদেশের অন্যতম বীর সন্তান সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম ভারতের অন্তর্গত কটকে — ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ সনে। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য (১৯১২)। জানকীনাথ গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারপ্রদত্ত রায়বাহাদুর খেতাব বর্জন করেন। সুভাষ বসু একটি সুশিক্ষিত, রাজনীতিসচেতন পরিবারে লালিতপালিত হয়েছেন। পারিবারিক প্রভাবের কারণেই হোক বা তৎকালীন ভারতে বিরাজমান উত্তপ্ত রাজনীতিক আবহাওয়ার কারণেই হোক, সুভাষ বসু কৈশোর থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের এবং পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আদর্শে প্রভাবিত হন। উভয়ের প্রভাবে তাঁর এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে মানবসেবা ও দেশসেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। দেশসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ধনসম্পদ ও উচ্চ সরকারি পদের মোহ ত্যাগ করেন। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করেও সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন নি।

কলেজজীবন থেকেই তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী। তিনি সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি এবং তা করতে গিয়ে যত বেশি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। এ সময়ে শ্রী অরবিন্দের গূঢ় অতীন্দ্রিয় দর্শন তাঁর চিন্তা-চেতনায় কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল বটে, তবে ইংরেজশাসিত ভারতের বিপন্নদশা তাঁকে অধিক মাত্রায় পীড়িত করে। কলেজজীবনেও তিনি ইংরেজ অধ্যক্ষ ওটেন-এর অবিচারের শিকার হয়েছেন। তদুপরি জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড তাঁর ব্যক্তিমানসে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যতিরেকে আর কোন পথ নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কতিপয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা তাঁর অন্তরে বিশেষ রেখাপাত করে নি।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব

সুভাষ বসু উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলন্ডে গমন করেন ১৯১৯ সনে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশ তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হলেও পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তার প্রতি তিনি তেমন আকর্ষণ বোধ করেন নি। প্রায় দু'বছর পরে স্বদেশে ফিরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের দরুন সারা উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধী এবং খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্বে মওলানা শওকত আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলী। উভয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রথম দিকে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ঐক্যের বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায়। সে সময় গান্ধী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে এক বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। সুভাষ বসুর মনে তখন তিনটি প্রশ্ন জাগে ঃ অসহযোগ আন্দোলন এমন পর্যায়ে যাবে কিনা যখন সকল ভারতীয় নাগরিক সরকারকে করদানে বিরত থাকবে ; অসহযোগ আন্দোলনের পথে স্বরাজ আসবে কিনা ; এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ আসবে বলে গান্ধী যে ঘোষণা দিয়েছেন তা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা।[১] এসব প্রশ্নে গান্ধীর বক্তব্য সুভাষ বসুর মতপূত হয়েছিল একথা বলা যায় না।

স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে গান্ধী ও সুভাষ বসুর মতানৈক্য গোড়া থেকেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তদুপরি চৌরিচরার ঘটনার (১৯২২) পর গান্ধী যেরূপ একতরফাভাবে অহিংস আন্দোলন সহসা তুলে নেন তাতেও গান্ধীর পদক্ষেপের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সুভাষ বসুর মনে সংশয় দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে উভয়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা দুটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হচ্ছে।

সুভাষ বসুর মতাদর্শের পরিচয় বহন করে প্রধানত তাঁর সম্পাদনায় ও পরিচালনায় প্রকাশিত যথাক্রমে **বাংলার কথা ও দৈনিক ফরওয়ার্ড** নামে দুটি পত্রিকা। ইংলন্ড থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁর রাজনৈতিক খ্যাতি বৃদ্ধির পশ্চাতে এই পত্রিকা দুটির অবদান কোন অংশে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯২২ সন থেকেই উপমহাদেশের রাজনীতিতে কিছুটা অচলাবস্থা দেখা দেয়। তখন গান্ধী বাহ্যত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অন্তরালে চলে গেছেন, মতিলাল নেহরু লন্ডনে তাঁর রোগশয্যাশায়ী কন্যার সেবাযত্নে ব্যস্ত এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ। প্রায় ছয় বছর পর আবার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সংবিধান সংস্কারের জন্য সম্পূর্ণভাবে শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের সমবায়ে গঠিত **সাইমন কমিশন** ভারতে আসে। কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি না

---

১ *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose* (Intro. S. A. Ayer) (Govt. of India, Delhi. 1962) p. 12

www.pathagar.com

থাকাতে রাজনৈতিক মহলে কমিশনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুভাষ বসু সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলায় বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন।* সে বছর তিনি **ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ**-এ যোগদান করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের নেতার সঙ্গে সুভাষ বসুও ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে সুভাষ বসু গান্ধীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এই মতানৈক্য আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯২৮ সন থেকে। সে বছর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী প্রস্তাব করেন যে ব্রিটিশ সরকার এক বছরের মধ্যে ভারতকে **ডোমিনিয়ন স্টেটাস** না দিলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ (Non-violent Non-cooperation) আন্দোলনের পথ বেছে নেবে। সুভাষ বসু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা — ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়, এবং এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাহায্যে এই লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব।

সুভাষ বসু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর ন্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত **বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর** গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেষের দিকে গান্ধী ও সুভাষ বসুর মতদ্বৈধতা প্রবল আকার ধারণ করে, যার ফলে উভয়ের মধ্যে শুরু হয় রাজনৈতিক মঞ্চে প্রাধান্য বিস্তারের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৯৩৯ সনের ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচনে সুভাষ বসু গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সে সময়ে সুভাষ বসু তাঁর নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে উপমহাদেশের যুবশক্তির স্বাধীনতাস্পৃহাকে জোরদার করে তোলেন। 'য়ুরোপের যুদ্ধ এবং ইংলন্ডের সংকটের' পরিস্থিতিতে তিনি সকল ভারতীয়কে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। নির্বাচনে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে সুভাষ বসু দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি হন। সে বছর তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে **ফরোয়ার্ড ব্লক** গঠন করেন। এই উপদলের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ও যুদ্ধবিরোধী নীতি প্রচার করতে থাকেন। তাঁরই নেতৃত্বে তখন সহযোগবাদী রাজনীতির পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির সূচনা ঘটে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং সুভাষ সহ শত শত **ফরোয়ার্ড ব্লক** কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। অন্যায় কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সুভাষ বসু অনশন ধর্মঘট শুরু করলে সরকার তাঁকে মুক্তিদান করে।

---

* সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন গান্ধী, মতিলাল নেহরু, এম. এ. আনসারী, এম. এ. জিন্নাহ, লাজপত রায়, এ. রহিম, অ্যানি বেসান্ত, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সৈয়দ মাহমুদ, মুহম্মদ ইকবাল, জে. এম. সেন, সরোজিনী নাইডু, দিনশ পেটিট, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, এস. পি. সিনহা, এস. ডি. কিচলু, তেজবাহাদুর সপ্রু, সি. এইচ. শীতলবাদ প্রমুখ

www.pathagar.com

১৯৪১ সনে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষ বসু দেশত্যাগ করেন। তিনি জার্মানীতে গিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তাঁর সামরিক প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জাপানও সহায়তাদান করে। কিন্তু ভাগ্যাহত সুভাষ বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে স্বদেশের দ্বারপ্রান্তে এসেও আর অগ্রসর হতে পারেন নি। বর্মার অভ্যন্তরে কোহিমায় ইংরেজ শক্তির সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় ১৯৪৪-এর জুন-জুলাই মাসে। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে আজাদ হিন্দ ফৌজ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। তার প্রায় চার মাস পর (১৮ আগস্ট, ১৯৪৫) সুভাষ বসু এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

রাজনীতিচিন্তা

সুভাষ বসু তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *An Indian Pilgrim* এবং রাজনৈতিক গ্রন্থ *The Indian Struggle*-এ নিজস্ব ভাবধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ভারতের অফুরন্ত চিত্তশক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। এই চিত্তশক্তিই ভারতীয় সভ্যতাকে এক অনন্য গৌরব দান করেছে। মানুষের ন্যায় মানব সভ্যতারও বৃদ্ধি ও মৃত্যু ঘটে ; তবে কোন কোন সভ্যতার পুনর্জন্ম ঘটে তার অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে। ভারতের অন্তর্জগতেও এমন এক শক্তি বিদ্যমান যার বলে ভারতীয় সভ্যতার বিপর্যয় মাঝে মাঝে ঘটলেও তার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে বারংবার। এ কারণেই ভারতীয় সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও কোন কালে এর নবীনতা ও সজীবতা বিনষ্ট হয়নি।[২] ভারতীয় সমাজে যেসব সামাজিক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা এই সভ্যতারই ফসল। কাজেই গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান বলা যায় না। গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা, যাকে সুসভ্য মানবসমাজ গড়ে তুলেছে। মানুষ যখনি তার রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছে, প্রকৃতপক্ষে তখনই গণতন্ত্রের ধারণা তার অন্তরে জাগ্রত হয়েছে। প্রাচীন যুগেও ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন প্রকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গোত্রীয় সমাজে প্রচলিত ছিল গোত্রপতি-নির্বাচন প্রথা এবং নগর ও গ্রামসরকার ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষত পঞ্চায়েত সরকারও গঠিত হতো নির্বাচনের ভিত্তিতে।

এরিস্টটলের ন্যায় সুভাষ বসুও মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে দেখেছেন। এরিস্টটল বলেছেন, সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ দেবতা, নয়তো পশু। সুভাষচন্দ্রের মতেও একমাত্র সমাজবাদী বা যূথবদ্ধ মানুষের পক্ষেই আত্মবিকাশ লাভ করা সম্ভব। "জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, সার্থক পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভরশীল।

---

২ Speeches : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। কিন্তু সমাজের উন্নতি ব্যতিরেকে উন্নতি অর্থহীন। সমাজজীবনের প্রেরণা ও আদর্শ হলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ সকল প্রকার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মানুষ নির্বিশেষে সকলেরই একটি অধিকার আছে — সে অধিকার হলো নিজেকে বিকশিত করে তোলার অবাধ সুযোগ। সেই সুযোগ দেওয়াটাকেই তিনি স্বাধীনতা বলে মনে করতেন।"[৩]

ভারতের শাসনপদ্ধতির প্রশ্নে সুভাষ বসুর ধারণা স্বচ্ছ ছিল সত্য, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার পূর্বে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করা চাই। তিনি স্বাধীনতাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। স্বাধীনতা একদিকে যেমন একটি মহান আদর্শ, যা আমাদের গোটা আত্মাকে শক্তিদান করে, অপরদিকে এর অর্থ সার্বিক মুক্তি অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমাজের স্বাধীনতা, বিত্তবান ও দরিদ্রের স্বাধীনতা, পুরুষ ও নারীর স্বাধীনতা এবং মানবগোষ্ঠী ও শ্রেণীর স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি বুঝায় না, এ দ্বারা আরো বুঝায় সম্পদের সমবণ্টন, বর্ণভেদ ও সামাজিক বৈষম্যের অবসান এবং সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার উচ্ছেদ। এই স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে ইউটোপিয়ান বা কল্পনাবিলাস মনে হতে পারে, তবে এই আদর্শই আত্মার ক্ষুধা মিটাতে পারে। এই স্বাধীনতাই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সহায়ক। তাছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র শুধু গণতান্ত্রিক সমাজে বিকশিত হয়। সমাজে জন্মগত, ধর্ম ও বর্ণগত বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই বৈষম্য দূর করে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া আবশ্যক।

সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ

সুভাষ বসুর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মূলত সমাজতন্ত্রের দিকে। তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের পর স্বদেশে সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার কায়েম হবে। তবে সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। তিনি শুধু বলেছেন যে, এই সরকারের অধীনে জাতি-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে অবিমিশ্র স্বাধিকার ছাড়াও আর্থনীতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাঁর মতে আর্থনীতিক স্বাধীনতা বলতে বুঝায় সকলের শ্রমদানের সমান অধিকার এবং জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত শ্রমমূল্য প্রাপ্তির অধিকার। সমাজতান্ত্রিক ভারতে পরোপজীবী শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং অনর্জিত আয় বলে কিছু থাকবে না। তাছাড়া, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমুক্ত ন্যায়নীতি অনুসরণ করা হবে। উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এরূপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ণ সামাজিক সাম্য কায়েম থাকবে, সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং নারী-পুরুষের ব্যবধান দূর

---

৩ সৌরেন্দ্রমোহন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

www.pathagar.com

হবে। মোট কথা, জনগণের সমষ্টিগত জীবনের মূল ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা এবং প্রেম। সুভাষ বসু বিশেষ করে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দাসত্বকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছেন, কেননা উভয়ই মানুষের দুঃখদুর্দশা ও বিভিন্ন প্রকার অসাম্যের মূল কারণ। তিনি সমাজতন্ত্রের আদলে স্বদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু মার্কস্‌বাদী আদর্শ পুরোপুরিভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন, এদেশে মার্কসবাদী ভাবধারা উত্তাল তরঙ্গের মতো এসেছে সত্য এবং অনেকেই পরম উৎসাহে একে স্বাগত জানিয়েছে, তবে এদেশে মার্কস্‌বাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে তার প্রয়োগযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতের ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহমুক্ত হতে পারেন নি। প্রসঙ্গত তিনি রাশিয়ার বলশেভিকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি বলেন যে রাশিয়ার জনগণও মার্কস্‌বাদী আদর্শ গ্রহণকালে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, জাতীয় আদর্শ, দেশের সমস্যা ও দৈনন্দিন জীবনের দাবি ইত্যাদির কথা বিস্মৃত হয় নি। আজ কার্ল মার্কস্ বেঁচে থাকলে আধুনিক রাশিয়ার চেহারা দেখে তিনি সম্ভবত ক্ষুব্ধ হতেন। অতএব বিদেশী ও বিজাতীয় আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ এদেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে আসবে — বিপ্লব না বিবর্তনের পথে, সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত দেন নি। তাঁর মতে বিপ্লব ও বিবর্তনের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। বিপ্লব এক ধরনের বিবর্তন যা তুলনামূলকভাবে স্বল্পকালের পরিসরে পরিবর্তন ঘটায় ; অপর পক্ষে বিবর্তন এক প্রকার বিপ্লব যা ধীরে ধীরে ও দীর্ঘকাল ধরে পরিবর্তন আনে। উভয়ের মূলকথা একই ঃ পরিবর্তন বা একের জায়গায় অন্যের অধিষ্ঠান।

সুভাষ বসুর রাষ্ট্রচিন্তায় এক সময় ফ্যাসিবাদের প্রভাবও প্রকট ছিল। সম্ভবত তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ফ্যাসিবাদের জনক মুসোলিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইতালীর রাষ্ট্রিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ধারণা জন্মে যে ফ্যাসিবাদী পন্থায়ই অতি দ্রুত দেশের রাজনীতিক-আর্থনীতিক উন্নয়নপ্রয়াস সফল করা যায়। সুভাষ বসুর বিভিন্ন উক্তি থেকে তাঁর ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে নিচের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষণীয় ঃ

এক Superman-এর যে রূপ জার্মান দার্শনিক Nietzsche (নীটশে) দিয়েছেন ..... তা আপনারা অখণ্ড সত্য বলে গ্রহণ না করতে পারেন — কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষ্য জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দুই .....আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করতে পারলে — মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য — এক সুরে বাঁধা হবে।

www.pathagar.com

তিন অরাজকতা দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য মধ্য ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র নয়, (এজন্য দরকার) সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার।

চার সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হলে তথাকথিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা চলবে না।

পাঁচ ভারতবর্ষের রোগ একটা নয়। তার এত রকমের রাজনৈতিক ব্যাধি একমাত্র একজন নির্মম ডিক্টেটরই সারাতে পারেন।"[৪]

উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বুঝা যায় যে সুভাষ বসু ফ্যাসিবাদীদের ন্যায় Cult of Superman, অভিন্ন রাষ্ট্রিক আদর্শ, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা, একদলীয় সরকার, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি এবং একনায়কী শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার এরূপ ঢালাওভাবে সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি নিজেই আবার ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "হিটলারবাদের আমি বিরোধী, তা সে কংগ্রেসের মধ্যেই থাকুক বা অন্য দেশেই থাকুক। আমার মনে হয় হিটলারবাদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো সমাজতন্ত্র।"[৫] এছাড়া তিনি ফ্যাসিবাদীদের 'উগ্রতর সাম্রাজ্যবাদী' বলতেও দ্বিধা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে "তিনি ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু গুণ দেখেছিলেন এবং কমিউনিজমের মধ্যেও অনুরূপ কিছু গুণ প্রত্যক্ষ করে উভয়ের সমন্বয়ে এক স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করেন।"[৬]

জাতিবাদ

জাতিবাদকে সুভাষচন্দ্র সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে সংকীর্ণতা, স্বার্থান্বেষিতা ও আগ্রাসনবাদিতা জাতিবাদের মূল ভিত্তি হতে পারে না। তাছাড়া, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জাতিবাদ কখনো আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পথে বাধা সৃষ্টি করে না। জাতিবাদ এমন এক মহান আদর্শ যার মূলকথা ঃ সত্যম, শিবম, সুন্দরম। জাতিবাদই মানুষকে সত্যবাদিতা, সদাচার, পৌরুষ, মানবসেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। তবে জাতির লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শুভ ও অশুভ সম্পর্কে আমাদের সনাতন ধারণা ও মূল্যবোধের কিছু কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। অন্তত জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে বর্তমানের মামুলি জীবনপদ্ধতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। এছাড়া, জাতির সংকীর্ণতাবিবর্জিত উচ্চাশা

---

৪ সৌরেন্দ্রমোহন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

৫ সৌরেন্দ্রমোহন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

৬ ঐ, পৃ. ৩৯৮

www.pathagar.com

থাকা চাই, নইলে তার ধ্বংস অনিবার্য।[৭] অর্থাৎ, জাতির লক্ষ্য হওয়া চাই এই পৃথিবীকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যার ফলে মানবজাতি সুখে-শান্তিতে ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারবে। সুভাষ বসু প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন যে বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে হরেক রকমের জাতিগঠনমূলক কর্মসূচী ও সামাজিক-রাজনীতিক মতাদর্শের ছড়াছড়ি। এই মতাদর্শগুলির মধ্যে রয়েছে সমাজতন্ত্র, গিল্ড সমাজতন্ত্র, সিণ্ডিকালিজম, নৈরাজ্যবাদ, বলশেভিকবাদ, ফ্যাসিবাদ, সংসদীয় গণতন্ত্র, চরম রাজতন্ত্র, সীমিত রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি মতাদর্শ প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে বটে, তবে সুভাষ বসু মনে করেন, ভারতের জন্য এর কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশী ও বিজাতীয় মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান এদেশে কার্যকর হতে পারে না। একটি দেশের জাতীয় আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান সে দেশের ইতিহাস, আদর্শ ও জীবনপদ্ধতির আলোকে স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে ওঠে ; কাজেই সামাজিক বা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হলে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজীবনের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

সংবিধানের রূপরেখা

স্বাধীন ভারতের সংবিধান সম্পর্কে সুভাষ বসু তাঁর মনোভাবের কিছুটা আভাস দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বাধীন ভারত হবে একটি ফেডারেল রিপাবলিক। নতুন সংবিধানে মানবাধিকারের পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সংবিধানের ভূমিকায় মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের উল্লেখ থাকবে এবং প্রত্যেক নাগরিক সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করবে। স্বাধীন ভারতে দমনমূলক আইন বলে কিছু থাকবে না। সাধারণ নির্বাচন পরিচালিত হবে যুক্তনির্বাচন-পদ্ধতির ভিত্তিতে, তবে সাময়িকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন নি। তবে স্বতন্ত্র নির্বাচনকে তিনি একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী নন, কারণ তিনি এই পদ্ধতিকে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী মনে করেন।

সুভাষ বসু মনে করেন, ব্যুরোক্রেসি বা অমাত্যতন্ত্রের আধিপত্য কখনো রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের জন্য কল্যাণকর হয় না। সাধারণ নাগরিক সমাজ যাতে সরকারি আমলার হাতে নির্যাতিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য যা করণীয় তা হলো আমলাতন্ত্রের দুর্গ চূর্ণ করা। সুভাষ বসুর মতে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য স্বাধীনতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে হরতাল অসহযোগ, বয়কট, প্রতিরোধ আন্দোলন এবং এমন কি সংগ্রামের পথ অনুসরণীয়।

---

৭ Appadorai : প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৫

www.pathagar.com

সুভাষ বসুও শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নেতাজী বলে সম্বোধন করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু স্বাধীনতার যে শিখা তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তার দীপ্তি কখনো ম্লান হবে না।

www.pathagar.com

গণমুখী সংগ্রামী রাজনীতি

২৩
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
(১৮৮০-১৯৭৬)

এই উপমহাদেশে যে ক'জন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজীবন অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রণী। প্রতীকী অর্থে তাঁর সারা জীবন কেটেছে রণক্ষেত্রে। বাল্যকালে শুরু হয়েছে তাঁর জীবনসংগ্রাম এবং যৌবনে ও যৌবনোত্তর কালে এই সংগ্রামকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন কায়েমী স্বার্থচক্রের উপর প্রচণ্ড আঘাতের হাতিয়ার রূপে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও মানসিকতা তৈরি হয়েছিল তাঁর বাল্যকালের করুণ অভিজ্ঞতার সূত্রে।

তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা-শহরের অদূরবর্তী ধানগড়া গ্রামের এক অখ্যাত দরিদ্র পরিবারে ১২ ডিসেম্বর, ১৮৮০ সনে মওলানা ভাসানীর জন্ম।* সামান্য জমিজমা এবং একটি ছোট মুদি-দোকান থেকে যে সামান্য আয় হতো তা দিয়ে তাঁর পিতা হাজী শরাফত আলী খান কষ্টেসৃষ্টে সংসার-খরচ নির্বাহ করতেন। মওলানা ভাসানী বাল্যকালে পিতাকে এবং কৈশোরে মাতাকে হারান। উভয়ের মৃত্যুতে দরিদ্র পরিবারটির উপর সীমাহীন দুর্দশা নেমে আসে। এছাড়া পিতা ও মাতার মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দুটি সহোদর ভাই ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতামাতা ও দুই সহোদর ভাইকে হারিয়ে বালক আবদুল হামিদ ওরফে চেকা মিয়া চতুর্দিকে অন্ধকার দেখেন। এরূপ অসহায় অবস্থায় তাঁর চাচা ইব্রাহিম খান নেহাৎ দায়ে পড়ে তাঁকে আশ্রয় দান করেন। চাচার আশ্রয়ে থেকে আবদুল হামিদ স্থানীয় মাদ্রাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন। কিন্তু পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত এই বালকটি ছিল অশান্ত ও দুরন্ত স্বভাবের। স্থানীয় মাদ্রাসার সীমাবদ্ধ পরিসর অপেক্ষা অবারিত প্রান্তর, উন্মত্ত ষাঁড়ের লড়াই, লাঠি খেলা, যাত্রা, কবিগান ইত্যাদি তাঁর নিকট

---

* মওলানা ভাসানীর জন্মতারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি নিজের পাসপোর্টে যে তারিখটি উল্লেখ করেছিলেন সেটিই গ্রহণ করা হলো

www.pathagar.com

অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। বলা যায়, ফরাসী চিন্তাবিদ রুসোর মতো চেকা মিয়াও প্রকৃতির ক্রোড়ে স্বাধীনভাবে বড় হয়েছেন। উভয়ের জীবনে তেমন বাধাবন্ধন ছিল না। শুধু পার্থক্য এই যে আবদুল হামিদ বাল্যকালে লাঠিখেলা ধরেছিলেন, রুসো তা করেন নি। তাছাড়া, আবদুল হামিদের ন্যায় রুসো ধর্মীয় শিক্ষালাভ করেন নি।

সমাজচিন্তার স্ফুরণ

তরুণ বয়স থেকেই আবদুল হামিদ মুসলমান সমাজে বিদ্যমান আশরাফ-আতরাফের ব্যবধান ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছেন। চাচার আশ্রয়ে থাকাকালে কোন এক ভোজ-উৎসবে তিনি একটি গরীব বালককে আশরাফদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় বসিয়ে দেন। এই 'ধৃষ্টতার' জন্য তিনি চাচার হাতে লাঞ্ছিত হন।[১] আবদুল হামিদ তখন অভিমান করে চাচার গৃহ ত্যাগ করেন। এভাবেই তাঁর জীবনে শুরু হয় আশরাফের বিরুদ্ধে নিরাপোস সংগ্রাম। ধানগড়া ত্যাগের পর অভিমানী তরুণ কিছুকাল যাযাবর জীবন যাপন করেন। জীবন রক্ষার তাগিদে কামলা খেটে বা কুলিগিরি করে দিনাতিপাত করেন কিছুকাল। এ সময়ে জীবনের কঠিনতম দিকটি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়। সহায়হীন ভবঘুরে জীবনের দুর্দশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁর বেঁচে থাকার স্পৃহা প্রবলতর হয়ে ওঠে। বলা যায়, দুঃখময় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যেভাবে ইউটোপিয়ান সমাজবাদী যোসেফ প্রুধোঁর অন্তরে নতুন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ার প্রবণতা জাগ্রত করেছিল, একইভাবে তরুণ আবদুল হামিদও সেরকম একটি আদর্শ সমাজের স্বপ্ন নিজ অন্তরে সযত্নে লালন করেছিলেন।

সাধারণ মানুষের দুঃখজর্জরিত জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল বলেই উৎপীড়িত মানবতার ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন দরদী বন্ধুর মতো। তরুণ আবদুল হামিদ এক সময়ে ইরাকী আলেম শাহ নাসিরুদ্দিন বোগদাদীর আশ্রয় লাভ করেন। এই ধর্মপ্রচারক পীরের নিকট তিনি কোরআন-হাদিস বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। শাহ নাসিরুদ্দিন প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। পীর সাহেবের নিকট শিক্ষালাভের পর তিনি যুক্ত প্রদেশের দেওবন্দ মাদ্রাসায় কিছুকাল ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। আবদুল হামিদ দেওবন্দ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও অনেকদিন কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নি। ইসলাম প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছেন। এ সময়ে একবার বাগদাদেও গিয়েছিলেন। তিনি কিছুকাল আসামের জলেশ্বরে পীর সাহেব নাসিরুদ্দিনের আস্তানায় অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবনে কিছুটা স্থিতি আসে যখন বগুড়ার পাঁচবিবির একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও অসমসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে পাঁচবিবির জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী তাঁকে

১ সৈয়দ আবুল মকসুদ : ভাসানী (ঢাকা, ১৯৮১) পৃ. ৬১

www.pathagar.com

জমিদারি পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব দেন। কিন্তু শিক্ষকতা বা জমিদারি সংক্রান্ত কাজকারবার দেখাশুনার জন্য যে ধরনের মানসিকতা থাকা দরকার মওলানা ভাসানীর তা ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তিনি সকল বাধাবন্ধনের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তির সন্ধান করেছেন। কাজেই শিক্ষকতা বা জমিদারি সেরেস্তার সীমাবদ্ধ গণ্ডী তাঁকে বেশি দিন আবদ্ধ রাখতে পারে নি।

জমিদারি কার্যের সূত্রে তাঁকে প্রায়ই কলিকাতায় যেতে হতো। কলিকাতায় তিনি স্বরাজপন্থী কংগ্রেসকর্মী ও সন্ত্রাসবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। তাদের স্বাধীনতার আদর্শ স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। সন্ত্রাসবাদীদের স্বরাজবাদী আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সত্য, কিন্তু লুটতরাজের মাধ্যমে তাদের অর্থসংগ্রহের কৌশল তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এ কারণে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরে সারা উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে প্রায় সকল ভারতবাসী। উভয় আন্দোলনই ছিল ব্রিটিশবিরোধী। আসামের জলেশ্বরে অবস্থানকালে মওলানা ভাসানী খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলন সহজেই তাঁর অন্তরে সাড়া জাগায়, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে প্রথমত এর মাধ্যমে ইসলামের পূর্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং দ্বিতীয়ত এর আঘাতে ইংরেজ শক্তির পতন ঘটবে। খেলাফত আন্দোলনের সূত্রে তিনি মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ বরেণ্য নেতার সান্নিধ্যে আসেন। অপরদিকে স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে তাঁর পরিচয় ঘটে এ্যানি বেসান্ত, গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, চিত্তরঞ্জন দাস, লোকমান্য তিলক এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গে। ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে **রাওলাট আইন** পাস হওয়ার পর সারা উপমহাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী এই দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মওলানা ভাসানী তখন কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করেন। সে বছরই (১৯১৯ সন) প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। সেটাই ছিল তাঁর কারাবরণের প্রথম অভিজ্ঞতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে মওলানা ভাসানী সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সত্য, তবে বাংলার অভ্যন্তরেই তাঁর রাজনীতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রধান কারণ, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব অপেক্ষা বাংলার শোষিত মানবতার মুক্তিই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর কাছে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল পীড়াদায়ক। আশরাফ-

www.pathagar.com

আতরাফের প্রভেদ, ইংরেজ রাজশক্তির অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার, করভারে জর্জরিত কৃষক, মজুর, তাঁতী, কামার ও কুমারের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন তাঁর সংবেদনশীল ব্যক্তিমানসে গভীর রেখাপাত করে। বলা যায়, ইংলন্ডের ওয়াইক্লিফ ও বোহেমিয়ার জন হাস অথবা সতেরো শতকের ইংলন্ডীয় **লেভেলারস** আন্দোলনকারীরা যেভাবে সনাতন সমাজকাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে সাম্যবাদী সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, মওলানা ভাসানীর লক্ষ্যও তা থেকে ভিন্নতর ছিল না। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মওলানা ভাসানী লেখাপড়া করেছেন মাদ্রাসায়, কাজেই তাঁর জ্ঞানও কোরআন-হাদিস ও ইসলামী দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর আদৌ পরিচয় ঘটে নি। তাঁর সাম্যচিন্তার উৎস কোরআন ও হাদিস — য়ুরোপীয় রাষ্ট্রদর্শন নয়। উপরন্তু মাদ্রাসায় শিক্ষাগ্রহণকালেই তিনি ফরায়জি এবং ওয়াহাবিদের আদর্শিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ফরায়জি ও ওয়াহাবি নেতৃবর্গ শুধু ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দিকে মনোযোগী ছিলেন না, তারা শোষণকারী ও অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য যে ফরায়জিগণ প্রতিরোধ আন্দোলন করেছিলেন প্রধানত জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অপর দিকে ওয়াহাবিগণ যুদ্ধ করেছেন ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। উভয় আন্দোলনের প্রভাব মওলানা ভাসানীর ধ্যানধারণায় ক্রিয়াশীল ছিল একথা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায়। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করলেও দেখা যায় যে তিনি জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়াই করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণে তিনি সরকার কর্তৃক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিতাড়িত হয়েছেন।

কৃষক আন্দোলন

১৭৯৩ সনে ইংরেজ সরকার যে **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** কায়েম করে তার ফলে বাংলায় বহু ভুঁইফোঁড় জমিদারের সৃষ্টি হয়। একই সময়ে সৃষ্টি হয় সুদখোর মহাজন শ্রেণীর। উভয় শ্রেণীর অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ। শোষিত শ্রেণীর বন্ধু হিসাবে এগিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন, এমনকি কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় তাঁর নেতৃত্বে। রাজশাহীর ধূপঘাটের জমিদার, ময়মনসিংহের সন্তোষ ও গৌরীপুরের মহারাজা এবং পাবনার সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে যে কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তাতে মওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সময় থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ মোটামুটিভাবে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল — মওলানা ভাসানী এই আন্দোলনের স্রোত গ্রামবাংলায় প্রবাহিত করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের এই দুটি ধারাই পাশাপাশি চলতে থাকে।

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী কেবল কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি, নিরন্ন অশিক্ষিত কৃষকদের অধিকারসচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। কৃষক সম্মেলনের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, কামার, কুমারদের ন্যায়সঙ্গত দাবি শাসক শ্রেণীর নিকট তুলে ধরেছেন। তিনি এরকম একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসান চরে (১৯২৪ সন)। এই সম্মেলনে তিনি আসামে বসবাসকারী বহিরাগত বাঙালীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। ভাসান চরের সম্মেলনের সাফল্যের কারণেই তিনি **ভাসানীর মওলানা** নামে অভিহিত হন। এই সম্বোধনই শেষে রূপান্তরিত হয় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীতে। ভাসান চরের সম্মেলন ছাড়াও টাঙ্গাইলের কৃষক সম্মেলন (বাং ১৩৩৬ সন), সিরাজগঞ্জের বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন (বাং ১৩৩৭ সন), চারাবাড়ি ঘাটের কৃষক সম্মেলন (বাং ১৩৩৭ সন), কামরূপ জেলার বড়পেটার মুসলিম লীগ সম্মেলন (ইং ১৯৩৭), গাইবান্ধার কৃষক আন্দোলন ও সমাবেশ, ঘাগমারার সম্মেলন (বাং ১৩৩৮), মঙ্গলদই অন্দোলন, কাগমারী সম্মেলন (ইং ১৯৫৯), টাঙ্গাইলের কৃষক-খাতক সমাবেশ (ইং ১৯৪১) ইত্যাদিতে মওলানা ভাসানী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[২] এসব সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন মওলানা ভাসানী। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ স্বাভাবিকভাবেই কায়েমী স্বার্থচক্রকে শঙ্কিত করে তোলে। ইংরেজ সরকারও এ-দেশী শোষক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে নানা রকমের ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। অবশেষে তদানীন্তন বাংলার গবর্নর মওলানা ভাসানীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন (ইং ১৯২৬)।

লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি ১৯২৮ সনে স্বদেশ ত্যাগ করে আসামের ঘাগমারা অঞ্চলের এক হিংস্র শ্বাপদসংকুল অরণ্যে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন থেকে দীর্ঘকাল তিনি আসামে অবস্থান করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি আত্মগোপন করে থাকেন নি। তিনি প্রথম থেকেই মানবসেবা-কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, যার ফলে অচিরেই আসামের সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করেন। জনসমর্থনের জোরে তিনি এগারো বছর আসাম আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ সনে ভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চলতে থাকে উপদলীয় কোন্দল। তদুপরি মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী প্রমুখ খেলাফত নেতার সঙ্গে কংগ্রেসের মনোমালিন্য ঘটে। এই পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী অন্যান্য মুসলিম নেতার সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং অল্প কালের মধ্যে

২ মকসুদ, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-এর তৃতীয় অধ্যায়

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

তাঁর আসামের প্রবাসজীবন নির্বিঘ্নে কেটেছিল একথা মনে করার কারণ নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে জীবন ধারণের প্রয়োজনে তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন। ঘাগমারার গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি নির্মাণ করেছেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় ঘাগমারায় গড়ে উঠল জনপদ, প্রতিষ্ঠিত হলো বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বিপণীকেন্দ্র। হামিদাবাদ নামে পরিচিত হলো নতুন জনপদ। কিন্তু মওলানা ভাসানী আবার নতুন চক্রান্তের শিকারে পরিণত হন। ইংরেজ রাজপুরুষের সঙ্গে বাঙালী বাবুগণ একজোট হয়ে আসাম থেকে বাঙালী মুসলমান উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। প্রসঙ্গত একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> অনাবাদী ও জলাভূমি আবাদের জন্য মুসলিম চাষীদের প্রয়োজন ছিল। অমৃতবাজারের দেবব্রত মজুমদার লিখেছিলেন, 'বর্বর ময়মনসিঙ্গাদের আগমনে আসামে ভদ্রলোকদের বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে।' জনশক্তির অভাব ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাই আসামে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা। এ অবস্থায় মিঃ মুলান নামে এক ইংরেজ রাজপুরুষ আসামে সরকারের রেভিনিউ সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বললেন, 'বহিরাগতরা পঙ্গপালের মতো আসাম আক্রমণ করছে। এতে আসামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য বিলুপ্ত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে।' ইংরেজ রাজপুরুষ একটি বিষয়ের সূত্রপাত করলেন এবং আমাদের পরিচিত বাঙালী বাবু সমাজ তার পেছনে দোহার ধরলেন।[৩]

আসামে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ রাজপুরুষ ও বাঙালী বাবুদের এরূপ হেয় মনোভাবই প্রকৃতপক্ষে **লাইন প্রথার** উৎস। বাঙালী মুসলমানদের অস্তিত্ব আসাম থেকে উৎখাত করার অভিসন্ধিতে আসামের বড়দলই (শ্রী গোপীনাথ বড়দলই) সরকার ১৯৩৭ সনে **লাইন প্রথা** নামে সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক আইন জারি করে। এই আইনের বলে সরকার কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের প্রথা নিষিদ্ধ করে দেয়। যারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আসামে বসতি স্থাপন করেছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হলো। এই সীমারেখা বা **লাইনের** বাইরে কোন জমি ভোগদখলের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হলো। লাইন প্রথার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বৈষম্যমূলক 'স্বতন্ত্র অবস্থান' নীতির (Apartheid) তুলনা করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা যেরকম শ্বেতাঙ্গদের বসতিতে প্রবেশের বা বসবাসের অধিকার পায়

---

৩ নূরুর রহমান-এর নিবন্ধ, সপ্তাহিত বিচিত্রা (১২ জুলাই, ১৯৮৫, ঢাকা)

www.pathagar.com

না, আসামের বড়দলই সরকারও অনেকটা সে রকম উদ্দেশ্য নিয়েই 'লাইন প্রথা' জারি করে। এই পরিস্থিতি আরো শোচনীয় আকার ধারণ করে স্থানীয় ভূস্বামী ও সুদখোর মহাজনদের প্ররোচনার ফলে। তারা শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী অসমিয়াদের উত্তেজিত করে বাঙালী কৃষকদের বিরুদ্ধে। সরকার ও স্থানীয় অসমিয়ারা মঙ্গলদই, গৌহাটি প্রভৃতি স্থানে **বাঙ্গাল খেদা** আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনকারীদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে বাঙালী কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী এগিয়ে আসেন। তখন থেকে শুরু হয় তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম — প্রতিরোধ আন্দোলন। বৈষম্যমূলক লাইন প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করেন, তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন সরকারের নিকট, এমন কি বিদ্রোহের হুমকি দেন। মওলানা ভাসানীর প্রবল গণআন্দোলনের চাপে আসাম সরকার বাধ্য হয়ে লাইন প্রথা তুলে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৪৫ সনের ২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার সা'দুল্লাহ ঘোষণা করেন, "আসাম থেকে লাইন প্রথা তিন বছরের জন্য বিলোপ করা হবে। .....সরকার সমুদয় অকর্ষিত জমির ত্রিশ শতাংশ সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য রেখে অবশিষ্টাংশ আদি অধিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"[৪]

পাকিস্তান আমলের রাজনীতি

লাইন প্রথা-বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়। মওলানা ভাসানী পাকিস্তান দাবির সমর্থনে জোর প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। পাকিস্তান অবশ্য জন্মলাভ করল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সিলেটের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে। সে সময় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে মওলানা ভাসানী যেরূপ অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন তার ফলেই সিলেটবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে যোগদান করে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই আসামের বড়দলই সরকার মওলানা ভাসানীকে সিলেট সীমান্তে এনে ছেড়ে দেয়। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, পাকিস্তানে তাঁর আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল যে সময় যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিকশিত হবার সম্ভাবনা ততই ক্ষীণতর হচ্ছে। সামরিক বাহিনীর জেনারেলগণ এবং আমলাচক্র ক্রমবর্ধমান মাত্রায় রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের কুক্ষিগত করতে থাকে। তারফলে জাতীয় সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার অংশগ্রহণের সুযোগ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। তাছাড়া, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কতিপয়

৪ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

www.pathagar.com

পুঁজিপতি ও শিল্পপতির প্রভাব-প্রতিপত্তি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে। এর সূত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি হলো। মওলানা ভাসানী সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ক্রমান্বয়ে ধূলিসাৎ হতে থাকে। এ অবস্থায় তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে উপলব্ধি করেন যে পাকিস্তানের দুই অংশের স্থায়ী বিচ্ছেদ অনিবার্য। তিনি কাগমারী সম্মেলনে (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭) পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে 'সালাম আলাইকুম' জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ইংগিত দেন।[৫]

১৯৫৪ সনে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা চলে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে যে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হয় মওলানা ভাসানী ছিলেন তার অন্যতম নেতা। সে বছর পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার শাসকচক্রের দুর্গ চূর্ণ করে দেয়। এই নির্বাচনে মাত্র ৯টি আসন বাদে সবগুলিই যুক্তফ্রন্ট দখল করেছিল।* কিন্তু এ সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের ক্ষমতালিপ্সা আদৌ অবদমিত হয় নি। তাদের অনমনীয়তা লক্ষ্য করে মওলানা ভাসানী সামরিক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। সামরিক শাসন তিনি নিদার্হ মনে করেছেন বলেই জেনারেল আইয়ুবের শাসনের বিরোধিতা করেছেন আগাগোড়া। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে তিনি জেনারেল আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পূর্ণ সমর্থন দান করেন। তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর **ঘেরাও আন্দোলনের** রাজনীতি। মওলানা ভাসানীর সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের শাসকচক্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার দিকে মনোযোগ দেন নি, যে কারণে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পাকিস্তান ভেঙে যায় এবং ন'মাসের মুক্তি সংগ্রামের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

স্বাধীন বাংলাদেশে

স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি স্বস্তিবোধ করেছিলেন একথা মনে করার কোন কারণ নেই। শাসকচক্রের ক্ষমতালিপ্সা, দুর্নীতি এবং অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাঁকে একাধিক বার দুর্নীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অগ্নিমূল্যের বিরুদ্ধে **ভুখ মিছিল** ও **অনশন ধর্মঘটের** নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। এ ছাড়া প্রবল প্রতিবেশী শক্তি ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার পরিকল্পনা

---

৫ কাগমারী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭)

* এ বিষয়ে এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সংক্রান্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

বাস্তবায়িত করাতে মওলানা ভাসানী বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হন। তার বিরুদ্ধে তিনিই প্রবল প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি ফারাক্কা মিছিল (১৬ মে, ১৯৭৬) পরিচালনা করেন। রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান থেকে কানসাট সীমান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ একানব্বই মাইল মিছিলেন সঙ্গে অতিক্রম করেন। ফারাক্কা লং মার্চ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই লং মার্চ শুধু বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন পায় নি, বিশ্ববিবেককেও নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। এখানেই ফারাক্কা মিছিলের সাফল্য। তারপর তিনি আর বেশীদিন বাঁচেন নি। ফারাক্কা মিছিলের মাত্র ছ'মাস পর — ১৭ নভেম্বর, ১৯৭৬ এই রণক্লান্ত মহাবীর ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভাসানীর রাজনীতি ঃ আদর্শ ও পদ্ধতি

মওলানা ভাসানী স্বীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যান নি। সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে কিছু সংখ্যক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে হক কথা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাবলী, সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং বিশেষত তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে তাঁর রাজনীতিক মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করাও সহজসাধ্য কাজ নয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে মওলানা ভাসানী ছিলেন মূলত সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। সমাবেশ, সম্মেলন ও আন্দোলন ছিল তাঁর প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার। তিনি সম্মেলনকে ব্যবহার করেছেন কর্মপন্থা নির্ধারণ ও জনসাধারণের অধিকারসচেতনতা সৃষ্টির কাজে এবং আন্দোলনকে ব্যবহার করেছেন অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে। তবে তাঁর সম্মেলন বা আন্দোলনের রাজনীতি প্রধানত দরিদ্র, নিপীড়িত কৃষক সমাজের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল। যেখানেই কায়েমী স্বার্থ তাঁর কৃষকমুক্তি আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করেছে সেখানেই তিনি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন। ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে কৃষক বিদ্রোহের সংগ্রামী নেতা ছিলেন তিতুমীর। মওলানা ভাসানী প্রধানত তিতুমীরের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর রাজনীতিক পদ্ধতিকে সহিংস বা হিংসাত্মক বলা যায় না। তিনি বলেন ঃ

> ....রাজনীতি হইতেছে এমন একটি মহৎ কর্মপ্রয়াস যাহার লক্ষ্য সমাজ হইতে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা ঃ সমাজে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, বাকস্বাধীনতা তথা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা।[৬]

---

৬ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মেলন বা অহিংস আন্দোলনের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন সত্য, তবে প্রয়োজনবোধে সহিংস পন্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মোকাবেলা করা অন্যায় মনে করেন নি। তাঁর নিজের উক্তিই এ কথার প্রমাণ ঃ

> সত্যিই আমি হিংসার অবতার। জালেমের বিরুদ্ধে, শোষকের বিরুদ্ধে হিংসার আগুন আমি জ্বালিয়ে যাব ; সে আগুনে তাদের বিলাসের প্রাসাদ পুড়িয়ে ছারখার করে যাব। এজন্যই আমার জন্ম, এজন্যই আমি রাজনীতিতে এসেছি।[৭]

প্রকৃতপক্ষে **জ্বালাও, পোড়াও ঘেরাও**-এর রাজনীতির সূত্রপাত করেছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আন্দোলনের পথে নেমেছেন। তাছাড়া, কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের আগে ওই পদক্ষেপের অনুকূলে জনসমর্থন আছে কিনা তা যাচাই করে নিয়েছেন। সুতরাং **জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও**-এর পদ্ধতির প্রেক্ষিতে যদি মওলানা ভাসানীকে ফ্রান্সের এনার্কো সিন্ডিকালিস্ট' বা নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে তুলনা করা হয় তা হলে ভুল হবে। তাঁর উক্তি থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ "বিপ্লব শুধু বন্দুক দিয়ে হয় না, গণশক্তির জোরে প্রবল জনমত দ্বারাও বিপ্লব সাধিত হতে পারে।"[৮]

উপরের উক্তিসমূহে ভাসানীচিন্তার মৌলিক আদর্শসমূহ সুপরিস্ফুট। রাজনীতিকে তিনি একটি মহৎ কর্মপ্রয়াস বলে উল্লেখ করেছেন, যার লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করে মানুষের কল্যাণ বিধান করা। মওলানা ভাসানী উপলব্ধি করেন যে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে বিদ্যমান সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে। একমাত্র শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজেই সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। তিনি আজীবন সাম্যবাদী আদর্শ সমুন্নত রাখলেও মার্কস্‌বাদী তত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে মার্কস্‌বাদীর কাছে আত্মা ও আধ্যাত্মিক শক্তির কোন মূল্য নেই। তাদের কাছে বস্তু ও বস্তুগত শক্তিই প্রধান। তারা বস্তুগত শক্তিকে প্রাধান্য দেয় বলেই মার্কসীয় সমাজে প্রাণের স্পর্শ খুঁজে পাওয়া ভার। সেখানে বস্তুগত শক্তিই মানবসত্তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

মওলানা ভাসানীর **রবুবিয়াতের** আদর্শের মূলে উপর্যুক্ত ধারণাই প্রধানত ক্রিয়াশীল ছিল মনে হয়। তিনি বলেন ঃ

> এই পার্থিব জীবনে খাওয়াপরার সংস্থানের পরও মানুষের অপর একটি চাহিদা থাকিয়া যায়। তাহা হইল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। উহা সংসারজীবনে সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, সৃষ্টিজগতের রহস্য, সামাজিক-পারিবারিক বন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিরাজ

---

৭ ফিরোজ আল মুজাহিদ, **মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন** (ঢাকা, ১৯৮২) পৃ. ৮৩

৮ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

www.pathagar.com

করিতেছে। কমিউনিস্টরা অদৃশ্য ও ভাবমূলক জীবনবোধের ধার ধারে না। তাই তাহারা মানুষের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ করিতে পারে নাই।[৯]

মার্কস্-এর ন্যায় মওলানা ভাসানী সমাজবাদী আদর্শ প্রচার করলেও উভয়ের সমাজবাদী চিন্তা অভিন্ন ছিল না। মার্কস্ ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আদর্শ বর্জন করে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাঁর সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন ; অপর পক্ষে, মওলানা ভাসানীর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মের কোন সংঘাত নেই। বরং ধর্ম ও সমাজবাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় বিধানের প্রয়াস পেয়েছেন মওলানা ভাসানী। মনে রাখা আবশ্যক যে মওলানা ভাসানী কৈশোরে ও যৌবনে ছিলেন মাদ্রাসার ছাত্র। তিনি প্রধানত কোরআন-হাদিস চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষাজীবন কাটিয়েছেন ; কাজেই তাঁর সমাজবাদী আদর্শ ইসলামী আদর্শের রঙে রঞ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। কোরআন-হাদিস ছাড়াও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা হাসরত মোহানী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মওলানা আজাদ সোবহানী। এঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি **রবুবিয়াত** অর্থাৎ বিধাতার পালনবাদের ভিত্তিমূলে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ

> আমার বিশ্বাস একমাত্র রবুবিয়াতের দর্শনই জাতি ধর্ম মতবাদ নির্বিশেষে শান্তি দিতে পারে। সবারই লক্ষ্য যদি স্রষ্টা হয়, সকল সমস্যার সমাধানকল্পে যদি স্রষ্টার নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তবে হানাহানির অবকাশ কোথায়? স্রষ্টার নিকট তো সবাই সমান। তিনি একই বিধানে সকলের নিকট দাতা, দয়াময়, প্রেরণাদানকারী — এক কথায়, সকল চেতনার উৎস।[১০]

মওলানা ভাসানী শুধু মুসলিম সম্প্রদায়কে মনে রেখে **রবুবিয়াতের** আদর্শ প্রচার করেন নি। সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মানসিকতাকে কখনো আচ্ছন্ন করে নি। সকল ধর্মাবলম্বীকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। 'রবুবিয়াতের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

> রবুবিয়াত কোন ধর্মের কথা নহে। উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান। তাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রস্টান সকল মানুষের জন্য হুকুমতে রব্বানিয়া অর্থাৎ, যে দেশে রবুবিয়াতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কায়েম হইয়াছে, তাহা কল্যাণকর বৈ কিছু নয়। মুসলমানদের জন্য যিনি রব বা পালনকর্তা, বিবর্তনকারী প্রভু — হিন্দুর জন্যও তিনি একই বিধানে আলো-হাওয়া, ফল, পানি, বস্ত্র, খাদ্য সবই যোগাইতেছেন। একমাত্র রবুবিয়াতের আদর্শই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিতে পারে।[১১]

---

৯ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১০ ঐ, পৃ. ২৭
১১ ঐ, পৃ. ২৯

www.pathagar.com

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে য়ুরোপে খ্রীস্টান ধর্মগুরু সেন্ট অগস্তিনও **সিটি অব গড** বা আল্লাহ্‌র রাজ্য কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তাঁর **সিটি অব গড**-এ অখ্রীস্টানদের স্থান ছিল না ; অপর পক্ষে মওলানা ভাসানীর **হুকুমতে রব্বানিয়ায়** সকল ধর্মাবলম্বী সমান অধিকার ভোগের অধিকারী। উপরন্তু সেন্ট অগস্তিন পার্থিব বিশ্বকে শয়তানের রাজ্য বলে অভিহিত করেন এবং তিনি মনে করেন যে গির্জার শাসন যতই ব্যাপকতর হবে ততই **সিটি অব গড**-এর বাস্তবায়ন ঘটবে।[১২] সেন্ট অগস্তিন ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে অগস্তিন যেভাবে গির্জা-রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছিলেন, অনুরূপভাবে মওলানা ভাসানী মসজিদ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ওকালতি করেন নি। তাছাড়া অগস্তিনের মতো মওলানা ভাসানী পার্থিব রাষ্ট্রকে ঢালাওভাবে শয়তানের রাজ্য বলেন নি। তবে মওলানা ভাসানী পার্থিব রাজ্যকেও খোদায়ী রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করা সম্ভব বলে মনে করেন। পার্থিব রাজ্য যদি আল্লাহ্‌র ন্যায়ানুগ বিধান পালন করে তাহলে, তাঁর মতে, শুধু মানবসমাজের শ্রেণীবৈষম্যই দূরীভূত হবে না, গোটা শাসনব্যবস্থাই মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে।

গণতন্ত্রচিন্তা

গণতন্ত্র, বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রকে মওলানা ভাসানী শ্রেষ্ঠ সরকারব্যবস্থা মনে করেন। সম্ভবত তিনি দীর্ঘ এগারো বছর আসাম আইনসভার সদস্য থাকাকালে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং তৎকালীন উপমহাদেশের অনেক রাজনৈতিক নেতার গণতান্ত্রিক মতাদর্শ তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল বলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তবে তাঁর গণতন্ত্র জনগণের গণতন্ত্র। তিনি বলেন ঃ

> গণতন্ত্রের নিয়ম — যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা সংখ্যায় বেশি, তারাই দেশ শাসন করবে, পরিচালনা করবে। এই দেশে কৃষক মজুরের সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। তারাই এদেশের শাসক হতে পারে। অন্য কেউ নয়।[১৩]

মওলানা ভাসানীর গণতন্ত্রচিন্তা ব্যাখ্যা করলে মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রের সাতটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তা হলো ঃ

এক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে ;

দুই যুক্তনির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচিত হয় ;

তিন আইন পরিষদ ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষা করে ;

---

১২ Sabine, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

১৩ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০

www.pathagar.com

চার সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে না ; আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে ;

পাঁচ প্রত্যেক নাগরিক চলাচল, বাক-স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে সভাসমিতি অনুষ্ঠান, সমিতি গঠন, গণমিছিল পরিচালনা ও ধর্মঘট পালনের পূর্ণ অধিকার ভোগ করে ;

ছয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয় না ;

সাত সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারীপুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে।

মওলানা ভাসানী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা অস্বীকার করেন নি। তবে রাজনৈতিক দল যদি দুর্নীতি, ক্ষমতালোলুপতা ও কায়েমী স্বার্থকে আশ্রয় করে চলে তাহলে তার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ রকম রাজনৈতিক দল সাধারণত গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে। মওলানা ভাসানী নিজেও একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যখনি তিনি নিজ দলের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও কায়েমী স্বার্থচক্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন সেই মুহূর্তে দলত্যাগ করে আবার নতুন দল গঠনে ব্রতী হয়েছেন।

মওলানা ভাসানী কখনো গণতন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন প্রধানত এই কারণে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ এবং ক্ষমতা ত্যাগের সর্বাপেক্ষা সুসভ্য পন্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন।

আর্থনীতিক গণতন্ত্র

মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক গণতন্ত্র অপেক্ষা আর্থনীতিক গণতন্ত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে শোষিত জনগণের মুক্তি এবং কায়েমী স্বার্থচক্রের ধ্বংস ব্যতিরেকে গণতন্ত্র সার্থকতা লাভ করে না। অর্থাৎ, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্বশর্ত আর্থনীতিক গণতন্ত্র। তিনি কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, পিয়ন, আর্দালী প্রভৃতি শোষিত শ্রেণীর আর্থনীতিক মুক্তির জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁর আন্দোলনের প্রধান বুলি ছিল ঃ **লাঙ্গল যার জমি তার**। তিনি বলেন ঃ

> এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে এ সবেরই সার্বভৌম অধিকারী হচ্ছেন রাব্বুল আলামিন। আর মানুষ হলো এ দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি খলিফা। এই ভিত্তিতেই জমির উপর মানুষের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে মানুষ লাঙ্গল চালায় জমির অধিকারী[১৪]

১৪ নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

আর্থনীতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী একটি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই পরিকল্পনার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

এক প্রতি গ্রামে কৃষক সমিতি, ইউনিয়ন কৃষক সমিতি এবং জেলাকৃষক সমিতি গঠনের মাধ্যমে 'কৃষক মজুর রাজ' কায়েম করতে হবে ;

দুই দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার পুঁজি বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে জাতীয়করণ করতে হবে ;

তিন অবৈধ পথে যারা অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছে ভোটারতালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দিতে হবে ;

চার ব্যাংক, বীমা, কুটিরশিল্প, বৃহৎ শিল্প, যানবাহন ইত্যাদি জাতীয়করণ করতে হবে ;

পাঁচ "শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক ইউনিয়নকে একটি কেন্দ্র স্বীকার করে — সেটা পঞ্চায়েত বোর্ড হোক, সেই ইউনিয়নে যা উৎপাদন হবে বা মোট আয় (gross income) হবে তার মধ্যে সরকারের থাকবে শুধু পাঁচ ভাগ এবং বাকী ৯৫ ভাগ সেই কেন্দ্রকে দিতে হবে। সেই কেন্দ্রে যারা মেহনত দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে অথবা কোন ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা স্থাপন করে লভ্যাংশ অর্জন করে, একমাত্র তারাই হবে তার অংশীদার।...যারা আঠারো বছর বয়সের কম অথবা পাঁচ বছর বয়সের উর্ধ্বে — মেয়ে হলে পঞ্চাশ বছরের উর্ধ্বে, তাদের পেনশন দিতে হবে। জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের খোরাক-পোশাক-চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব পঞ্চায়েত বোর্ড গ্রহণ করবে। যারা নাবালক, নাবালিকা তাদের প্রতিপালনের জন্য এবং বৃদ্ধ, invalid, অন্ধ, পঙ্গু মজুরদের প্রতিপালনের জন্য নির্ধারিত হবে আয়ের শতকরা ত্রিশ ভাগ। এবং বাকী ৬৫ ভাগ income সেই পঞ্চায়েত বোর্ডের অধীনে যারা বাস করে — শুধু বাস করে না, শরীরে খেটে পরিশ্রম করে ফসল উৎপন্ন করে — সে মেয়ে বা পুরুষ হোক, তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।"[১৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে য়ুরোপীয়, বিশেষত ফরাসী ইউটোপিয়ান সমাজবাদীরাও এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার্লস ফুরিয়ের-এর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু সমবায়-পল্লী। সমবায়-পল্লীর যে রূপরেখা তিনি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক, অবাস্তব। কিন্তু মওলানা ভাসানী আজীবন সাধারণ মানুষের কাছে কাছে ছিলেন যে কারণে তাদের জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। সাধারণ মানুষের

১৫ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

www.pathagar.com

কল্যাণার্থে তিনি একটি বাস্তবসম্মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা একটি দুরূহ কাজ সে কারণে মওলানা ভাসানী তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

রাজনীতিতে আবেগ ও ভাবালুতা

মওলানা ভাসানীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি ফরাসী দার্শনিক রুসোর ন্যায় রাজনীতিতে অনুভূতি ও আবেগের প্রবাহ সঞ্চারিত করেছেন। এ কথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বেলাতেও সত্য। জিন্নাহ ও ভাসানীর রাজনীতিক চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র — হয়তোবা বিপরীতমুখী। জিন্নাহর রাজনীতি ছিল "একটি দাবা খেলার মতো ব্যাপার — সে বুদ্ধির, চালের, কৌশলের। অপরটি সংগ্রামের, সাধনার, জেলের, জুলুমের, অনশন ধর্মঘটের। জিন্নাহ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ রাজনীতিতে বাজে ভাবালুতা ও আবেগের স্থান নেই ...রাজনীতি হলো দাবা খেলা...তার জন্য প্রয়োজন পরিশ্রম, সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।"[১৬] অপরপক্ষে "মওলানার রাজনীতিতে আবেগের ও অনুভূতির অভাব কোনদিন হয় নি। বরং এটাই সত্য কথা যে তিনি এ দেশের আবেগের প্রতিনিধি। আবেগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আবেগকে সংগঠিত করে রূপ দিয়েছেন রাজনীতিতে।"[১৭] যুক্তিসম্মতভাবে বলা যায় যে রাজনীতিতে আবেগ ও অনুভূতির প্রবাহ সঞ্চারিত করে মওলানা ভাসানী অতি সহজেই জনগণের অন্তরে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের এটাই অন্যতম কারণ।

ভাসানীচিন্তার মূল্যায়ন

মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও রাজনীতিক মতাদর্শ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। বিশেষত মার্কস্‌বাদী রাজনীতিবিদগণ তাঁর রাজনীতির তীব্র সমালোচক। তাঁদের যুক্তিঃ প্রথমত, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একটি সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী দল হিসাবে জন্ম নেয় সত্য, কিন্তু এই দলটি বিদ্যমান ধনবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বা উচ্ছেদের ব্যাপারে তেমন সংগ্রামী কর্মসূচী গ্রহণ করে নি। এই দল (ন্যাপ) শুধুমাত্র জোতদারী, মহাজন প্রথার বিলোপের এবং 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই দাবি উচ্চারণ করেছিল বলেই এদেশের কৃষকসমাজের কিছুটা আস্থাভাজন হয়েছিল, কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তেমন ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানী নিজে কখনো সংগ্রাম সংগঠিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। মার্কস্‌বাদীদের মতে, "একমাত্র কৃষিবিপ্লবের

---

১৬ ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, **মওলানা ভাসানী**, আরেফিন বাদল সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৯৭৭)
১৭ চৌধুরী, ঐ, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

মাধ্যমেই পূর্ব বাংলা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এবং মুৎসুদ্দি আমলাপুঁজির শোষণমুক্ত হতে পারে এবং জাতিগত নিপীড়নের মূলোৎপাটন করে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারে।"[১৮]

দ্বিতীয়ত, মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হয়েও এক সময় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে এ দেশের জন্য মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্র অনুপযোগী। তার পরিবর্তে তিনি ইসলামী সমাজতন্ত্র কায়েম করার কথা বলেন। মার্কস্‌বাদী লেখকগণ এর সমালোচনা করে বলেন ঃ

> মওলানা সাহেব ভালভাবেই জানেন, ইসলামী অনুশাসনে কোথাও উৎপাদন এবং সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদের কথা বলা হয় নি। ...তবু কেন তিনি ধর্মকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনছেন? সমাজতান্ত্রিক দেশে ধর্ম যাপনের অধিকার এবং সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণীর আদর্শগত ও রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। ইহা স্বাভাবিক যে শোষিত শ্রেণীসমূহ শোষক শ্রেণীকে ঐ ধরনের সুযোগ দিতে পারে না। তবে কি মওলানা সাহেব গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথরোধ করার জন্য এই দেশের ধর্মভীরু শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনতার কাছে ইসলামী সমাজতন্ত্রের আদর্শ তুলে ধরেছেন যার অন্তর্বস্তু হলো ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। বলা বাহুল্য তাঁর কল্পিত ইসলামী সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র নয়, এমন কী ধনতন্ত্রও নয়। তাঁর বহুল ঘোষিত সমাজব্যবস্থা বর্তমান আধা ঔপনিবেশিক এবং আধা-সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এক নতুন প্রতিক্রিয়াশীল সংস্করণ।[১৯]

তৃতীয়ত, মওলানা ভাসানী সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার উপায় হিসাবে শুদ্ধি অভিযানের কথা বলেন। ঘুষখোর, চোরাকারবারী, চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজ আমলা, সি. আই. এ. এজেন্ট এবং ভারতের সম্প্রসারণবাদী দালালেরা ছিল তাঁর শুদ্ধি অভিযানের আসল লক্ষ্য। মওলানা ভাসানীর প্রধান দুর্বলতা এই যে তিনি সমাজদেহের ব্যাধির মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নি। শুধু শুদ্ধি অভিযান দ্বারা সমাজদেহকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় না। যে সমাজব্যবস্থা দুর্নীতির জন্ম দেয়, দুর্নীতি লালন করে, তার আমূল সংস্কার ব্যতিরেকে দুর্নীতি রোধ করা যায় না এ কথা তিনি কতখানি উপলব্ধি করেছিলেন বলা কঠিন। মার্কস্‌বাদীদের মতে মওলানা ভাসানী গ্রামাঞ্চলের ভূস্বামী, জমিদার, জোতদার, মহাজন — যারা সমাজকে শোষণ করে আসছে, তাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে কোন কর্মসূচী গ্রহণ না করে শুধু শুদ্ধি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, যা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস, মওলানা ভাসানী জোতদারী, মহাজনী প্রথার বিলোপের ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি "জোতদারী মহাজনী প্রথা উচ্ছেদের

---

১৮ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮
১৯ ঐ, পৃ. ৩৫০

www.pathagar.com

প্রশ্ন সব সময় সযত্নে এড়িয়ে গেছেন এবং কৃষকদের খাজনা ট্যাক্স হ্রাস, পাট, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য, হাটতোলা বিলোপ ইত্যাদির কথাই বলেন। আসলে তিনি কৃষকদের উপর শোষণের বোঝা কিছু পরিমাণে লাঘব করে গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদী প্রথা বজায় রাখতে ইচ্ছুক। সংস্কারবাদী শোষণের পথে তিনি কৃষিবিপ্লবের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন।"[২০]

চতুর্থত, মওলানা ভাসানী কৃষক মজুর রাজ কায়েম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কৃষক বিপ্লবের পথ অনুসরণ করেন নি। তিনি অগ্রসর হয়েছেন সর্বদলীয় সম্মেলন ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য, এ পথে শুধু বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা যায়, কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা যায় না। একারণে মার্কস্‌বাদীরা তাঁকে প্রতিবিপ্লবী, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল বলতে কুণ্ঠিত হন নি।

এসব বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গোড়া থেকেই তাঁর "রাজনীতি ছিল গণমুখী ও সংগ্রামমুখী। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রারম্ভেই বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন মওলানার রজনীতির চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। তাঁর আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী ভূমিকার মূলে ছিল কৃষক–জনতার স্বার্থ ও সংগ্রাম। মওলানা ছিলেন গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও সরকারবিরোধী রাজনীতির জনক। .....মওলানা জীবনভর স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ–আধিপত্যকে প্রতিহত করেছেন.....তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে তিনি কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন, গণমানুষের কাছে সমাজতন্ত্রের ধ্বনি পৌঁছিয়েছেন।"[২১] সুতরাং মওলানা ভাসানীকে যাঁরা কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী বলে সমালোচনা করেন তাঁরা আদতে তাঁর প্রতি অবিচার করে আসছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, মওলানা ভাসানী তাত্ত্বিক নন, তিনি মূলত সংগ্রামী নেতা। যেখানেই অন্যায় ও দুর্নীতির ফণাবিস্তার লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তা প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন। এক কালে যাঁরা তাঁর সংগ্রামের সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা যখন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছেন মওলানা ভাসানী তখনি তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, এমনকি প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হীন ষড়যন্ত্রের ফণা উদ্যত হতে দেখেও তিনি কখনো শঙ্কিত হন নি। এর কারণ, তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবল আশাবাদিতা তাঁকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন ঃ

> ..... দুনিয়ার শোষকদের শোষণের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। আজ আমি যুদ্ধবিগ্রহহীন একটি শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ নতুন পৃথিবীর অভ্যুত্থান অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছি।[২২]

---

২০ মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

২১ সিরাজুল হোসেন খান, মওলানা ভাসানী, আরেফিন বাদল সম্পাদিত, (ঢাকা, ১৯৭৭) পৃ. ২৪

২২ খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ভাসানী যখন ইউরোপ, (ঢাকা, ১৯৭৮) পৃ. ৬ উদ্ধৃতি

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি

২৪

শেখ মুজিবুর রহমান
(১৯২০--১৯৭৫)

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৭ মার্চ, ১৯২০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান সিভিল কোর্টের সেরেস্তাদার ছিলেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান শেখ মুজিব বাল্যকাল থেকেই কিছুটা অশান্ত এবং মুক্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি কখনো বাধাবিপত্তি এড়িয়ে চলেন নি, বরং তার মোকাবেলা করেছেন পরম সাহসিকতার সঙ্গে। স্কুল ও কলেজ-জীবনে তিনি পড়াশুনার প্রতি তেমন মনোযোগ দিয়েছেন বলে জানা যায় না, কারণ বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার চেয়ে সংগ্রামী রাজনীতিক জীবনের প্রতি তিনি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করতেন। তিনি কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ. পাস করার পরই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

রাজনীতিক জীবন

রাজনীতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ কর্মী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সনে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং ওই বছরই শেখ মুজিব উক্ত দলের যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন। এ সময় থেকে তিনি নবোদ্যমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা ও বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তৎকালীন সরকার সুনজরে দেখেনি যেজন্য বারংবার তাঁকে বন্দিদশা বরণ করতে হয়েছে।

১৯৫২ সনে কারামুক্তির পর তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তাঁর নিরলস প্রয়াসের ফলে অচিরে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে থেকে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং মওলানা মোহাম্মদ আলীর ভাবাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে নেতাজী সুভাষ বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়াস তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

কলেজজীবন থেকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল প্রধানত নিষ্ঠাবান কর্মীর। ভাষা আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে তিনি ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে এদেশের রাজনীতির পুরোভাগে চলে আসেন। যুক্তফ্রন্টের (১৯৫৪ সন) আন্দোলনের সময় থেকে তিনি শেরে বাংলা, মওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আতাউর রহমান খানের সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব ধারণ করেন। ১৯৫৪ সনের নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববঙ্গ সরকারের সমবায় ও কৃষিঋণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে শেখ মুজিব দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র যুক্তফ্রন্টের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে থাকে এবং অল্পকালের মধ্যেই দেশব্যাপী ৯২(ক) ধারা জারি করা হয়, যার পরিণতিতে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। এ সময়ে শেখ মুজিবকেও কারারুদ্ধ করা হয়। এরপর ১৯৫৬ সনে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে, এবং শেখ মুজিব এই সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। এই দায়িত্ব তিনি বেশি দিন পালন করেন নি। মন্ত্রীর আসনে বসে তিনি লক্ষ্য করেন যে পূর্ব বাংলা সোনালী আঁশ পাট উৎপন্ন করে, কিন্তু এই অর্থকরী ফসলের লভ্যাংশ ভোগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় জুট মার্কেটিং সংস্থা গঠিত হলো বটে, কিন্তু এই সংস্থা তেমন কার্যকর হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণেই হোক বা যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই হোক, শেখ মুজিব মাত্র সাত মাস পর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি আওয়ামী লীগের সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে থাকেন।

যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে আওয়ামী লীগের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে অভাবিতরূপে। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল প্রধানত দুটি কারণে ঃ প্রথমত, এই দলটি পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিল ; দ্বিতীয়ত, এই দলটি পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণপ্রক্রিয়ার চিত্র সকল দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে। আওয়ামী লীগের শক্তিবৃদ্ধিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক–সিভিল আমলাচক্র স্বাভাবিকভাবেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এরই অনিবার্য পরিণতি জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন। ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮–এ সামরিক শাসন জারি

www.pathagar.com

করে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেন। জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব বাংলার জনমনে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। শেখ মুজিব সহ যুক্তিফ্রন্টের সকল নেতা সামরিক শাসকচক্রের সঙ্গে কোন প্রকার আপোস করতে সম্মত হন নি। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে শেখ মুজিব যে আশঙ্কা করেছিলেন তা-ই সত্যে পরিণত হয় মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে। তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হলো। প্রায় দেড় বছর বন্দিদশায় থাকার পর ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তিদান করা হলেও প্রায় দু' বছর পরে (১৯৬২) তাঁকে পুনরায় জননিরাপত্তা আইনবলে আটক করা হয়। ইতোমধ্যে জেনারেল আইয়ুব খান তাঁর ১৬টি আইন প্রণয়ন নীতি এবং ২১টি রাষ্ট্রীয় নীতি সংবলিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন।[১] এই শাসনতন্ত্রে বলা হয় যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আশি হাজার নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা গঠিত ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচিত হবেন। শাসনতন্ত্রের guiding principles-এ বলা হয় : ইসলামবিরোধী কোন আইন প্রবর্তন করা যাবে না এবং সকল নাগরিক বাক-স্বাধীনতা ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা ভোগ করবে বটে, তবে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাকিস্তানের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, শালীনতা, ন্যায়বিচারভিত্তিক শাসন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোন প্রকারে বিঘ্নিত না হয়।[২]

স্বাভাবিক কারণেই আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র শেখ মুজিবের নিকট গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী মনে হয়েছে। তখন পাকিস্তানের রাজনীতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হতে থাকে। শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের জন্য শেখ মুজিব ১৯৬৬ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় কনভেনশনে পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। এভাবেই আওয়ামী লীগের ছয়-দফা দাবির সূত্রপাত ঘটে। একথা হয়তো অত্যুক্তি নয় যে ১৯৬৬ সন থেকেই শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার জাতীয় নেতা হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

ছয়-দফা আন্দোলন

বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র পূর্ব বাংলার সামরিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় নি, বরং এ ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে। বিশেষত ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত সংঘর্ষে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তাহীনতা অত্যন্ত প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তদুপরি

---

১ *The constitution : A Summary*, (Government of Pakistan, 1960) p. 3

২ ঐ, পৃ. ৩

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা যেভাবে বঞ্চনা ও শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল তার ফলে এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহল বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবও পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। তিনি সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই অভিযোগ রাখেন পাকিস্তানের শাসকচক্রের কাছে। তিনি বলেন যে পূর্ব বাংলায় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বয়ম্ভর করে তোলার ব্যাপারে কখনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। অথচ দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব বাংলা থেকে কাঁচামাল পাচার করে শিল্পপতিরা পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলছে। এর ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। শেখ মুজিবের অভিযোগের সত্যতা বিদেশী বিশেষজ্ঞগণও প্রমাণ করেছেন। তাঁরা এক অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় বলেন ঃ

"১৯৫৯-৬০ সালে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় (মাথাপিছু) আয় পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ৩২% বেশি ছিল সেখানে দশ বছর পর ১৯৬৯-৭০ সালে এই বৈষম্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৬১% তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যারিফ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, শিল্প অনুমোদন, বৈদেশিক সাহায্য, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ বণ্টন, বিভাগকে ব্যবহার করা হয়েছে বিনিয়োগ ও বণ্টনকে এমনভাবে পরিচালনা করতে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চমূল্যের শিল্প গড়ে উঠতে পারে। আমদানি কোটা ও ট্যারিফের দেয়ালের দ্বারা বন্দী পূর্ব বাংলার বাজারই এই সব শিল্পের লাভকে নিশ্চিত করেছে। যদিও পাকিস্তানের লোকসংখ্যার প্রায় ৬০% ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী, তবু কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নব্যয় এই অঞ্চলের জন্য ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত সর্বনিম্ন ২০% এবং ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৬%-এর মধ্যে উঠানামা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ভাগ ২০%-এরও কম হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের ৫০% থেকে ৭০% ভাগই অর্জিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপন্নদ্রব্য দ্বারা। এতদসত্ত্বেও বৈদেশিক আমদানির (রফতানি আয় ও বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা যার অর্থ পরিশোধ করা হয়) ক্ষেত্রে তার ভাগ ২৫% থেকে ৩০%-এ সীমাবদ্ধ থেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে অর্থ উদ্বৃত্ত করা হয়েছে তা ব্যবহৃত হয়েছে মূলত বিদেশের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের যে ঘাটতি তা পূরণের কাজে এবং তাতে যে নেট সম্পদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে তার পরিমাণ একটি সরকারী রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে যে ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সন পর্যন্ত ২.৬ বিলিয়ন।"[৩]

---

৩ উদ্ধৃতি, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম পর্ব, (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ১৯৭২) পৃ. ২৯

www.pathagar.com

বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি, পুঁজিপতি, ঠিকাদার ও সামরিক–সিভিল আমলাচক্রের প্রভাবাশ্রিত কেন্দ্রীয় সরকার — যার অধিকাংশ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানী — "রাষ্ট্রীয় নীতিকে একটি উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থা দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত করেছে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের শূন্য মরুভূমির উন্নয়ন ঘটে এবং এই নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান নিঃস্বে পরিণত হয়।"[৪] অন্যান্য তথ্য থেকেও তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, পাকিস্তানের মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬০০০ মিলিয়ন টাকা ; কিন্তু এই রাজস্ব থেকে মোট ৬০% ব্যয় করা হতো প্রতিরক্ষা খাতে। তবে এখানেও লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে প্রতিরক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো ৫০% এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ১০% ; এছাড়া মোট রাজস্বের বাকী ৪০% থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো ২৫% এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ১৫% ভাগ।[৫] আরো দেখা যায় যে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়, আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য–বরাদ্দ এবং চাকুরি ও নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তার ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পূর্ব বাংলা। আর একটি উদাহরণ থেকে বৈষম্যের চিত্র ধরা পড়বে ঃ কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা ছিল ৮৪%, অপর পক্ষে পূর্ব বাংলার অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬% ; স্থলবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৯৫% এবং মাত্র ৫% ছিল বাঙালী।

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে উভয় অঞ্চলের বৈষম্য দূর করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁর শাসনামলে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি, বরং বৈষম্যের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬১ সন থেকে পূর্ব বাংলায় ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৬৬–এর দিকে ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। দেশের এই সংকটজনক অবস্থায় শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বহস্তে ধারণ করেন। তিনি বলেন ঃ

> পাকিস্তানের দুই অংশের উৎকট বৈষম্য ক্রমাগত আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ধ্বংসের হাত থেকে আঞ্চলিক অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য আঞ্চলিক সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করার এবং অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।[৬]

---

৪ ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৫ ঐ, পৃ. ৩০

৬ শেখ মুজিবুর রহমান ঃ **আমাদের বাঁচার দাবি ৬–দফা কর্মসূচী** ; পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ঢাকা, (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ইং) পৃ. ২

www.pathagar.com

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য এবং শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য শেখ মুজিব ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁর ঐতিহাসিক **ছয়-দফা কর্মসূচী** ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবের **৬-দফা ঃ**

১ নং দফা ঃ সরকারের ধরন হবে ফেডারেল এবং পার্লামেন্টারী। এতে ফেডারেল আইনসভার এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর আইনসভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। ফেডারেল আইনসভার প্রতিনিধিত্ব হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

২ নং দফা ঃ ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় এবং নিচে ৩নং দফায় বর্ণিত শর্তাধীনে মুদ্রা।

৩ নং দফা ঃ দেশের দুইটি অংশের জন্য দুইটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থাসহ দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এতে আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। এই ব্যাংকগুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর এবং মূলধন পাচার বন্ধের ব্যবস্থা করবে।

৪নং দফা ঃ রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে থাকবে। দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব ফেডারেল সরকারকে দেওয়া হবে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা হবে। করনীতির উপর অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণক্ষমতার অভিলক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৫নং দফা ঃ ফেডারেশনের অন্তর্গত অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে দেওয়া হবে।

৬নং দফা ঃ কার্যকরভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে 'মিলিশিয়া' বা 'প্যারামিলিশিয়া' রাখার ক্ষমতা দেওয়া হবে।"[৭]

---

৭ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫ ও ৬

www.pathagar.com

৬-দফা কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার জনমনে স্বাধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জাগ্রত হলো সত্য, অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র ৬-দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী 'ষড়যন্ত্রের' সুস্পষ্ট আভাস দেখতে পায়। এসময় পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা অভাবিতরূপে বৃদ্ধি পায় যে কারণে জনগণ তাঁকে **বঙ্গবন্ধু** বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক-সিভিল আমলাচক্র অস্বস্তি, এমন কি শংকিত বোধ করতে থাকে। তারা বারংবার শেখ মুজিবকে কারারুদ্ধ করেও তাঁকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথ থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়। মুজিবের নেতৃত্বে প্রতিবাদসভা, আন্দোলন, ধর্মঘট ও অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন অনেকে। বিশেষত ৭ জুন, ১৯৬৬-তে দেশব্যাপী যে হরতাল পালিত হয় সে সময় পুলিশের গুলীতে এগারো জন নিহত হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় প্রবল বিক্ষোভ-মিছিল। পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সামরিক শাসকচক্র কারাবন্দী মুজিবকে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করে। কেবল তাই নয়, তাঁকে রাজনীতিক মঞ্চ থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। এটাই **আগরতলা ষড়যন্ত্র** মামলা। এই মামলা প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর জাতীয় ঐক্যচেতনাকে প্রবলতর করে তোলে। বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রবল গণআন্দোলনের মাধ্যমে শাসকচক্রের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়। দেশব্যাপী ১৪৪ ধারা জারি করেও সরকার বিক্ষোভ-আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারে নি। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান **গোল টেবিল বৈঠকের** মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াস চালাতে থাকেন। তিনি **গোল টেবিল বৈঠকে** শেখ মুজিবের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করেন। কিন্তু শেখ মুজিব শর্ত দিলেন যে আগে ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা তুলে নিতে হবে, মামলা তুলে নেবার পর তিনি বিবেচনা করবেন **গোল টেবিল আলোচনায়** আদৌ যোগদান করবেন কিনা। আইয়ুব খান এই শর্ত মেনে নিয়ে আগরতলা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হলেন (ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৬৯)।

স্বাধীনতা আন্দোলন

আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিলেও এই মামলা বাঙালীর অন্তরে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল যার ফলে মুজিব আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাঁর নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় আরো দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। গোল টেবিল আলোচনায় যোগদানের পূর্বে শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত গণসংবর্ধনা সভায় (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯) যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা

www.pathagar.com

পুনরায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ

> গুটিকয়েক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও আমলার জন্য আমরা পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম ক'র নি। এ দেশের চাষী মজুর ছাত্র সকল মানুষের বাঁচার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু জালেমের পর জালেম এসেছে দেশে শাসনক্ষমতায়। জনগণ মুক্তি পায় নি।[৮]

গোল টেবিল আলোচনায় তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যে তিনটি প্রধান সমস্যার কথা তুলে ধরেন তা হলো ঃ প্রথমত, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে ; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অন্যায়ভাবে শোষণ করা হচ্ছে ; তৃতীয়ত, রাজনৈতিক অধিকারবঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনমনে অবিচারজনিত ক্ষোভ জাগ্রত রয়েছে। গোল টেবিল আলোচনায় এসব সমস্যার কোন সমাধান হয় নি, যেজন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং তাঁর পরিবর্তে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা ধারণ করেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কয়েক দফা আলোচনা হয়, কিন্তু এদেশের ন্যায্য অধিকার ও স্বাধিকারের প্রশ্নে শেখ মুজিব আপোস করতে রাজী হন নি বলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। পরবর্তী পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সনে পাকিস্তানের উভয় অংশে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো ঘোষণা করেন যে ৩ মার্চ, ১৯৭১-এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। দেশ তখন ভয়াবহ বন্যা কবলিত থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব পূর্বঘোষিত তারিখ মোতাবেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেন। পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে পূর্ব বাংলায় দুটি আসন ছাড়া জাতীয় পরিষদের সব আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হয়েছেন ; অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়েছেন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির মনোনীত প্রার্থীগণ।* অর্থাৎ এই নির্বাচনে উভয় অংশের প্রতিনিধিত্বকারী কোন জাতীয়

---

৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২) পৃ. ৪৩৬

* জাতীয় পরিষদের সর্বমোট আসনসংখ্যা ঃ ৩১৩
আওয়ামী লীগ লাভ করে ঃ ১৬৭
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ঃ ৮৮
অন্যান্য দল ঃ৫৮

www.pathagar.com

পার্টির আর্বিভাব ঘটল না। এ থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পাকিস্তানের ভাঙ্গন অনিবার্য।

জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আওয়ামী লীগের বিজয়কে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র এক অশুভ পরিণতির লক্ষণ মনে করে। জাতীয় পরিষদে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আওয়ামী লীগের তথা শেখ মুজিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক এটা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সহ পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাম্য ছিল না। কাজেই অনুমান করা যায় যে শেখ মুজিবের অগোচরে তাঁকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদিও ঘোষণা করেছিলেন যে সাধারণ নির্বাচনের পর ৩রা মার্চ (১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে, কিন্তু ইয়াহিয়ার অনীহার কারণেই হোক বা সামরিক জান্তা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতালিপ্সা ও গোপন ষড়যন্ত্রের কারণেই হোক ইয়াহিয়া খান পহেলা মার্চ অকস্মাৎ এক ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেন। শাসকচক্রের দীর্ঘসূত্রিতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব নিয়মতান্ত্রিকপথে ছয়-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সহসা স্থগিত হওয়াতে শাসকচক্রের মনোভাব শেখ মুজিবের চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয় জঙ্গী মিছিল, হরতাল, অসহযোগ আন্দোলন। নতুন শ্লোগান উঠল ঃ **বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর**। এ সময় থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিক প্রবাহ শেখ মুজিব সম্পূর্ণ এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। বহু বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের তীব্র সমালোচনা করেন। ৭ মার্চ, ১৯৭১-এ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি নানাদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন ঃ

> আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় — তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা সম্পূর্ণভাবে আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।"[৯]

৯ বজ্রকণ্ঠ, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দফতর, ৭১/৭২ ; পৃ. ৩

www.pathagar.com

বক্তৃতার প্রথম দিকে শেখ মুজিব পকিস্তানের শাসকচক্রের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের এবং পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের অবিচারের কথা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি তাঁর অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে জনসাধারণকে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

> .....আমি বলতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না। এ আমার নির্দেশ।[১০]

তবে গরীবের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য তিনি যোগাযোগব্যবস্থা সচল রাখতে বলেন এবং বহির্বিশ্বে যাতে সাংবাদিকগণ সংবাদ পাঠাতে পারেন সেজন্য টেলিফোন-টেলিগ্রাম চালু রাখার নির্দেশ দেন। বক্তৃতার শেষাংশে তিনি আন্দোলন ও ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে বলেন। তবে আন্দোলনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপরও তিনি জোর দেন। কারণ "শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না।"[১১] সবশেষে তিনি তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

> রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১২]

শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করার কথা হয়তো চিন্তা করেন নি। তাঁর উক্তিই এ কথার প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ

> শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা না হলে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।[১৩]

শান্তিপূর্ণ এবং সম্মানজনক মীমাংসার আশায় শেখ মুজিব ৭ মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১৬ দিন ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং অহিংস পন্থায় পূর্ণ হরতাল, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলল সামরিক শাসকচক্র। ইয়াহিয়া খান একদিকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকে, অপরদিকে বিপুল পরিমাণ

---

১০ ঐ, পৃ. ৫
১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১২ ঐ, পৃ. ৬
১৩ ঐ, পৃ. ৬

www.pathagar.com

মারণাস্ত্র পাঠাতে থাকে পূর্ব বাংলায়। তার নিষ্ঠুর বাঙালীনিধন পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল ২৫ মার্চের (১৯৭১) ভয়াল রাতে। সেদিন রাতে ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যেরূপ নৃশংসেভাবে পূর্ব বাংলায় হত্যাকাণ্ড চালায় তা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ বাঙালী প্রাণ দিল ইয়াহিয়ার সৈন্যদের হাতে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের তিক্ত অভিজ্ঞতা এক সময় ভারতীয় জনমনে পূর্ণ স্বাধীনতাস্পৃহা জাগ্রত করেছিল, তেমনি পঁচিশে মার্চের হত্যাকাণ্ডও পূর্ব বাংলার জনগণকে বাধ্য করে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণ করতে। শেখ মুজিবের ইচ্ছানুযায়ী বাঙালী জাতি তখন নিয়মতান্ত্রিক পথ বর্জন করে যুদ্ধের পথে অগ্রসর হয়। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীও সহযোগিতা দান করেন। বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ পরাজয় বরণ করে। সেদিনই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে কারারুদ্ধ ছিলেন। ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে তিনি মুক্তিলাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর কোন আইনগত অসুবিধা হয় নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সরকার শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে নির্বাচিত করেছিল। যেহেতু সেসময় তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন সে কারণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শেখ মুজিব যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন এদেশের জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বরণ করে নেয়।

স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু

স্বাধীন বাংলাদেশে ক্ষমতার শীর্ষে থেকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকে নতুন রাষ্ট্রের রাজনীতিক কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সংবিধান প্রণয়ন (১৯৭২), সাধারণ নির্বাচন (১৯৭৩), পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ ছিল এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর প্রতিটি কর্মসূচীতে জনগণও তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। তবে একটি নতুন রাষ্ট্রে সাধারণত যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে এই সমস্যাগুলি ক্রমশ জটিলতর হতে থাকে। বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর

www.pathagar.com

অগ্নিমূল্য, দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে জনমনে অসন্তোষ ঘনীভূত হতে থাকে। তদুপরি ক্ষমতাসীনদের অনুগ্রহপুষ্ট আমলা, কর্মী, ঠিকাদার, ব্যবসায়ীর ব্যাপক দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছিল। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে বর্ষীয়ান জননেতা মওলানা ভাসানী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেন এবং বিক্ষোভমিছিলে নেতৃত্বদান করেন। তখন অনেকের কাছেই এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে স্তাবকপরিবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

অনস্বীকার্য যে শেখ মুজিব অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, বিশৃঙ্খলা ও অর্থ-সম্পদলোভীদের দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করে তিনি স্বাভাবিকভাবেই অস্থিরতা প্রকাশ করেন। দুর্নীতিবাজ স্তাবকেরা দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে দেখে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ও বিশৃঙ্খলা রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। এই অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তিনি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

এই সংশোধনীর ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতা ধারণ করেন। উপরন্তু **বাকশাল** গঠন করে (৬ জুন, ১৯৭৫) তিনি এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটাতে প্রয়াস পান। বাকশাল সংক্রান্ত ঘোষণায় বলা হয় ঃ নতুন আইনে দেশে শুধু একটি রাজনৈতিক দল — বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) বিদ্যমান থাকবে। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান এবং সেক্রেটারি জেনারেল এম. মনসুর আলী (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী)। এছাড়া বাকশালের পাঁচটি অঙ্গদল থাকবে — জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুব লীগ এবং জাতীয় ছাত্র লীগ। প্রত্যেকটি অঙ্গদলের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। বাকশাল সংক্রান্ত ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্র সহ সকল প্রচারমাধ্যমকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এছাড়া শেখ মুজিব আরো কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ঃ বাংলাদেশের ৬৩টি মহকুমাকে জেলায় পরিণত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলার জন্য একজন বাকশাল-সদস্যকে গবর্নর হিসাবে মনোনীত করা হয়।

শেখ মুজিবের বৈপ্লবিক পদক্ষেপসমূহ অনেকে সমর্থনযোগ্য মনে করেন নি। বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া বিশেষ মহলে ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সপরিবারে নিহত হন।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর অবদান প্রসঙ্গে

শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রতাত্ত্বিক অপেক্ষা সংগ্রামী নেতা বলাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের জন্য জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিরলস সংগ্রামের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। পূর্ব বাংলার জনগণকে যাঁরা জাতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবের অবদান নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। ৫দেশে ভাষা আন্দোলনের সূত্রে যে সাংস্কৃতিক জাতিবাদের বিকাশ ঘটেছিল শেখ মুজিব তাকে রাজনীতিক জাতিবাদে পরিণত করেন ঐতিহাসিক ৬-দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পূর্ব বাংলার জনসমষ্টিকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করার একক কৃতিত্ব শেখ মুজিবের।

এক কালে পাশ্চাত্য সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল, কারণ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দান করে। গণতন্ত্রের নামে নাগরিক সমাজের অল্পাংশ অধিকাংশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে এটা তাঁর কাম্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্র কায়েম করতে — যে গণতন্ত্র শোষিত মানুষের জন্য, তাদের স্বার্থে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। শেখ মুজিব বলেন ঃ "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র — সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে, দেখা যায়, সেই সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজন হয় শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র .....যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়। .....অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি।"[১৪]

শেখ মুজিবের প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে বুঝা যায় যে তাঁর গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি সমাজতন্ত্র। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর শোষিতের গণতন্ত্রে জনসাধারণের মৌলিক রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তিনি শোষিতের মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করেন এভাবে ঃ

এক আর্থ-সামাজিক অধিকার ঃ কাজের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বিশ্রাম এবং সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার ;

---

১৪ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ঃ **বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র**, (ঢাকা, ১৯৮১) পৃ. ৮ থেকে উদ্ধৃত

www.pathagar.com

দুই রাজনৈতিক অধিকার ঃ স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অধিকার ; অর্থাৎ, নির্বাচন, বাকস্বাধীনতা, প্রচার ও প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার অধিকার।

এছাড়াও তিনি বিবেকের স্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা এবং চলাচলের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৫]

শেখ মুজিব শোষিতের গণতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন ঃ

ইডেন বিল্ডিং বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইনে। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে ইউনিয়নে থানায় জিলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুবিধা পায়।[১৬]

শোষিতের গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে কর্মসূচী গ্রহণ করেন তা হলো ঃ

এক বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামসমবায় গঠন ;

দুই মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামীণ জোতদার, মহাজন, ধনিক–বণিক শ্রেণীর উচ্ছেদ ;

তিন উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদনশক্তির বিকাশ সাধন ;

চার আমলাতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন।

শেখ মুজিব হয়তো বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পথে শোষিতের গণতন্ত্র কায়েম করা যাবে না। হয়তো একারণে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদলে গণতান্ত্রিক–কেন্দ্রিকতাভিত্তিক একদলীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারি দল বাকশাল ব্যতিরেকে অন্যান্য ভিন্ন মতাবলম্বী দল এবং গুটিকয়েক সরকারনিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ছাড়া সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণীহীন সমাজ বিদ্যমান থাকে বলে সেখানে শ্রেণীসংঘাতের প্রশ্ন ওঠে না। অপর পক্ষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী বিদ্যমান থাকে বলে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বহু দল ও সংবাদপত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু একটি মাত্র শ্রেণী — শ্রমিক শ্রেণী থাকে, সে কারণে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে শুধু একটি দল — কম্যুনিস্ট পার্টি। অনেকে মনে করেন যে শেখ মুজিব বিদ্যমান শ্রেণীব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করে অকস্মাৎ একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভুল করেছিলেন। তিনি যদি বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের বৈষম্য দূর করে একদলীয়

১৫ আবু সাইয়িদ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৬ ঐ, পৃ. ১১

www.pathagar.com

শাসনব্যবস্থা কায়েম করতেন তাহলে হয়তো সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটত না। অর্থাৎ, একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে পশ্চাতভূমিটি সেভাবে তৈরি করা প্রয়োজন ছিল।

আবার য়ুরোপীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রেক্ষিতে এ কথাও বলা হয় যে রাষ্ট্রের সংবিধান জনগণের পবিত্র দলিল ও আমানত। কোন ব্যক্তি বা দল স্বেচ্ছায় এই দলিলের মৌলিক পরিবর্তন সাধনের অধিকার দাবি করতে পারে না। তা করতে হলে আগে জনগণের ম্যান্ডেট বা রায় নিতে হয়। শেখ মুজিব তা করেন নি বলেই সমালোচকেরা তাঁর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সুযোগ পেয়ে যায়। কেউ কেউ তাঁকে সর্বাত্মক ক্ষমতাবাদী একনায়ক বলতেও দ্বিধান্বিত হন নি। এসব কারণে বাকশাল ব্যবস্থার পশ্চাতে এক মহান লক্ষ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে নি।

শেখ মুজিবের সংবিধানচিন্তায়ও কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য কবা যায়। তিনি পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যায়ে একটি সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন। তিনি এই সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করেন ইংলন্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে। খসড়া সংবিধানের সূচনাতে তিনি বলেন ঃ "এমন একাট যথার্থ সজীব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে জনগণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং ন্যায় সাম্য বিরাজ করবে।"[১৭] পরবর্তী অনুচ্ছেদে তিনি বলেন ঃ

> জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রিয় ধর্ম হলো ইসলাম। আওয়ামী লীগ এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট গ্যারান্টি থাকবে যে পবিত্র কোরান ও সুন্নায় সন্নিবেশিত ইসলামের নির্দেশাবলীর পরিপন্থী কোন আইন পাকিস্তানে প্রণয়ন বা বলবৎ করা চলবে না।[১৮]

স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন হবার পর এক বছরের মধ্যে শেখ মুজিব বাঙালী জাতিকে সংবিধানের যে প্রথম খসড়াটি উপহার দেন (নভেম্বর ৪, ১৯৭২) তাতে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি — জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সন্নিবেশিত করা হয়। শেখ মুজিব এক সময় কোরান ও সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংযোজিত হওয়াতে ধর্মনিষ্ঠ মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। দক্ষিণপন্থী ইসলামী দলগুলি স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়। এমন কি এই নতুন সংবিধানকে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা বলে প্রচারকার্য চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে

---

১৭ শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৮ ঐ, পৃ. ৩

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতার অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে শেখ মুজিব পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাসস্থান ; কাজেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ কোন ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগ্রত হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সকলে ধর্মাচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে একথাও তিনি সাথে সাথে ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এক অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এক দিকে ইসলাম বিপন্ন ভেবে যারা বিক্ষুব্ধ ছিল তারা ক্রমশ সোচ্চার হতে লাগল, অপর দিকে সামরিক বাহিনীর একাংশ শেখ মুজিবের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাত্র সাড়ে তিন বছর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি নিজে বৈপ্লবিক কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নি। তিনি বলেছিলেন :

> আজ আমাদের অস্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এবার স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেশ গড়ার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে। মুক্তির সংগ্রামের চেয়ে দেশ গড়ার সংগ্রাম কঠিন।[১৯]

কিন্তু দেশ গড়ার সময় তিনি পান নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা এই যে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই নিজেকে অজাতশত্রু ভেবেছিলেন। এই ভুলের খেসারত তাঁকে দিতে হয়েছিল স্বদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে প্রাণ দিয়ে।

পরিশেষে, শেখ মুজিবের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে : প্রথমত, সামরিক-আমলাতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, এর বিরুদ্ধে স্বদেশের জনগণকেও সংগঠিত করেন ; দ্বিতীয়ত, স্বদেশের রাজনীতিক প্রবাহে তিনি প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করেন এবং এই প্রবাহ তাঁকে প্রধান নেতৃত্বের শীর্ষে উন্নীত করে ; তৃতীয়ত, বাংলাদেশের জনমনে জাতিসত্তাবোধের উদ্বোধন ঘটে মূলত তাঁরই প্রেরণায় ; চতুর্থত, তরুণ সমাজে নেতৃত্ব সৃষ্টির মূলে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসসচেতন জনগোষ্ঠী শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনক খেতাবে আখ্যায়িত করে থাকে। তাঁদের চোখে তিনি মূর্তিময় বাংলাদেশ।

---

১৯ বজ্রকণ্ঠ, প্রাগুক্ত, মলাটের শেষ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

দলিলপত্র

The Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XIV. No. I. Fourteenth Session, 1924.

The Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. LX-No. 4, 1941,

Census of India, Vol. I VI-A.

The Indian Annual Register, Vol. II, Calcutta, 1940.

India Round Table Conference Proceedings : 12th November, 1930-19th January, 1931.

Report of the Eleventh Indian National Congress, Poona, 1895. *Speech Delivered at the Fifth Session of the All India Moslem League held in Calcutta on 3rd and 4th March 1912 by the Honourable Nawab Sir Khajeh Salimullah Bahadur, G. C. S. I. K. C. S. I. of Dacca.*

গ্রন্থরাজি

A. B. Keith (ed.) : *Speeches and Documents on Indian Policy*, 1750-1921 ; London 1922.

A. B. Rajput : *Muslim League Yesterday and Today* : Lahore, 1948.

A.C. Banerjee : *Two Nations*, New Delhi, 1981.

Amitabha Mukherjee : *Reform and Regeneration in Bengal* ; Calcutta, 1968.

A.K. Fazlul Huq : *Bengal Today* ; Barisal, 1944.

Appadorai : *Documents on Political Thought in Modern India*, Vol. II ; India, 1975.

Aziz Ahmad : *Islamic Moderation in India.*

Azizur Rahman Mallick : *British Policy and the Muslims in Bengal*, 1756-1856 ; Dacca, 1977.

B.K. Ahluwalia & Shashi Ahluwalia : *Muslims and India's Freedom Movement* ; New Delhi, 1985.

B. R. Nanda : *Mahatma Gandhi* ; Boston, 1958.

: *The Nehrus : Motilal and Jawaharlal* ; London, 1965.

Cambridge History of India ; Vols. V-VI, Cambridge, 1932.

C.F. Andrews : *Mahatma Gandhi at Work* ; New York, 1931.

C.H. Philips and Mary Doren Wainright (eds.) : *The Partition of India* ; London, 1970.

Daniel Argov : *Moderates and Extremists in the Indian National Movement* ; 1883-1920, Bombay, 1967.

Dhananjay Keer : *Mahatma Gandhi -- Political Saint and Unarmed Prophet* ; Bombay, 1973.

www.pathagar.com

Enamul Haque : *Nawab Bahadar Abdul Latif, His Writings and Related Documents* ; Dhaka, 1968.

E. Stanley Jones : *Mahatma Gandhi, an Interpretation* ; London, 1948.

Fazle Mahmud : *A Study of Life & Works of Shah Wali Allah* ; Lahore, 1972.

Gandhi : *Collected Works* : Government of India, 1958.

G.B. Mathur : *Growth of Muslim Politics in India* ; Delhi, 1979.

G.D. Birla : *In the Shadow of Mahatma* ; Bombay, 1955.

G.F.I. Graham ; *The life and Work of Syed Ahmed Khan* ; C.S.I.; Delhi, 1885.

G.W. Choudhury : *Constitutional Development in Pakistan* ; Lahore, 1959.

Harun or Rashid : *The Foreshadowing of Bangladesh* ; Dhaka, 1987.

Hector Bolitho : *Jinnah Creator of Pakistan* ; London, 1954.

Humaira Momen : *Muslim Politics in Bengal* ; Dacca, 1972.

Jagadish Narayan Sarker : *Islam in Bengal* ; Calcutta, 1972.

Jamiluddin Ahmed : *Speeches and Writings of Mr. Jinnah* ; Vol. I, Lahore, 1960.

Jawaharlal Nehru : *The Discovery of India* ; London, 1930.

_____ : *Autobiography* ; London, 1936.

_____ : *Speeches* ; New Delhi, 1954-1958.

John Haynes Holmes : *My Gandhi* ; London. 1954.

K.A. Kamal : *Politicians and Inside Stories* ; Dacca, 1970.

K.C. Chaudhury : *Role of Religion in Indian Politics* ; (1900-1995) ; Delhi, 1978.

K.K. Datta : *Studies in the History of the Bengal Subha* ; Vol. I, Calcutta, 1936.

K. P. Karunakaran : *Indian Politics from Dadabhai Naoroji to Gandhi* ; New Delhi, 1975.

K.T. Nara Sinha Char ; *Profile of Nehru* ; Bombay.

Lalbahadur : *Indian Freedom Movement and Thought* ; New Delhi, 1983.

Larry Collins & Dominique Lapierre : *Freedom At Midnight* ; Avon, 1975.

Louis Fischer (ed.) *The Essential Gandhi* ; London, 1962.

M. A. Rahim ; *Muslim Society and Politics in Bengal* ; 1757-1947, Dacca, 1978.

Matlubul Hasan Saiyid : *Mohammad Ali Jinnah, A Political Study* ; Lahore, 1962.

Michael Brecher : *Nehru : A Political Biography* ; London, 1958.

Dr. Mohammad Mohar Ali (ed.) : *Autobiography and other Writings of Nawab Abdul Latif Khan Bahadur* ; Chittagong, 1968.

M.R. Talukdar (ed.) : *Memoirs of Husyn Shaheed Suhrawardy* ; University Press Ltd. Dhaka, 1987.

Narahari Kaviraj : *Wahabi & Faraizi Rebels of Bengal* ; New Delhi, 1982.

Nawab Abdul Latif Khan Bahadur, C.I.E. : *A Short Account of My Public Life* ; Calcutta, 1885.

www.pathagar.com

N. K. Bose : *Modern Bengal* ; Calcutta, 1954.

N. S. Bose : *The Indian Awakening and Bengal* ; Calcutta, 1967.

O.P. Goyal : *Studies in Modern Indian Political Thought (Gandhi an Interpretation)* : Allahabad, 1969.

Pritwischandra Ray : *The Case Against the Break-up of Bengal*, Calcutta, 1905.

Qeyamuddin Ahmed : *The Wahabi Movement in India* ; Calcutta, 1966.

R.C. Majumder : *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century* ; Calcutta, 1960.

R.C. Palit : *Speeches of Babu Surendranath Banerjee* ; Vol. V, Calcutta, 1894-1908.

Ram Gopal : *Indian Muslims, A Political History* ; Bombay, 1959.

Robert Payne : *The Life and Death of Mahatma Gandhi* ; London, 1969.

S. A. Ayer (Intro.) : *Selected Speeches of Subhash Chandra Bose* ; Delhi, 1962.

Sarojini Naidu : *The Bird of Time* ; London, 1919.

Syed Ahmed Khan : *The Causes of Indian Revolt* (Tr. Graham) ; Delhi, 1885.

S.D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohan Roy* ; Calcutta, 1914.

Sirajul Islam : *Fazlul Huq Speaks in Council*, 1913-1916 ; Dacca, 1976.

Surendranath Banerjee : *A Nation in Making* ; Bombay, 1963.

S.H. Patil (Dr.) : *Gandhi & Swaraj* ; London, 1969.

Shan Muhammad : *Unpublished Letters of The Ali Brothers* ; Delhi, 1979.

Sufia Ahmed : *Muslim community in Bengal 1884-1912*, Dacca, 1974.

Sumit Sarker : *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, Calcutta, 1963.

Syed Murtaza Ali : *Personality Profiles* ; Dacca, 1965.

Tara Chand : *History of Freedom Movement in India* ; Vol III.

V.C. Joshi (ed.) : *Rammohan Roy and the Process of Modernization in India* ; Delhi, 1975.

Wilfred Cantwell Smith : *Modern Islam in India* ; Lahore, 1943.

W.W. Hunter : *A Brief History of the Indian Peoples* ; Oxford, 1907.

_____ : *Indian Mussalmans* : London, 1871.

অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ; কলিকাতা, ১৯৮২

আবুল কাসেম ফজলুল হক : মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম পর্ব ; বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

আবুল মনসুর আহমদ : বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা ; ঢাকা, ১৯৮২।
শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, ঢাকা ১৯৮৬।

আবু সাইয়িদ : বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র ; ঢাকা, ১৯৮১

আরেফিন বাদল (সম্পাদিত) : মওলানা ভাসানি ; ঢাকা, ১৯৭৭

এ. এস. এম. আবদুর রব : শহীদ সোহরাওয়ার্দী ; ঢাকা, ১৯৬৮

ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (২য় খণ্ড) ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩

www.pathagar.com

কাজী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ : **শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ; ঢাকা, ১৯৭০
খোন্দকার আবদুল খালেক : **এক শতাব্দী** ; ঢাকা ১৩৭৩ বাং
খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস : **ভাসানী যখন ইউরোপে** ; ঢাকা, ১৯৭৮
_____ : **প্রসঙ্গ শেখ মুজিব**, ঢাকা, ১৯৮৭
প্রবন্ধাবলী, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭
ফিরোজ আল মোজাহিদ : **মওলানা ভাসানীর জীবন ও দর্শন** ; ঢাকা, ১৯৮২
বজ্রকণ্ঠ : বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দফতর, ১৯৭১/৭২
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ -- দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ১৯৮২।
মনি বাগচি : **রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ** ; কলিকাতা, ১৯৬৩
মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত) : **বঙ্গভঙ্গ**, ঢাকা, ১৯৮১
মোঃ আব্দুল মোহাইমেন : **বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ**, ঢাকা ১৯৮৪।
শেখ মুজিবুর রহমান : **আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচী ; ঢাকা ২০, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯**
শ্রী শৈলেশ দে : **আমি সুভাষ বলছি** ; রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৭ বাং
সুভাষচন্দ্র বসু : **পত্রাবলী ১৯২২-১৯৩২** ; নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা, ১৯৬৮
সৈয়দ আবুল মকসুদ : **ভাসানী** ; ঢাকা, ১৯৮৬।
সৈয়দ মকসুদ আলী : **রাষ্ট্রবিজ্ঞান**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬
_____ : **প্লেটোর রিপাবলিক** (অনুঃ), ঐ, ঢাকা ১৯৭৩
_____ : **ফরাসী বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রচিন্তা** ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় : **বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা** ; কলকাতা ৮৬
সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২।

পত্রিকা

Asian Affairs, Vol. II, July-December, Dacca, 1980.
Foreign Affairs, April 1957.
Pakistan Observer (Supplement), April 27, 1967, Dacca.
দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, কলিকাতা ১৯৮৫
সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১২ জুলাই, ১৯৮৫
সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৬

www.pathagar.com

উল্লেখসূচী

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১১৫, ১৬৫
অগস্তিন ২৫, ৫৬, ১৯৬
অছিবাদ ৯৯–১০০
অদ্বৈতবাদ ৪৫
'অন্তর্যামী' ১০৭
অতীন্দ্রিয়বাদ ১৭৬
অমৃতবাজার পত্রিকা ৮১
অমৃতসর ৯৪
অম্বিকা চ. মজুমদার ৮১
অরবিন্দ ১৩, ১০৬, ১৭৬
অসহযোগ আন্দোলন ১৪, ৯৬, ১০৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৬, ১৭৭, ২২১
অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ৯৩, ৯৫, ১৭৮
অহিংসা ৯৫–৯৬, ১০০
Autobiography ১১, ১৩৯

আইন অমান্য আন্দোলন ১৪০, ২১১
আইয়ুব খান ১৭৪, ১৯২, ২০৩, ২০৮
আইরিশ হোমরুল বিল ১২৪
আওরঙ্গজেব ১৭
আওয়ামী লীগ ২০২, ২০৯–১০
আকরম খান (মাওলানা) ৮০–৮১, ১১১
আগরতলা ষড়যন্ত্র ২০৮
আগা খান ৮৫
আজাদ সোবহানী (মওলানা) ১৯৫
আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৭৯
আতাউর রহমান খান ১৬৩
আদ্রিয়ানোপল ১১৬
আনজুমান-ই-ইসলাম ৫২
আনসারী, এম. এ ১০৮
আনন্দমোহন বসু ৭৩
আব্দুর রসুল (ব্যারিস্টার) ৮০
আব্দুর রহিম (স্যার) ১৯১
আব্দুল করিম ১১১
আব্দুল গফফার খান ৯৫
আব্দুল লতিফ (নওয়াব) ৫২, ৫৯–৬৪, ৬৬, ৮৮, ১২১, ১২৪, ১৬২
আব্দুল সোবহান চৌধুরী (নওয়াব) ৮০
আব্দুল হালিম গজনবী ৮০
আবু আল ফায়্যাদ ১৭
আবু হোসেন সরকার ১৬৩
আবুল কালাম আজাদ ১১৬, ১৩৬, ১৮৭
আবুল মনসুর আহমদ ১৭০, ১৭৫
আব্রাহাম লিংকন ১৫৬
আর. পি. দত্ত ১১২
আমীর মুহম্মদ বিন সউদ ১৬
আর্মেনিয়া ১১৬
আর্য সমাজ ৮, ১৩
আলী ইমাম ১৩৯
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ৫১, ৫৬
আলীগড় সম্মেলন ১২৬
আলী ভ্রাতাদ্বয় ১১৭
আলেকজান্ডার, এ. ভি ১৩২
আয়েঙ্গার, কে. আর. ১০৮
আশারি ২২
আসবাব-ই-বাগওয়াত-ই-হিন্দ ৫১
Apartheid ৯১
Unto the Last ৯১

ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ১৫৫
ইউনাটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া ১২০
ইউনিয়নিস্ট পার্টি ১৩১
ইজমা ৬৭
ইজতিহাদ ২০
ইডেন, স্যার ৬৩
ইনার টেম্পল ৬৫, ৯০

www.pathagar.com

ইন্ডিগো কমিশন ৬৩
ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ৯
ইন্ডিয়া লীগ ৭১
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ১৭৮
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৭২, ৭৮
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৭, ১২৪
ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ৭২, ১৭৬
ইন্দিরা গান্ধী ২১২
ইবনে খালদুন ৫৬
ইব্রাহিম খান ১৮৫
ইমাম মেহদী ২৩
ইম্পিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ৭২
ইয়ং ইন্ডিয়া ৯৩
ইয়ং বেঙ্গল ৭১
ইয়ার লতিফ খান ২
ইয়াহিয়া খান ২১০
ইলবার্ট বিল ১৪, ৭৩
ইলেকটোরাল কলেজ ২০৪
ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৮৩
ইসলামিয়া কলেজ ২০২
ইস্কান্দর মীর্জা ১৬৯-১৭০
ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি ১, ৩, ৪, ৩০, ৫১

Enquirer ৭১
Independence and After ১৩৯
India Gazette ৭১
India and the world ১৩৯
India Wins Freedom ১৩৬

ঈশা ৪৩

উইলিয়াম বেন্টিংক ৬, ২৭
উইলিয়াম হকিন্স ১
উত্তমাশা অন্তরীপ ১
উদয়নালা ৩
উদারবাদ ৭, ৯, ১৩, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৭১-৭২
উপযোগবাদ ৪৬
উমিদ রায় ২
উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী ১২৪

ঋণসালিসী বোর্ড ১৫৫

একুইনাস ৫৫
একুল দফা ১৬৩
এ্যানি বেসান্ত ১২৫, ১৮৭
এ'তেশামউদ্দিন, মির্জা ৪৩
এম. এন. রায় ১১২
এমব্রোজ দ্বীপপুঞ্জ ১১৬
এরিস্টটল ১৯, ৪৪, ৪৬, ৬৯, ১৪১, ১৭৯

এলিজাবেথ ১
A Nation in Making ৭২
An Indian Pilgrim ১৭৯
Apartheid ৯০, ১৯০
A Short Account of My Public Life ৫৯
A Short History of Saracens ৬৬
EBDO ১৭০
Essays on the Life of Mohammad ৫১
Ethics of Islam ৬৬

ওটেন ১৭৬
ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ১৯৫
ওয়াইক্লিফ ১৮৮
ওয়াহাদাদুল ওয়াজুদি ২২
ওয়াহাবি আন্দোলন ১০, ১৬, ২১, ২৩, ২৫, ৩৪

কঠ ৪৩
করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী ৯০

www.pathagar.com

কর্নওয়ালিস ৩০, ৩১
কলারোয়া ৬৩
কলিকাতা ২, ৫৯, ৭১, ৭২, ৮৩, ১৮৭
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৫, ১৬৫
কম্যুনিজম ১৮২
কম্যুনিস্ট পার্টি ২১৫
কংগ্রেস ১২১, ১২৮, ১২৯–১৩৭, ১৬১, ১৭৫, ১৮৯
কাগমারী ১৮৯, ১৯২
কাজী ওয়াজেদ আলী ১৫২
কার্জন, লর্ড ৮০, ৮১–৮৭
কার্টিয়ার ৩
কাথিয়াবাড় ৯০
কারিসমাতিক ১০৪, ১৩০, ১৬২
কায়েদে আজম ১২৮
কালীঘাট ২
কিশোর-কিশোরী ১০৭
কিশোরী চাঁদ মিত্র ৪৬
কিষেন দেব ২৭
কৃষক প্রজা পার্টি ১৫৪
কৃষক বিদ্রোহ/আন্দোলন ৪, ৩৩, ১৮৮
কৃষ্ণচন্দ্র ২
কেবিনেট মিশন প্ল্যান ১৩২–১৩৩, ১৪৯
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮, ১৭৭
কেরামত আলী জৌনপুরী ৬১
কোহিমা ১৭৯
কৌটিল্য ৪০
Calcutta Journal ৪৮
Comrade ১১৫
Critical Examination of the Life and Teachings of Mohammad ৬৫–৬৬

খলিফাতন্ত্র ২০, ২১
খাজা আহসানউল্লাহ ৭৯
খাজা সলিমুল্লাহ ৭৯–৮৯, ১০৬
খাজা হাবিবুল্লাহ ১৫৫
খাজানা আইন ৪১
খাদিম হোসেন ২
খৃসিপাস ৩৭
খেলাফত আন্দোলন ১৩, ১৪, ১৫, ৩৯, ১১৫–১১৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৬, ১৭৭
খোদায়ী রাষ্ট্র ১৯৬

গণতন্ত্র ১৪৩, ১৯৬–১৯৭
গণপতি অনুষ্ঠান ১৩
গণপরিষদ ১৬৮
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া বিল ১২৬
গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ ৯০–১০৫, ১২৯–১৩১, ১৪৭, ১৬১, ১৭৭, ১৮৭
গালিপলি ১১৬
গিরিয়াসুটি ৩
গিলাসিয়াস ৩৯
গিল্ড সমাজতন্ত্র ১৮৩
গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৯১, ১২০, ১২৯, ১৬১, ২০৮, ২১০
গোবিন্দপুর ২
গোল টেবিল বৈঠক ৯৩, ১২০, ১২৯, ১৬১, ২০৮, ২১০
গোলাম মোহাম্মদ ১৬৮
গৌর প্রসাদ চৌধুরী ২৭
গ্রাম-স্বরাজ ৯৮
গ্লাডস্টোন ১২৩
Glimpses of World History ১৩৯
Gray's Inn ১৬৫

ঘাগমারা ১৮৯, ১৯০
ঘিওর ১৬২
ঘেরাও আন্দোলন ১৯৪
চতুর্থ সংশোধনী ২১৩
চম্পাবন ৪, ৯৩

www.pathagar.com

চরকা ৯৮
চার্লস ফুরিয়ের ২২, ১৯৮
চিত্তরঞ্জন দাস ১০৬–১১৪, ১৩৮–১৩৯, ১৬১, ১৭০, ১৮৭
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮, ৩২, ১৬০, ১৮৮
চেকা মিয়া ১৮৫
চেম্‌স ফোর্ড ১৪
চেরাগ আলী ৫২
চৈতন্য ৪৫
চৌদ্দ দফা ১২৭, ১৫৪–১৫৫
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ১৬৯
চৌরিচরা ১১৩, ১৭৭

ছয় দফা আন্দোলন ২০৪–১০৮

জওহরলাল নেহরু ১৩৩, ১৩৭, ১৩৮–১৪৯
জগৎ শেঠ ২
জন এডাম ৪৮
জন ডিগবি ৪৩
জন রাসকিন ৯১
জন লক ৭, ৯, ৪২, ৪৪, ৬৩, ৯৭
জন শোর ৩০
জন স্ট্রাসি ৫২
জন হ্যাস ১৮৮
জব চার্নক ২
জমিদার সভা ৭১
জয়াকর ১৩৯
জলেশ্বর ১৮৬
জাতীয় কৃষকলীগ ২১৩
জাতীয় ছাত্র লীগ ২১৩
জাতীয় মহিলা লীগ ২১৩
জাতীয় যুব লীগ ২১৩
জাতীয় শ্রমিক লীগ ২১৩
জাতীয় পরিষদ ২০৯–২১০
জানকীনাথ বসু ১৭৬
জামশেদ ১২৮
জামাল উদ্দিন আফগানী ৫৫
জাহাঙ্গীর ১
জাহেরী ১৮
জাহিদুর রহিম জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ১৬৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ ১৪, ৯৪, ৯৫, ১০৭, ১১৭, ১৬১, ১৬৬, ১৭৬, ২১২
জিন্নাহ, মুহম্মদ আলী ১৩, ১০৪, ১২৩–১৩৭, ১৫৫, ১৮৭, ১৯৯
জিম্মাদারীতত্ত্ব ৯৯–১০০
জুডিশিয়াল কাউন্সিল ৬৫
জুলফিকার আলী ভুট্টো ২১০
জেফারসন ৪৪
জেমস ওয়াইজ ১৫১
জ্ঞানান্বেষণ ৭১
টুঙ্গিপাড়া ২০২
টেনেডোস ১১৬
ডাভটন কলেজ ৭১, ৭৬
ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে ১৩৩
ডান্ডি ৯৪
ডায়ার ১৪, ৯৪, ১০৭
ডিরোজিও ৭১, ৭২
ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি ৮৩
ডেভিড হেয়ার ৭২
ডে মনার্কিয়া ২১
ডোমিনিয়ন স্টেটাস ১২০–১২১
Discovery of India ১৩৯, ১৪৯

ঢাকা প্রকাশ ৮১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৯

তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া ১৬
তলস্তয় ৯২
তারাগনিয়া ২৭
তাহজীব-উল-আখলাক ৫১

www.pathagar.com

তিতুমীর ২৫, ২৬–২৯
তিলক, বালগঙ্গাধর ১৩, ৮৪, ১২৪, ১৩৯, ১৮৭
ত্রিপুরী কংগ্রেস ১৭৮
তুহফাতুল মুয়াহ্ হিদদীন ৪৩
তেজবাহাদুর সপ্রু ১১৩, ১২৪, ১২৮, ১৩৯
তেলাঙ্গ ১২৪
তেলিরবাগ ১০৬
ত্রিবাঙ্কুর ৩

খিওসফিকাল মিশন ৮

দক্ষিণ আফ্রিকা ৯০, ৯৩
দাদাভাই নওরোজী ১০৬, ১২৪, ১২৫
দান্তে ২১, ২২
দারুল ইসলাম ২৭, ৬১
দারুল উলুম ৫২
দারুল হারব ২৩, ২৭
দার্দানেলিস ১১৬
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৪৮
দি নিউ ইন্ডিয়া ৮১
দি হিন্দু পেট্রিয়ট ৬২
দিনশ ওয়াচা ১২৪
দ্বিজাতিতত্ত্ব ১৩, ৬৯, ১২৩, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭
দীনবন্ধু মিত্র ৪
দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় ৭১
দুদু মিয়া ২৫, ৩৮–৪২
দেওবন্দ ৫২, ১৮৬
দেশবন্ধু ১০৬, ১১২
দৈনিক ফরওয়ার্ড ১৭৭
দ্বৈত শাসন ১১০
The Causes of Indian Revolt ৫২
The Enquirer ৭১
The Indian Struggle ১৭৯
The Loyal Mohammedans of India ৫১
The Quill ৭১
The Reformer ৭১
The Unity of India ১৩৯
The Story of My Experiment with Truth ৯২
The Way to Swaraj ১০৭

ধানগড়া ১৮৫

নওয়াব আলী চৌধুরী ৮১, ১৫৪
নজরুল ইসলাম ২০৩
নন্দকুমার ২
নবজীবন ৯৩
নাজাত দিবস ১৩২
নাজিমউদ্দিন ১৬৮
নানকানা সাহেব ১১৭
নারায়ণ ১০৭
নাৎসিবাদ ৯৮
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৬৮
নীলকর ৪, ৩২, ৩৫, ৪১, ৬৩, ৯৩, ১৫১
নীল দর্পণ ৪
নীল বিদ্রোহ ৩৩
নীৎসে ৫৬, ১৮১
নেতাজী ১৮৪, ২০৩
নেশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৯
নেশনাল কনফারেন্স ৭৩
নেশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল ১৫৫, ১৬০
নেশনাল মোহাঃ এসোঃ ৬৬
নেহরু রিপোর্ট ১২১, ১৩৯, ১৪১
নৈরাজ্যবাদ ১৮৩

পঞ্চম জর্জ ৮২
পঞ্চশীলা ১৪৮
পঞ্চায়েত বোর্ড ১৯৮
পট্টভি সিতারামাইয়া ১৭৮
পলাশী ২, ৪, ৩০

www.pathagar.com

পাকিস্তান প্রস্তাব ১৩৪, ১৬৩
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ২০৯
পাঁচবিবি ১৮৬
পুতলি বাঈ ৯০
পোরবন্দর ৯০
প্যাথিক লরেন্স ১৩২
প্যারামিলিশিয়া ২০৭
প্যারিটি ১৩৪, ১৬৯
প্যারী মোহন মুখার্জী ৮১
প্রজাস্বত্ব আইন ৪১
প্রণামী ৯০
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৪৮
প্রয়োগবাদ ৪৬
প্রাকৃতিক বিধান ৫৫
প্রাণনাথী ৯০
প্রিন্স অব ওয়েলস ১১৭
প্রিভি কাউন্সিল ৬৫
প্রুধোঁ ১৮৬
প্রেস অর্ডিন্যান্স ৪৬
প্রেস এ্যাক্ট ১৫৬
প্রেসিডেন্সী কলেজ ৬১, ৬৫
Passive Resistance ৯৬
Political Economy ৫৪

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ৪
ফজলুল হক, এ, কে ১০৬, ১১১, ১৫০-১৬৪, ১৬৯

ফতোয়া-ই-আলমগিরি ১৭
ফরওয়ার্ড ১০৭
ফরায়জি আন্দোলন ১০, ৩০-৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ১৮৮
ফরাসী বিপ্লব ৪৩
ফরোয়ার্ড ব্লক ১৭৮
ফাতেমা জিন্নাহ ১৯২
ফারাক্কা লং মার্চ ১৯৩
ফিরোজ খান নুন ১৭০
ফিরোজ শাহ মেহতা ১২৪
ফ্যাসিবাদ ৯৮, ১০৩, ১৩১, ১৮০-১৮২

বক্সার ৩, ৩০
বঙ্কিমচন্দ্র ১২
বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন ১৮৯
বঙ্গবন্ধু ২০৮
বঙ্গভঙ্গ ১৪, ৭৯-৮৪, ৮৫, ৮৯, ১৩২, ১৫৩, ১৬৫
বাঙ্গাল খেদা ১৯১
বঙ্গীয় আইনসভা ১৫৪
বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন ১৫৪
বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৫৪
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ১৬৬
বড়দলই ১৯১
বদরুদ্দিন তায়েবজী ৫২, ১২৪, ১৬১
বয়কট ৮২, ৮৪
বলতেয়ার ৭, ৪৪
বলশেভিকবাদ ৯৯, ১৮৩
বল্লভভাই প্যাটেল ১৩৬
বসফোরাস ১১৬
বাকসাল ২১৩, ২১৬
বাগদাদ চুক্তি ১৭৩
বাংলার কথা ১৭৭
বাতেনী ১৮
বার্কলে ৭, ৯
বারাসাত ২৬
বালাকোট ২৫
বাকিংহাম, জে. এস. ৪৮
বাঁশের কেল্লা ২৭
বাহাদুরপুর ৪০
বিধানচন্দ্র রায় ৭৬

www.pathagar.com

বিপিন পাল ৮১, ৮২, ৮৪, ১২৪
বিবেকানন্দ ১৩, ১৭৬
বিশ্বরাষ্ট্র ২১, ২২, ১৪৬
বেঙ্গল প্যাকট ১৩, ১১১, ১১৪, ১৫৮, ১৬৬, ১৭৫
বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর ১৭৮
বেঙ্গাল স্পেকটেটর ৭০
বেদান্তসার ৪৩, ৪৫
বেদান্তসূত্র ৪৩
বেনথাম ৪৬
বেনী বাহাদুর ৩
বৈরুত ১৭০
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন ১২৫
ব্যামফিল্ড ফুলার ১৫২
ব্রাহ্ম সমাজ ৮
ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ৭১
ব্রিটিস পার্লামেন্ট ৯
Bengalee ৭২, ৭৪
Brahmanical Magazine ৪৩
Bengal Chronicle ৭১

ভগবদ্গীতা ৯১
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ৪৩
ভলান্টারি রেজিঃ বিল ৬২
ভবনগর ৯০
ভাই গিরিশ চন্দ্র ৮২
ভাই প্রেমানন্দ ১২৮
ভারতসভা ৭১
ভাষা আন্দোলন ১৩৭
ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ১৬৩, ১৮৫–২০১
ভিকারুল মুলক ৮৫
ভিক্টোরিয়া ৫
ভিঠলভাই প্যাটেল ১০৮
ভূখ মিছিল ১৯২

ভুবনমোহন দাস ১০৬
ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৮১
ভেরেলস্ট ৩

মক্কা ২৩
মঙ্গলদই ১৮৯
মঙ্গল সিং ১৩৯
মজুমদার, আর. সি. ৪৮
মতিলাল নেহরু ১০৬, ১০৮, ১২৭, ১৩৮–১৩৯, ১৬১
মঁতেক ৪৪, ৪৬
মদন মোহন মালব্য ১১২
মনজারাতুল আদিয়ান ৪৩
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১১১, ১৯৫
মন্টেগু চেমসফোর্ড ৭৫, ১০৭, ১১০, ১৩৮
মর্লিমিন্টো সংস্কার ১২
মর্লে, লর্ড ১২৩
মল্লিক, এ. আর. ৪১
মসলিন ১
মহাজন আইন ১৫৪
মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ১২৪
মহাভারত ৯১
মহীশূর ৩
মহেন্দ্র নন্দী ৮৪
মাউন্ট ব্যাটেন, লর্ড ১৩৬
মাদ্রাসায়ে আলীয়া ১৬৫–১৬৬
মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ১৫৯
মাণ্ডুক্য ৪৩
মারী সম্মেলন ১৬৯
মার্কসবাদ ১০৩, ১৪০, ১৪৪, ১৮১, ১৯৫, ১৯৯
মারটিন লুথার কিং ১০৫
মালঞ্চ ১০৭
মালা ১০৭
মালাবার ২, ১৫, ১৬৬
মিরাতুল আখবার ৪৩, ৪৮

www.pathagar.com

মিয়া ৩৯
মিল, জন স্টুয়ার্ট ৫, ৯, ৫৪, ১৫৭
মিল, জেমস ৪৬
মীর কাসেম ৩, ৩০
মীর জাফর ২, ৩
মীর নিসার আলী ২৬–২৯
মীর মোহাম্মদ ৮১
মুজিবনগর ২১২
মুক্তিযুদ্ধ ২১২
মুন্সাদ্দিদি ২২
মুতাজাল্লি ২২
মুশুক ৪৩
মুলান ১৯০
মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স ৮৪, ১৫২
মুসলিম লীগ ১৩, ৮৪, ৮৫, ১৩৫–১৩৪, ১৬১, ১৯০, ২০২–২০৩
মুসোলিনি ১৮১
মুহম্মদ মহসীন (দুদু মিয়া) ৩৮–৪২
মেকলে ৭
মেকিয়াভেলী ৪০, ৫৬, ৭৭, ১৭১
মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ৭২
মৈত্রীচুক্তি ৩, ১৭৪
মোপলা বিদ্রোহ ১৫, ৮৯, ১৬৬
মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ৫১
মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ৫২, ৬০, ৬৬
মোশারফ হোসেন ১৫৪
মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১১৭
মোহাম্মদ আলী (মওলানা) ১৪, ১৮৭, ১৮৯, ২০৩
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ১৬৯
মোহাম্মদ ইসলাইল খান (হাজী) ৮৮
মোহাম্মদ শফী (স্যার) ১৫৮
ম্যাক্সওয়েবার ১৩০
My Life : A Fragment ১১৫

যাজকতন্ত্র ৬৬, ৭১
যুক্ত নির্বাচন ১২৭, ১৫৭, ১৬৯
যুক্তফ্রন্ট ৭১, ১৬৩, ১৯২, ২০৩
যুক্তিবাদ ৭, ৪৪, ৭১
যেনো ৩৭
যোশী, এন্ এম ১৩৯

রণজিৎ সিং ২৪
রবার্ট ক্লাইভ ২, ৩
রবীন্দ্রনাথ ১২, ৫০, ৯০, ১৩৯, ১৮৪
রবুবিয়ত ১৯৪–১৯৫
রাউলাট আইন ১৪, ৯৩, ১১৭, ১৬১, ১৮৭
রাজকোট ৯০
রাজবল্লব ২
রাজা গোপালাচারী ১০৮
রাজেন্দ্র প্রসাদ ১১
রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭৬
রাম নারায়ণ ২, ২৭
রামমোহন রায় ৪৩–৫০
রামানন্দ ৪৫
রামায়ণ ৯১
রিচার্ড ওয়েলেসলি ৩
রিজলে, এইচ. এইচ ৮০
রিপন, লর্ড ১৪
রুডইয়ার্ড কিপলিং ৫
রুসো ৭, ৪৪, ১৬৪, ১৮৬, ১৯৯
রেকাবি বাজার ৩৬
রেনেসাঁ ৪৯
Representative Government ১৫৭

লবণ কর ৯৩–৯৪
লয়েড জর্জ ১১৬
লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ১৩
লাইন প্রথা ১৮৯–১৯১

www.pathagar.com

লাইবনিজ ৭
লালকোর্তা বাহিনী ৯৫
লালা লাজপত রায় ৮৪, ১১২, ১২৪
লাহোর প্রস্তাব/পাকিস্তান প্রস্তাব ১৩২, ১৩৪, ১৬৩
লিবার্টি ১০৭
লেভেলারস ১৮৮
Landholders' Society ৭১

শওকত আলী (মওলানা) ১৪, ১৮৭, ১৮৯
শক্তিপূজা ১৩
শরৎ বোস ১৬০
শরাফত আলী (হাজী) ১৮৫
শরিয়ত উল্লাহ (হাজী) ২৫, ৩৪-৩৭, ১৫১
শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী ১৮৬
শামসুল হক, নওয়াব ১৫৪
শাহ আলম ৩
শাহ আবদুল রহিম ১৭
শাহ আবদুল আজিজ ২৩
শাহ ওয়ালীউল্লাহ ১৬, ১৭-২২
শাহ নাসিরুদ্দিন বোগদাদী ১৮৬
শিবাজী উৎসব ১৩
শিয়া ২২, ৬৫
শিল্প বিপ্লব ৪৯
শুদ্ধি আন্দোলন ১২৪, ১২৬, ২০০
শেখ মুজিবুর রহমান ২০২-২১৬
শেখ লুৎফর রহমান ২০২
শোয়েব কোরেশী ১৩৯
শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ১৬০
শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা ১৬০
শ্রদ্ধানন্দ ১২৪
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ১৭৮

ষষ্ঠ সুলতান মাহমুদ ১১৭

সংগঠন আন্দোলন ১২৬
সতীদাহ ৮, ৪৫
সত্যাগ্রহ ৯৩, ৯৫, ৯৮, ১৬১
সবরমতী ৯৪
সমলদাস কলেজ ৯০
সন্তোষকুমার বসু ১৬০
সমাজতন্ত্র ৯৯, ১৪০, ১৪৪, ১৮৩, ১৮১, ১৮৩, ১৯৮-১৯৯
সম্বাদ কৌমুদী ৪৩, ৪৮
সরোজিনী নাইডু ১২৬
সল্ট মার্চ ৯৪
সর্বোদয় ৯৮
সাইপ্রাস ৮৭
সাইমন কমিশন ১৩৮-১৩৯, ১৭৭
সাগর সঙ্গীত ১০৭
সাদুল্লা, স্যার ১৯১
সামসুল হুদা ৮৩
সামুহিকতাবাদ ১১০
সাম্যবাদ ১৪৩
সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ১২, ৮৯, ১৫৮
সায়ীদ, কে. বি ১২৮, ১২৯
সিটি অব গড ১৯৬
সিতার রায় ৩
সিণ্ডিকালিজম ১৮৩
সিপাহী বিপ্লব (বিদ্রোহ) ৪, ১১, ১২, ১৪, ২৯, ৪১, ৬১-৫২, ১৫১
সিভিল সার্ভিস ৯, ৭২
সিরাজউদ্দৌলা ২, ৩
সিসেরো ৫৬
সিয়াসী খলিফা ৩৯
সুজাউদ্দৌলা ৩
সুতানুটি ২
সুভাষচন্দ্র বসু ১৭৬-১৮৪
সুরাট ১, ২

www.pathagar.com

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ৭১–৭৮, ৮১, ৮৮, ১০৬, ১১২, ১২১
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ১৬৫
সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোঃ ৫২
সেভার্স ১১৬
সৈয়দ আজিজুল হক ১৬৩
সৈয়দ আমীর আলী ৫২, ৬৫–৭০, ১২১, ১২৪, ১৬২
সৈয়দ আহমদ খান ৫১–৫৮, ৬৪, ৮৮, ১২৪
সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ১৬, ২৩–২৫
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২১২
স্টাফোর্ড ক্রিপস ১৩২
স্বতন্ত্র নির্বাচন ১২, ৮৬–৮৭, ১৫৭
স্বদেশী আন্দোলন ৮৪
স্বরাজ ৯৫, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১৬১, ১৬৪
স্বরাজ্য পার্টি ১০৮, ১১৩, ১৩৮
স্বায়ত্তশাসন ১২, ১৬১, ১৬৩, ১৬৮, ১৯২
স্মৃতিশাস্ত্র ৪৫
স্যার্না ১১৬
Satyagraha in South Africa ৯২
Soviet Russia ১৩৯
Spirit of Islam ৬৬

হক কথা ১৯৩
হজরত মুহম্মদ (দঃ) ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৯১
হরচন্দ্র ঘোষ ৪৮
হরিজন ৯২
হলকা ৩৯
হাউস অব লর্ডস ৮৭
হাকিম আজমল খাঁ ১০৮, ১৮৭
হানাফী ২২
হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ. ১৫১
হামদর্দ ১১৫
হামিদাবাদ ১৯০
হাসরত মোহানী ১৯৫
হিউম ৭
হিটলারবাদ ১৮২
হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী ৪৩
হিন্দু প্যাট্রিয়ট ৮১
হিন্দু মহাসভা ১২১, ১২৮, ১৫৯–৬০
হুকুমতে রব্বানিয়া ১৯৬
হেক্টর ১
হেলেনিস্টিক ৩৭
হেস্টিংস, লর্ড ৩২
হোমরুল ৭৪, ১২৫, ১৬৫
হোমরুল লীগ ১৪০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১১১, ১৬৩, ১৬৫–১৭৫, ২০২
হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল ১২৯
হ্যারো ১৩৮
Hicky's Bengal Gazette ৪৭
Hind Swaraj ৯২
Hindoo Patriot ৭২

www.pathagar.com

www.pathagar.com